মরুপ্রান্তর

তরুণকুমার ভাদুড়ী

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৬৪
আগস্ট, ১৯৫৭

প্রকাশক
জে. এন. সিংহ রায়
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
২২, ক্যানিং স্ট্রীট
কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট
অজিত গুপ্ত

মুদ্রক
রণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা-১৪

তিন টাকা পঞ্চাশ নয়াপয়সা
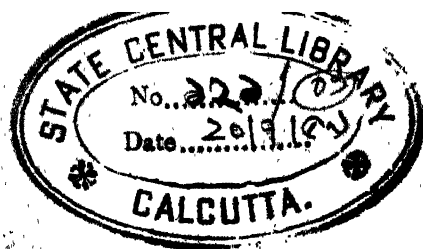
উৎসর্গ

গুলশন্ বহেন্-কে

—ভাইসাব্

বাংলা সাহিত্যের আঁকাবাঁকা দীর্ঘ কিউ (Queue)-এর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েছি। বুকিং আপিসে পৌঁছবার আগেই বোধহয় 'হাউস-ফুল্' হয়ে যাবে। তবু ক্ষীণ আশা, হয়তো একটা 'সীট' পেয়েও যেতে পারি।

কোনো 'প্রায়রিটি' আমার নেই আর তা দাবী করবার যোগ্যতাই বা কোথায়! কে জানে হয়তো বা আমার 'কাফিলা' নিয়ে মরুদ্যানের খোঁজে মরীচিকার পেছনে ঘোরার মতো মরুপ্রান্তরের বুকে বৃথাই এগোচ্ছি।

অনিশ্চিত এই সফরের দু'জন 'হামরাহী'কে (সহযাত্রী) আমার শ্রদ্ধা আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি—অগ্রজপ্রতিম 'দেশ' পত্রিকার শ্রীসাগরময় ঘোষ ও মেসার্স নিউ এজ পাবলিশার্স। পাথেয়রূপে অজস্র পাঠক পাঠিকাদের কাছ থেকে যে আশীর্বাদ, স্নেহ, প্রেরণা আর উৎসাহ পেয়েছি, তার পরিবর্তে দেবার তো আমার কিছুই নেই।

'মাই-কর্নার'
হামপিয়ার্ড রোড
নাগপুর
১লা বৈশাখ, ১৩৬৪
১৪-৪-৫৭

তরুণকুমার ভাদুড়ী

● মরুপ্রান্তর ●

●

ম রু প্রা ন্ত র

"আপকা পাসপোর্ট ?"

"পাসপোর্ট ?"

"হ্যাঁ। আপ শহর জাইয়েগা না ?"

"জী হ্যাঁ।"

"লাইয়ে আপকা পাসপোর্ট। চার ঘণ্টেকা অন্দর ওয়াপস আ জাইয়েগা।"

পোর্ট অফিসারের সন্দিগ্ধ প্রশ্নের খোঁচায় সম্বিৎ ফিরে আসে। ওপরে তাকিয়ে দেখি, জাহাজের মাস্তুলে চাঁদা-তারা মার্কা সবুজ নিশান। পাকিস্তান। কায়েদে-আজম মহম্মদ আলী জিন্নার রাজনৈতিক স্বপ্নের বাস্তব পরিসমাপ্তি ; হিন্দু-মুসলমানের রক্তে গড়া পাকিস্তান। খালিকুজ্জমান সাহেবের কাল্পনিক প্যান-ইসলাম রাজ্যের 'সিটাডেল'—পাকিস্তান।

কোথায় যেন একটু ব্যথা পাই। জমশেদজী নওশরণজী মেটা, জমনাদাস মেহতা, আর. কে. সিধওয়া, জয়রামদাস দৌলতরাম আর আল্লা বক্স-এর তৈরি ভারতের রমণীয় শহর করাচী আজ আমার কাছে কত অচেনা। করাচী আজ পাকিস্তানের রাজধানী, আর 'টু নেশন' থিওরীর মনুমেণ্ট পাকিস্তান আজ আমার কাছে বিদেশ। তাই পোর্ট অফিসার আমার কাছে চায় পাসপোর্ট।

অন্যমনস্কভাবে পাসপোর্টটা অফিসারের হাতে তুলে দিই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ দেখে তিনি বললেন, "আপকা ক্যামেরাভী ছোড় যাইয়ে।"

"ক্যুঁ ?"—একটু রেগেই উত্তর দিলাম।

পাসপোর্টের 'প্রফেশন'-এর জায়গায় লেখা 'জার্নালিস্ট' শব্দটার ওপর দু-চারবার আঙুল বুলিয়ে অফিসার এবার চড়া গলায় বলে উঠলেন,—"If you want to go ashore, keep your camera here, or else stay back in the ship."

মুখ নিচু করে জাহাজের গ্যাঙ্গওয়ে দিয়ে নেমে এলাম। মনটা বড় ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় যাত্রার শুরুতেই আমার কত পরিচিত করাচী শহরের এই অভ্যর্থনায়। কিন্তু ভুল বললাম। করাচী তো আজ আমার পরিচিত শহর না। করাচী তো আজ আমার কাছে বিদেশ। হবেও বা! কে জানে?

হোক না বিদেশ, তবুও দু'দিন জাহাজে থাকার পর জমি স্পর্শ করে বড় ভালো লাগল। করাচীর জমি আর দিল্লীর জমির মধ্যে তো আর তফাত নেই। আর আমার নাগপুরের মাটিও তো সেই একই জিনিস। জাহাজের ডেকের বোটকা গন্ধে, যাত্রীদের অবিরাম কলহে আর চেঁচামেচিতে, আর সমুদ্রের একঘেয়ে নীল লোনা জল দেখতে দেখতে মেজাজটা বিগড়ে ছিল। জমিতে পা দিতেই তাই করাচীকে বড় সুন্দর মনে হলো।

যাওয়াটা যেন এক রকম হঠাৎই ঠিক হয়ে গেল। কোথাও কিছু নেই, শখ চাপল মিডিল-ইস্ট দেখতে হবে। বন্ধুরা ভ্রূকুটি করে জানালেন, 'শিয়ার ওয়েস্ট অফ টাইম এণ্ড এনার্জি'। "কি হবে মিডিল-ইস্ট গিয়ে? তার চেয়ে সেই সময়টা ইউরোপ ঘোরো কাজ দেবে।" যতই বলি মিডিল-ইস্ট দিয়েও তো ইউরোপ যাওয়া যায়, তবুও তাঁরা একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে তর্ক উপস্থিত করেন, "না, না। সে কথা নয়। দু'মাস মিডিল-ইস্টে সময় নষ্ট করে কি হবে? তার চেয়ে সেই দু'মাসও ইউরোপের আরো অন্য জায়গাগুলো ভালোভাবে দেখো। অনেক কিছু শিখবে, অনেক কিছু জানবে। মিডিল-ইস্টে ছাই আছে কি? শুধু কতকগুলো হোমরা-চোমরা গায়ে-গন্ধ আরব, আর বালি আর তেল।"

কিন্তু কেন জানি না এত তর্ক সত্ত্বেও মন বোঝে না। কতদিনের আশা মিডিল-ইস্ট দেখব। রোমান্টিক মিডিল-ইস্ট। লরেন্স-এর মিডিল-ইস্ট। ফারুক আর নারীমানের মিডিল-ইস্ট। শাহ, সোরায়া, আতাউল্লা, কাসানী আর মোসাদেকের মিডিল-ইস্ট। ওমর খৈয়াম আর সাদীর মিডিল-ইস্ট। কামাল আতাতুর্ক আর ইসমৎ ইনেম্নুর মিডিল-ইস্ট। জগলুল পাশা, নোকরাশী পাশা, স্যার অ্যালেক কার্কব্রাইড, জেনারেল বার্কার

আর গ্লাব পাশার মিডিল-ইস্ট। গ্রাণ্ড মুফতী, নাহাশ পাশা, ইবন সউদ, আবছুল্লা, ফইজালের মিডিল-ইস্ট। আর আমার চেনা-অচেনা কত টমাস, ইমরান বে, ফাহারিয়া, আবদাল্লা, গুলর, ফজল, নিক, সাবাহাল, ইনজে, শামীমে, কামেল, অহমদ ডিনগার, আগুর, আবু রফতের, আর লক্ষ লক্ষ গরীব, গৃহহীন, অশিক্ষিত, রুগ্ন আরব আর তুর্কের মিডিল-ইস্ট। শুধু কি তেল আর বালি? বালির স্তূপের মধ্যে কত না রক্ত আজ শুকিয়ে আছে। বালির বুকে আজ চিরনিদ্রায় ঘুমুচ্ছে কত নাম-না-জানা আরব আর ইহুদী। মরুভূমির বুক ফুঁড়ে ফাটল দিয়ে ঠেলে বেরোচ্ছে আজ কত না চাপা কান্না! মাইলের পর মাইল তেলের পাইপ-লাইনের মধ্যে আছে কত না লক্ষ লক্ষ আরবের চোখের জল আর দেহের রক্ত, কত চক্রান্ত, শোষণ আর কত মোসাদেকের কারাবাস।

সেই মিডিল-ইস্টের পথে আজ আমার যাত্রা শুরু।

খবরের কাগজে কাজ করছি আজ ১২ বছর। তাই খবরের কাগজের রাজনীতির সঙ্গেও খুবই ভালোভাবে পরিচিত। যখন যাওয়ার একটা মোকা পাওয়া গেল, একেবারে যাকে বলে 'ক্যাচ ইট বাই দি টেল' করে মাভৈ বলে বেরিয়ে পড়লাম। যা থাকে কপালে। যাবার ইচ্ছা মিডিল-ইস্ট আর ইউরোপ। সম্বল মোটে ৫০০০৲ টাকা। প্রভিনশিয়াল টাউনের ইংরেজী খবরের কাগজের 'চিফ রিপোর্টার আর ফিল্ম এডিটারের' ভাগ্যে কবে যে 'ফরেন টুর' স্কলারশিপ বা ডেলিগেশন মেম্বারশিপের শিকে ছিঁড়ে পড়বে তার তো ঠিক নেই। তাই নিজেই বেরিয়ে পড়লাম।

যোগাযোগটাও মন্দ হলো না। ইস্তাম্বুলে (টার্কী) হচ্ছিল Third Inter-national Physical Education Congress। রওনা হবার ১৫ দিন আগে ভারতীয় টীমের নেতা গোপালরাও পাঠক একদিন হঠাৎ আপিসে এসে বললেন,—"ভাদুড়ী চলো, তুম ভী চলো"। বুড়ো পাঠকজী ক্ষেপেছে নাকি?

ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার। পাঠক সাহেব 'অফার' দিলেন, যদি আমি টার্কীতে ভারতীয় টীমের পাবলিক রিলেশন অফিসারের কাজ করি তার বদলে ভারতীয় টীম আমাকে

দেবে বম্বে থেকে বসরা আর বসরা থেকে বম্বের জাহাজ-ভাড়া অবশ্য ডেকে। বাকী 'তুমহারা জিম্মেদারী'। 'কুছ পরোয়া নেই। জরুর যায়গা'।

বলে তো ফেললাম, কিন্তু মোটে ১৫ দিন সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট, টাকাপয়সা, জামাকাপড় কি করে যে কি হবে কিছুই ভেবে উঠতে পারি না। যা হোক করে টাকাপয়সা যোগাড় হলো। এইবার পাসপোর্ট। এই পাসপোর্ট যে কত ঝকমারি ব্যাপার তা এক ভুক্তভোগীই জানে। তার ওপর আবার আছে হেলথ সার্টিফিকেট, ইনকাম ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, ভিসা। বাপরে বাপ, একেবারে নাজেহাল করে ছেড়েছিল। বম্বেতে পরে এক বন্ধু বলেছিলেন স্বাধীন ভারতে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট লাইসেন্স যোগাড় করা যত সহজ, পাসপোর্ট পাওয়া তত সহজ মোটেই না।

হাজার হলেও খবরের কাগজে কাজ করি, কিছু 'ইনফ্লুয়েন্স'ও আছে, তবুও পাসপোর্ট পাওয়ার যে এত ঝকমারি তা আগে কে জানতো। যে আপিসেই খোঁজ করি সেইখানেই জবাব পাই ফাইল চলে গিয়েছে। কিন্তু কোথায় যে গিয়েছে আর কেন যে গিয়েছে তা কেউই বলতে পারে না। এক ডিপার্টমেণ্ট অন্য ডিপার্টমেণ্টকে গালাগালি দেয়। পুলিস এনকোয়ারী, একবার ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আর একবার স্টেট লেভেলে। তারপর শুনলাম ঘুরে-ফিরে ফাইলটা সব লেভেল ক্রশ করে সেক্রেটারিয়েটে এসেছে। দিলাম ধর্না পলিটিকাল এ্যাণ্ড মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে।

"হলো মশাই আমার পাসপোর্ট? আর তো পারি না।" জিজ্ঞাসা করি এক কেরানীবাবুকে।

"কব অ্যাপ্লাই কিয়া"—আধ-পোড়া সিগারেটটা নিভিয়ে পকেটে ফেরত রেখে জবাব দেন 'বাবু' আমার দিকে না তাকিয়েই।

"আরে বাবা অ্যাপ্লাই তো ১৫ দিন হলো কিয়া, কিন্তু এ যে দেখছি অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই নো রিপ্লাইয়ের ব্যাপার।

"আরে ব্যস। হামারা পাস তো ছ' মহিনে পহেলকা অ্যাপ্লিকেশন পেণ্ডিং পড়া হ্যায়।"

"এটা কি খুব গর্বের কথা হলো?" একটু রেগেই যাই।

"দেখুন মশাই, আপনার মন্তব্য শোনার জন্য আমরা এখানে বসে নেই। আমরা অনেক busy"—ক্ষেপে গিয়ে মারাঠী কেরানীবাবু এবার খিঁচিয়ে ওঠেন।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনারা ভীষণ busy। নইলে দরখাস্ত ছ'মাস ধরে পেণ্ডিং কেন পড়ে থাকবে।" নিজের মনেই গজর গজর করতে করতে বেরিয়ে আসি।

যখন অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে পাসপোর্টটা হাতে পেলাম, মনে হলো যেন হলদীঘাটের যুদ্ধ জয় করেছি। তবুও কি 'ব্রাউন' সাহেব সহজে পাসপোর্টটা হাতে তুলে দেয়! ওপর-নিচে আমায় দেখে ফটো মিলিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আলগোছ করে দিলেন—যেন কতই কষ্ট হচ্ছে দিতে। যাক, একটা 'হার্ডল' পার হলো। এবার হেলথ সার্টিফিকেট।

গেলাম কর্পোরেশন আপিসে। ইনজেকশন্ ভ্যাকসিনেশন্ আগেই হয়েছিল। দরকার শুধু হেলথ অফিসারের সই আর 'সীল'। ভদ্রলোককে ভালোভাবেই চিনতাম। খবরের কাগজের লোকদের পেছনে একটু বেশি ঘোরাফেরা করার অভ্যাস ছিল। নাদুস-নুদুস চেহারার এই বাঙালী সাহেবের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হতো আমাদের 'বড়বাবুর' মিষ্টির দোকানে। মিষ্টি একটু বেশি খেতেন। কিন্তু তাঁর মেজাজের বেলায় তাঁকে এই অপবাদ কেউ দিতে পারত না।

"কি চাই মশাই?" হেলথ অফিসার সাহেব ইংরেজীতেই ক্ষেপে ওঠেন।

বললাম কি চাই।

"But you can't enter my room like this all of a sudden."

যেন মহাপাপ করেছি! হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে বেরিয়ে এলাম। অবাক লাগল। ভদ্রলোকের কি মাথা খারাপ হয়েছে। বাইরে এসে চাপরাশীর হাত দিয়ে এবার কার্ডটা পাঠালাম।

ওষুধ ধরেছে। বত্রিশটা দাঁত বের করে হাসতে হাসতে এইবার হেলথ অফিসার নিজেই বেরিয়ে এলেন। কত অ্যাপোলজি। 'চিনতে পারিনি'। 'খেয়াল করিনি।' 'চিনতে

পারলে কি আর আপনার মতো জার্নালিস্টকে'…ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যাক্ হলো দ্বিতীয় 'হার্ডল' পার। এইবার ফাইনাল 'হার্ডল'। একটা লাফাতে পারলেই নির্ঘাৎ 'ভিক্টরী স্ট্যাণ্ড'—কেল্লা ফতে। চাই ইনকাম ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট। আরে ইনকামই নেই তার আবার ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট। কিন্তু কথায় বলে না 'ল ইস্ অ্যান অ্যাস' (Law is an ass)।

গেলাম আপিসে। বেশ স্মার্ট গোছের এক ছোকরা অফিসারের কামরায় পৌঁছে দিলেন এক কেরানীবাবু। অফিসারটি বোধ হয় নতুন আমদানী। এক নিঃশ্বাসে গোটা কুড়ি প্রশ্ন ঝাড়লেন। একটার উত্তর দিতে না দিতেই দ্বিতীয় প্রশ্ন তৈরি। বাংলায় অনুবাদ করলে তাঁর প্রশ্ন আর আমার উত্তরগুলো ঠিক এ রকম দাঁড়ায়।

"ফরেন যাবার জন্য অর্থ আপনি কোথা থেকে পাচ্ছেন ?"

"তাতে আপনার কি দরকার মশাই ?"

"যদি আপনার সার্টিফিকেটের দরকার থাকে তাহলে আমারও দরকার আছে। সার্টিফিকেট না দরকার থাকলে—আমারও দরকার নেই।"

"ধরুন, বন্ধুদের কাছে ধার করেছি।"

"ধরুন-টরুন না। ঠিক বলুন। ধার করেছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"কত ?"

"তাও দরকার ?"

"বললাম তো।"

"ধরুন হাজার পাঁচেক।"

"আবার ধরুন ! পাঁচ হাজার ?"

"আজ্ঞে ?"

"বন্ধুদের নামগুলো বলুন।"

"কেন ?"

"দরকার আছে।"

"ক্ষমা করবেন মশাই, নাম বলতে পারবো না।"

"তাহলে আমাকেও ক্ষমা করবেন আমিও সার্টিফিকেট দিতে পারবো না!"

উঃ! কি হুজ্জুত। রেগে প্রায় চিৎকার করেই বলে উঠি "দুত্তোর ছাই। ধরুন। না-না ধরুন না। আমি আমার নিজের পয়সাতেই যাচ্ছি। কোথা থেকে পেলাম? ধরুন। থুড়ি। বউয়ের গায়ের গহনা বিক্রি করেছি। বাপের সম্পত্তি বেচেছি। নিজের কোট, প্যান্ট বেচেছি। হয়েছে?"

"না। এসব হলো কি করে?"

এইবার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে বলতে যাচ্ছিলাম "না মশায় আপনার সিন্ধুক থেকে টাকা চুরি করেছি।" কিন্তু যে গরু দুধ দেয় তার নাকি লাথিও সহ্য করতে হয়। তাই চুপ করে থাকলাম। হঠাৎ সাহেব বিকট জোরে হেসে উঠলেন।

"I am sorry gentleman. You have come to the wrong man. You come under 'E' Ward. Mine is 'D' Ward. You have to go to the officer in 'E' Ward. Next room."

"কি?" মাথায় রক্ত চেপে গিয়েছিল। বলেই ফেললাম, "I can see that I have come to the Wrong man."

"It was just a mistake. I am sorry—একটু বিনয় দেখালেন 'ডি' ওয়ার্ড।

"Indeed it was, to make you an officer"—সাহেব চাপরাশী ডাকবার জন্য ঘণ্টা বাজাবার আগেই বেরিয়ে তাড়াতাড়ি 'ই' ওয়ার্ডের সাহেবের কাছে পৌঁছালাম। সত্যিই ভদ্রলোক। "ই" ওয়ার্ড পাঁচ মিনিটেই কাজ শেষ করে দিলেন। সার্টিফিকেট তো পেলামই আর সেই সঙ্গে পেলাম 'গড স্পীড' আর 'বঁ্য ভয়াজ'।

মানুষে মানুষে কত তফাত।

বেশ লাগল ত্রিবেদী সাহেবকে। বড় মিশুকে লোক। যদিও 'হাউ-ডু-ইউ-ডু' পর্যন্ত চেনাশোনা ছিল, ট্রেনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বেশ জমিয়ে তুললেন আলাপ ত্রিবেদী সাহেব। ললতাদিন

ত্রিবেদী। কিছুদিন হলো ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেসনস জজের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। আমার সঙ্গে উনিও নাগপুর থেকে বম্বে মেলে উঠলেন। রিটায়ার হবার পর আবার ওকালতি করছিলেন। তাই একটা কেস সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে যাচ্ছিলেন। ট্রেন ছাড়ার কয়েক মিনিট পরেই কাছে এসে বসলেন।

"বেশ সুন্দর"—হাসতে হাসতে বললেন।

"কি?" একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

"এই কত লোক আপনাকে 'সি-অফ্' করতে এসেছিল।"

"ও!"

ব্যস! ত্রিবেদী সাহেব বেশ জমিয়ে তুললেন। স্টেশনে গাড়ি থামলেই বলেন, "কুছ খাইয়ে"। নাছোড়বান্দা। কখনও চা কখনও মিষ্টি। এক ধরনের লোক হয় যাদের কখনও 'না' বলা যায় না। ত্রিবেদী সাহেব সেই দলের। কথাবার্তায় বুঝলাম বিস্তর পড়াশুনা করেছেন ত্রিবেদীজী। বললেন, জন গান্থারকে ওঁর খুব ভালো লাগে। শুরু করলেন নিজের দীর্ঘ ৩০ বছরের চাকরি-জীবনের ইতিহাস। অপূর্ব স্মরণশক্তি ভদ্রলোকের। কবে কোন্ কেসে কোন্ আসামী কি ডিফেন্স দিয়েছিল তা পর্যন্ত মনে ছিল। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে একবার বললেন, "দেখুন মিঃ ভাদুড়ী, আজ যখন কখনও কখনও পুরনো কেসের রায়গুলোর কথা মনে করি, বেশি করে মনে পড়ে ফাঁসির হুকুমগুলোর কথা। অনেক 'ডেথ সেনটেনসই' দিয়েছি। বেশিরভাগই হাইকোর্টে কনফারম হয়েছে। মাঝে মাঝে ভাবি এই যে আমাদের আইন— 'টুথ ফর টুথ, আই ফর আই, ডেথ ফর ডেথ',—সেটা কি ঠিক? কি জানি?"

ত্রিবেদী সাহেব একটু বিচলিত হয়ে পড়েন। অন্য কথা পাড়বার চেষ্টা করি। কিন্তু ঘুরে-ফিরে সেই ফাঁসির কথাই বলেন। "জানেন একবার একটা খুনের আসামীকে ফাঁসির হুকুম শোনাতেই লোকটা হঠাৎ পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে যায়। তারপর একটা বিকট চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তার সেই চিৎকার আর কান্না আমার মনে আছে"—ত্রিবেদী সাহেব নিজের মনেই বলে চলেন।

ছোটবেলা থেকেই ফাঁসি দেখার বড় শখ ছিল। ১৯৪২-র

আন্দোলনে জেল দেখা হয়েছিল বটে, কিন্তু ফাঁসি দেখা আর হয়নি। পরে খবরের কাগজে ঢোকার পর সে সুযোগ দু'-একবার এসেছিল।

মনে পড়ে প্রথমবার যেবার অনেক হুজ্জুত করার পর ফাঁসি দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, তারপর ২।৩ দিন ভালো করে খেতে ও ঘুমুতে পারিনি। চোখের সামনে সেই ভয়াবহ দৃশ্যটা কেবলই ভেসে উঠত। ২৪।২৫ বছরের ছোট জাতের একটি মেয়েলোক। নিজের দু বছরের শিশুকে হত্যা করার অপরাধে ফাঁসি হয়েছিল। ফাঁসির পর মেয়েটার সমস্ত শরীরটা যেন একটা ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছিল।

গাড়ি থেকে না নামা পর্যন্ত ত্রিবেদী সাহেব সমানে তাঁর কর্মবহুল জীবনের অভিজ্ঞতা বলতে থাকলেন। বাইরে যাচ্ছি শুনে অনেক উপদেশও দিলেন। নামবার আগে গভীর আলিঙ্গন করে বললেন, "আই উইশ ইউ অল সাকসেস ইয়ংম্যান।" ফিরে আসার পর যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই ত্রিবেদী সাহেব ভীষণ খুশি। "আই নিউ, ইউ উইল কাম অ্যাণ্ড সি মি। আই হ্যাভ রেড অল ইয়োর ওয়াণ্ডারফুল আরটিকলস্।"

আজ বারবার ত্রিবেদী সাহেবের কথা মনে পড়ছে। মারা যাবার দু'দিন আগেও দেখা হয়েছিল। তেমনইভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। সেই স্মিতহাস্য মুখটা আজ কেবলই চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

দুই

বম্বে। 'গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া'। শহর তো নয় একটা হুজুগ। যতবারই বম্বে এসেছি, আমার কেবলই স্টিফেন জুইগের 'We have become a nation of pushed and being pushed' কথাটা মনে পড়েছে। কোনো কিছু নেই সব ব্যাপারেই একটা হৈ-হৈ, রৈ-রৈ। ট্রামে, বাসে, সিনেমায়

'কিউ' দিয়ে দাঁড়াও—হয় ধাক্কা দাও, নয়তো ধাক্কা খাও। মানুষ যে মানুষের প্রতি কত 'ইনডিফারেন্ট' হতে পারে, তা দেখতে হলে এক বম্বে শহরই যথেষ্ট।

আর এমন সময় বম্বে পৌঁছলাম যে, বরুণ দেবের কৃপায় বাইরে বেরোবার জো নেই। কি অদ্ভুত বৃষ্টি। কোনো কিছু নেই, হঠাৎ আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। বম্বের লোকগুলো বোধ হয় সব সময় ছাতি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। নয়তো বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এত লোক ছাতি মাথায় দিয়ে যায় কি করে।

বেশ ভাবনায় পড়ে গেলাম। এই বৃষ্টির মধ্যে কি করে সব কাজ হবে। ভিসা যোগাড় করা, ট্রাভেলার্স চেক, প্যাসেজ আবার তারপর আছে 'ই' ওয়ার্ডের সই-করা ফর্মের জোরে ইনকাম ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্সের ফাইন্যাল সার্টিফিকেট যোগাড় করা। হাতে মোটে তিন দিন সময়। তাছাড়া অনেকের সঙ্গেই দেখা করতে হবে।

"বলতে পারেন মশাই 'গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ার' আপিসটা কোথায় ?"—জিজ্ঞাসা করলাম এক ব্যস্তবাগীশ মারাঠী ভদ্র-লোককে। হন্ হন্ করে চলতে চলতে না থেমেই তিনি উত্তর দেন, 'মালা মাইত নেই' (আমি জানি না)। একটু অবাক হয়ে ভাবছি, এমন সময় ওপরে তাকিয়ে দেখি, 'গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ার' আপিসের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি। এই হলো টিপিক্যাল 'বম্বেওয়ালা'।

গেলাম দাদরে সীতাদির বাড়িতে। সীতাদি আবার একটু 'রেড'। বাড়িময় স্টালিন লেনিনের ছবিতে ভর্তি। সীতাদিকে বেশ লাগে। হঠাৎ একবার আলাপ হয়েছিল। বৃষ্টিতে আমার ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা দেখে হেসেই খুন। যেই শুনলেন, কেবিন-এ জায়গা পাইনি, ডেক-এ যাবো, সীতাদি এমন ভয় দেখালেন যে, আমার তো অবস্থা কাহিল। বললেন, এই মন্সুনে আরেবিয়ান সী ভীষণ 'রাফ' আর তাছাড়া যাচ্ছো তো ৫০০০ টনের বি. আই. এস. এন-এর ছোট জাহাজে—দেশলাইয়ের বাক্সের মতো দুলবে। তারপর আবার 'ডেকে'। ভীষণ 'সিক' হয়ে পড়বে। রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। জাহাজে যখন সত্যিই

'সিক' হয়ে পড়ি, তখন কেবলই সীতাদির কথা মনে পড়তো। কিছুতেই ছাড়লেন না—খাইয়ে তবে ছুটি। যাবার সময়ে বললেন, "চেষ্টা করে একবার রাশিয়াটাও ঘুরে এসো।"

সীতাদির ওখানেই আলাপ হলো গৌতম মুখার্জির সঙ্গে। খ্যাতনামা চিত্র-অভিনেতা স্বর্গীয় দেবী মুখার্জির ছোট ভাই।

বম্বে যখন এসেইছি ভাবলাম বম্বের 'ফিল্মী দুনিয়াটা' একবার ঘুরেই নিই। পুরোনো বন্ধু কিশোর সাহুর বাড়ি গেলাম। চেম্বুরে কিশোরের বাড়ি—'বাটিকা'। কিশোরের স্ত্রী প্রীতি শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। কিশোর দুঃখ করছিল যে, লোকে ওর বই আর আর্ট বুঝল না। 'ময়ূরপঙ্খ' নিয়ে তখন কিশোর খুব ব্যস্ত। বললো, রোমে দেখা হবে। হলিউড থেকে সাবুকে এনে ক'দিন খুব হৈ-চৈ করল কিশোর। কিন্তু পর পর ক'খানা বই মার খেয়ে সাহু একটু কাহিল। ওর কলেজ-জীবনের শখ 'হ্যামলেট' করবার। করেছিলও। মন্দ হয়নি বইটা, তবুও 'বক্স অফিস'-এ যাকে বলে একেবারে 'ফ্লপ্'।

কিন্তু যদি বম্বে এসে মোতীলালকে না দেখা হয়, তাহলে বম্বের ফিল্ম-ল্যাণ্ডের কিছুই দেখা হলো না। মোতীলাল এখনও 'গ্রীন'। ওরকম ভদ্রলোক খুব কমই দেখেছি। আর লোকটা অদ্ভুত হাসতে পারে। একবার ওর সম্বন্ধে লিখেছিলাম, —'ফিল্মল্যাণ্ডস্ নটী বয়'। হো-হো করে হেসে বলেছিল, "People say it, but boy you have written it."

মোতীলাল যেন একটা দুরন্ত হাওয়া। চোখে-মুখে সব সময় একটা দুষ্টুমি-ভাব। সবাইকে ওর ভালো লাগে আর সবাই ওকে ভালোবাসে। ওর একটা 'ফ্যাড' আছে—গাড়ি কেনা আর গাড়ি বেচা। বাজারে নতুন মডেলের মোটর বেরোল কি মোতীকে কিনতেই হবে। একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই গাড়ি নিয়ে একবার বড় মজা হয়েছিল। যুদ্ধের সময়। পেট্রোল র‍্যাশনিং। হঠাৎ মোতী একটা প্যাকার্ড গাড়ি কিনল। রাতদিন সেই গাড়ি নিয়ে 'টো-টো কোম্পানী'। একদিন পুলিস কমিশনার ওকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—"মোতী। মাসে আট গ্যালন পেট্রোল তোমার বরাদ্দ। এই বিরাট গাড়ি নিয়ে তুমি রাতদিন

ঘুরে বেড়াও। Where do you get all the Petrol from ?"

মোতীর আবার সেই খিল খিল করে হাসি—"But sir, my car does'nt run on petrol."

"What nonsense" পুলিস কমিশনার টেবিল চাপড়ে বলে ওঠেন। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে প্যাকার্ড কারের "ইনস্ট্রাকশন" বইটা বের করে ধরলো মোতী সাহেবের সামনে। সাহেব প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেননি। পরে বুঝতে পেরে বিকট জোরে হেসে ওঠেন।

'ইনস্ট্রাকশন' বইয়ের প্রথম পাতাতেই লেখা ছিল, 'Packard runs on Reputation'।

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ভিসা ইত্যাদি যোগাড় হলো। বিদেশী রাজদূতাবাসে যেরকম ব্যবহার পেয়েছি, দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় আমাদের নিজেদের সরকারী দপ্তরে তা পাইনি। সুভাষ বসু একবার আই. সি. এস-দের সম্বন্ধে ঠিকই বলেছিলেন, "Neither Indian nor Civil nor Service"। অনেক লোকের সঙ্গেই মিশেছি আর অনেক লোকের সম্পর্কেই এসেছি, কিন্তু বলতে কোনো বাধাই নেই যে, আজ পর্যন্ত বম্বের গ্রীক কন্সাল-জেনারেলের মতো অমায়িক আর মিষ্টভাষী অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি আর বম্বেতেই ইনকাম ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স আপিসের বড় সাহেবের মতো বদমেজাজী লোকেরও দেখা পাইনি।

গ্রীক কন্সালের আপিসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভিসা পেয়ে গেলাম। পক্ককেশ, সুপুরুষ সাহেব যখনই জানতে পারলেন, আমি 'জার্নালিস্ট' বিনামূল্যে ভিসা পেয়ে গেলাম। হ্যাণ্ডশেক করে বললেন, "আই অ্যাম শিওর ইউ উইল এনজয় ইওর স্টে ইন মাই ওয়াণ্ডারফুল কান্ট্রি"।

"আই অ্যাম শিওর আই উইল। এ কান্ট্রি হ্যাট হাজ্ সাচ্ এ ওয়াণ্ডারফুল কন্সাল-জেনারেল, মাস্ট বী ওয়াণ্ডারফুল ইনডীড", বললাম।

"সো কাইণ্ড অব ইউ"।

ইনকাম ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স আপিসে গিয়ে দেখি অসম্ভব ভিড়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকে দাঁড়িয়েই আছে। মাঝে মাঝে শুধু বড়সাহেবের বিকট চিৎকার আর গালাগালি শুনতে পাওয়া যায়।

ইরাক দূতাবাসে গেলাম। এই একটা জায়গা, যেখানে আমার ভিসা যোগাড় করতে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। অনেক কষ্টে সাত দিনের ট্রান্সিট্ ভিসা পেলাম।

ফার্স্ট সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটা মস্ত ভুল করে বসলাম। বললাম, ইসরাইলও যাবার ইচ্ছা আছে। সেক্রেটারীর কান লাল হয়ে উঠল। "ইউ শুড্ হ্যাভ টোল্ড মি দ্যাট আর্লিয়ার, ইন দ্যাট কেস নো ভিসা উড্ হ্যাভ বিন গ্র্যান্টেড টু ইউ"।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে একটু অবাক হয়েই গিয়েছিলাম। পরে জিনিসটা বুঝতে পেরে নিজের বোকামির জন্য আপসোস হলো। মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর সঙ্গে নতুন ইহুদী রাজ্য ইসরাইলের সম্বন্ধ যাকে বলে একেবারে 'ড্যাগার্স ড্রন'।

সেক্রেটারী জানালেন যে, তিনি বাগদাদে খবর পাঠাবেন। তিনি আমাকে 'ওয়ার্ন' করলেন, কোনো মিডিল-ইস্ট দেশ যদি জানতে পারে আমার কাছে ইসরাইলের পাসপোর্ট আছে, বিপদের সম্ভাবনা খুব বেশি। (ইসরাইলের জন্যে আলাদা পাসপোর্ট নিতে হয়) পরদিন শুক্রবার হওয়াতে সিরিয়ান ভিসা পেলাম না, নয়তো সেখানে ব্যাপারটা একটু সামলে নিতাম।

বসরা বন্দরে নেমে বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা কত 'সিরিয়স'। পোর্টে আমার মালপত্র তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। কাস্টমস অফিসার বললেন, 'জাস্ট ফর্মালিটি'। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, বম্বে থেকে খবর পৌঁছে গিয়েছে। অফিসারের মেহনতই সার হলো। তিনি আমার ইসরাইলের পাসপোর্টটা আর খুঁজে পেলেন না। পাবেন কোথা থেকে! ব্যাপার বেগতিক দেখে ইসরাইল যাবার বাসনা তখনকার মতো ত্যাগ করে বম্বেতেই সে পাসপোর্টটা রেখে এসেছিলাম।

পরে বুঝতে পারি, আরব রাষ্ট্রগুলো আর ইসরাইলের এই শত্রুতা সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য আর পৃথিবীর কত বড় সমস্যা। ব্রিটিশ

মিডিল-ইস্ট পলিসি যে এর জন্য কত দায়ী, তা বুঝতেও পরে কষ্ট হয়নি। ব্রিটিশ লেবার গভর্নমেণ্ট আর আর্নেস্ট বেভিনের কাঁধে দায়িত্ব কিছু কম না। জীবন দিলেন শুধু শান্তিদূত কাউণ্ট ফোক বার্নাডোট আর হাজার হাজার আরব আর ইহুদী।

অনেকদিন পরে সুদূর বম্বেতে বাঙাল কথা শুনতে পেয়ে একটু আশ্চর্য লাগল। ইরাকী দূতাবাসে পূর্ব বাংলার হজযাত্রী মুসলমানের ভিড়। সারাজীবনের জমানো অর্থ নিয়ে হজে যাচ্ছে কুদ্দুস মিয়াঁ আরো অনেকে। বৃদ্ধ কুদ্দুস মিয়াঁ। কোমর বেঁকে গিয়েছে, শীর্ণ চেহারা। তবু জীবনের শেষ সন্ধ্যায় তার সে কি আশা—সে যাবে মক্কা-মদিনায়।

বাইরে আসছি এমন সময় কুদ্দুস আমাকে ডেকে ওঠে—"বাবু আপনি বাঙালী?"

"হ্যাঁ"।

"ওরে বাঙালীবাবু। আপনে আমাগো বাঁচাইলেন বাবু"—কুদ্দুস তার দলটিকে উদ্দেশ্য করে বলে।

"আইজ চাইর দিন চাইর রাইত বম্বেতে পইড়া আছি। এগো ভাষাও জানি না। কাইল জাহাজ ছাড়ব, কাগজপত্তর যোগাড় করতে পারি নাই। এইক হালা কিছু পয়সা ধাপ্পা দিয়া মাইরা দিছে। বাবু আপনে বাঙালী, একটু মদদ কইরা দেন। খোদা আপনেরে সুখে রাখবেন।"

কুদ্দুসকে নিয়ে আবার গেলাম ফার্স্ট সেক্রেটারীর কাছে।

"What is the problem now?"

জিজ্ঞাসা করেন সেক্রেটারী সাহেব। অনেক বুঝিয়ে-শুঝিয়ে কুদ্দুস আর তার দলের কাজটা তাঁকে দিয়ে করিয়ে নিলাম।

"But these people are Pakistani nationals···How are you concerned?"

সেক্রেটারী এবার একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন।

বললাম—

"But only a few years back they were very much like me. They came from Bengal, my own

province···Moreover it is just helping a man in distress. There is no other concern."

ভিসা পেয়ে কুদ্দুস হাতে যেন স্বর্গ পেল। ভাবে খোদার মেহেরবাণী। এ তো জানে না যে, আজকের দিনে মক্কা-মদিনা যেতে হলে খোদার মেহেরবাণীর চেয়ে বেশি প্রয়োজন গভর্নমেণ্টের দেওয়া পাসপোর্ট আর দূতাবাসের দেওয়া ভিসা।

জাহাজে বারবার কুদ্দুস আমার কাছে এসেছে। ঢাকার কোন এক সুদূর গ্রামের কুদ্দুস মিয়াঁ। একদিন সকালে কাছে এসে দাঁড়াল। কিছু যেন বলবে। জিজ্ঞাসা করি—"কি মিয়াঁ ?"

"বাবু আপনারে একটা কথা কমু—" আমতা আমতা করে উত্তর দেয় বৃদ্ধ।

"বলো না।"

"আপনি রাইগ করবেন না তো ?"

"আরে রাগ করবো কেন, বলোই না।"

"আপনের লাইগা এট্টু চিড়া গুড় আনছি। দ্যাশের তৈরি। এতে তো কোনো দোষ নাই।"

"দাও না তাতে কি হয়েছে।"

একরাশ চিঁড়ে আর গুড় একটা পুঁটলি করে কুদ্দুস সামনে এনে ধরে।

"এত কি হবে মিয়াঁ ?"

"রাখেন না। আমাগো গেরামের জিনিস।"

জাহাজ থেকে নামবার সময় কুদ্দুসের হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলি, "রাখ মিয়াঁ।"

"বাবু, আপনে কি হজে যাবেন ?"

"না কুদ্দুস, আমি যে হিন্দু। আমায় তো যেতে দেবে না।"

হঠাৎ কুদ্দুস একটা প্রণাম করে বসে। "খোদা আপনাকে সুখী রাখেন।"—বৃদ্ধ কুদ্দুসের চোখের কোণে একটু জল চিক্ চিক্ করে ওঠে। নিজের অজান্তেই পকেট থেকে রুমালটা বের করে নিজের চোখের কাছে নিয়ে আসি।

কুদ্দুসের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। হয়তো হাজী হয়ে সে

আবার ঢাকার কোন এক সুদূর গ্রামে ফিরে গিয়েছে—হয়তো ফিরতে পারেনি। কে জানে? অনেকেই ফেরে না।

কুদ্দুসের খোদা কিন্তু আমার মঙ্গলই করেছিলেন। মা পাড়ার লোককে ডেকে বলতেন, "আমার ছেলে বিলাত ফেরত।"

মাঝে মাঝে এখনও কুদ্দুসের কথা মনে পড়ে—তার চোখের কোণে জল চিক্ চিক্ করছে—'বাবু আপনি হজে যাবেন?' এখনও চোখের সামনে ভেসে ওঠে জাহাজের ডেকের এক কোণে ছেঁড়া মাদুরের ওপর হাঁটু গেড়ে নমাজে বসা কুদ্দুসের চেহারাটা। ভোরের আধো-আলো, আধো-আঁধারে ওকে দেখাতো একটা 'সিলহৌটের' (Silhouette) মতো।

তিন

ধীরে ধীরে বম্বের সাদা সাদা অট্টালিকা, ফ্যাক্টরীর চিমনি আর সবুজ গাছগুলো দিগন্তে মিলিয়ে যেতে লাগল। 'বি. আই. এস. এন'-এর এস. এস. "দ্বারকা" জাহাজ আস্তে আস্তে হেলে-দুলে বম্বে বন্দর ছেড়ে চলল। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হওয়াতে বাইরে আর বেশিক্ষণ দাঁড়ান গেল না, ভিতরে যেতে হলো। কিন্তু ভিতরে যেতেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। কেবিনে জায়গা না পাওয়ায় ডেকে যেতে হচ্ছিল। জাহাজের 'পার্সার' জানালেন যে, করাচীতে একটা কেবিন সিট খালি হলে জায়গা পাব। কিন্তু করাচী না পৌঁছনো পর্যন্ত দু'দিন যে কি করে কাটিয়েছি তা আমিই জানি। 'ডেক' যে একটা কি ভয়াবহ স্থান তা এই বি. আই. এস. এন-এর ৫০০০ টনের 'দ্বারকা' জাহাজে না চড়লে বোঝা শক্ত। ওই তো জাহাজ তার আবার শখের নাম 'দ্বারকা'। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। শুনেছি গভর্নমেণ্ট নাকি ডেক প্যাসেঞ্জারদের 'ওয়েলফেয়ারের' জন্য একটা কমিটি বসিয়ে ছিলেন। আজকের যে-যার "ওয়েলফেয়ারের" দিনে, প্যাসেঞ্জারদের কী যে "ওয়েলফেয়ার"

হয়েছিল জানা নেই। উঃ অসহ্য ব্যাপার এই ডেক। ছোট্ট ডেকে কত যে যাত্রী তার ইয়ত্তা নেই। ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি বলে কোনো কথা এই কোম্পানীর ডিকশনারীতে নেই। এক গাদা মানুষ—ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, জোয়ান, সব গোয়ালঘরের মতো ঠাসা ডেকের মধ্যে। কোন্‌টা মানুষ আর কোন্‌টা বোঁচকা বোঝা দায়। একই জায়গায় রান্না, বাসন-ধোয়া, বমি করা, কাপড় কাচা। সে যে কি দৃশ্য এখনও ভাবতে গেলে গা ঘিন-ঘিন করে।

যাত্রীদের মধ্যে বেশিরভাগই আরব নয়তো ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানের মুসলমান—যাবে হয় করাচী নয়তো পারস্য উপসাগরের ছোট ছোট বন্দর মাসকাট, বহেরিন, ওমন বা কুয়েট।

ধীরে ধীরে জাহাজের উপর রাত নেমে আসে আর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় ঝগড়া, মারামারি, কান্নাকাটি, যাত্রীদের চিৎকার। ঘুমুতে না পেরে উপরের ডেকে উঠে এলাম। আকাশের কোণে কালো ঘন মেঘ। সমুদ্রের ঢেউগুলো এসে জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়ছে আর মাঝে মাঝে তীব্র সার্চলাইটের আলো পড়ে সামনের জলরাশি চিক্‌চিক্ করে ওঠে।

কতক্ষণ যে সেইভাবে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ মনে হলো পিছনে যেন কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। "এস্‌কিউজ মি, মে আই হ্যাভ এ সিগারেট?"—সুন্দর চেহারার এক যুবক মিষ্টি হেসে সামনে এসে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ পরে কথা বলার একজন লোক পেয়ে হাতে যেন স্বর্গ পেলাম।

"আই অ্যাম ম্যাকগ্রেগরী। ইউ মে কল মি গ্রেগ।"

নিজে একটা ধরিয়ে আর ওকে একটা সিগারেট দিয়ে বলি,—"হাউ ডু ইউ লাইক ম্যাক?"

"ছাট্ ইস ওয়াণ্ডারফুল। শী অলসো কল্‌স্ মি ম্যাক"—হঠাৎ গ্রেগ একটু বিষণ্ণ হয়ে যায়।

আর্মেনিয়ান যুবক ম্যাকগ্রেগরী। বম্বে থেকে বেরিয়েছে ভাগ্যের অন্বেষণে। অটোমোবাইল মেকানিক্। জিজ্ঞাসা করলাম, "যাবে কোথায়?" জবাব দিলো, "আলটিমেট্ ডেসটিনেশন্ ফ্রান্স।"

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে ওর দিকে তাকাতেই ও নিজেই বুঝিয়ে বললো। 'উইদাউট ফুড', টিকিট কেনার পর ওর কাছে আছে ৩০৲ টাকা। বসরায় আর্মেনিয়ান চার্চ আছে। ওর আশা, সেখানে অর্থ সাহায্য পেয়ে ও ফ্রান্সে যেতে পারবে আর শুরু করবে 'নিউ লাইফ্'। "দেন আই উইল কাম ব্যাক অ্যাণ্ড ম্যারী ডেইজি অ্যাণ্ড টেক হার টু প্যারিস টু।"—অসীম সাহস আর আশা।

ম্যাক অনর্গল কথা বলে চলে। ইতিহাসের পাতা তুলে ধরে আমার সামনে—কোথায়, কবে, কোন দেশে আর্মেনিয়ানদের উপর অত্যাচার হয়েছিল। কতক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলেছি জানি না, তাকিয়ে দেখি সামনের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে।

দুপুর ১২টার সময় আবার ম্যাক এসে হাজির। বলল সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনের 'লাউঞ্জে' খুব ভালো 'কোল্ড' বিয়ার পাওয়া যাচ্ছে। যদি ইচ্ছে থাকে সে যোগাড় করে দিতে পারে। ডেক প্যাসেঞ্জারদের তো আর অত সুবিধে নেই।

ঘণ্টাখানেক পরে ম্যাক চার বোতল বিয়ার নিয়ে উপস্থিত। সেদিন লাঞ্চ ওর সঙ্গেই খেলাম। যখন শুনল পরদিন সকালে করাচী পৌঁছানর পর আমি কেবিনে শিফট্ করব তখন একটু মনমরা হয়ে গেল।

রাত প্রায় তিনটে। কোন রকমে এক কোণে শুয়েছিলাম। একটু তন্দ্রা এসেছে হঠাৎ কয়েকজন লোকের ফিস্ ফিস্ করে কথাবার্তা শুনে কানটা খাড়া হয়ে উঠল। করাচীযাত্রী কয়েকজন মুসলমান রাজনীতি চর্চা করছিল।

"পাকিস্তান আব মুসলমানোকো রহনে লায়ক নহী রহা"—একজন মন্তব্য করল।

"ক্যুঁ ?"

"সব শরিয়তকে খিলাফ কাম হোরহা হ্যায়। ইয়ে মহম্মদ আলী কোই কামকা নহী। বহুত জ্যাদা বাঙাল কি বাত করতা হ্যায়।"

"কায়েদে-মিলাৎ মরহুম নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খাঁ-সাহেব বহোত আচ্ছে আদমী থে।"

"বিলকুল"

"জী"

"জী"

"জী"

ডেকের আর এক কোণে তাকিয়ে দেখি এক বিরাট বপু আরব দশ টাকায় একটা "হীরা" বিক্রির চেষ্টায় একজন যাত্রীর সঙ্গে ধীরে ধীরে কথা কাটাকাটি করছে। খানিকক্ষণ পর অনেক দরদস্তুর হয়ে সাড়ে সাত টাকায় সওদা হলো। আরব মহাখুশি—একটা রঙীন পাথর সে হীরা বলে সাড়ে সাত টাকায় বেচেছে আর খদ্দের তার চেয়েও বেশি খুশি—সে মোটে সাড়ে সাত টাকায় হীরা কিনতে পেরেছে।

অনেক কষ্টে হাসি চেপে রেখেছিলাম।

রাজনীতি আলোচনা শেষ করে আগের দলটা ততক্ষণে পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে। ভোরের আলো জাহাজের ডেকের ওপর এসে পড়েছে। জাহাজের মধ্যে বেশ একটা গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। 'প্রমিসড্ ল্যাণ্ড' করাচী আর কিছু দূরেই।

করাচী। নামটা মনে হতেই কেমন যেন একটা 'একসাইটমেণ্ট' বোধ করলাম। তাড়াতাড়ি দৌড়ে উপরের ডেকে গিয়ে দাঁড়ালাম। রেলিং-এ ভর দিয়ে খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস নিলাম। ভোরের মিষ্টি হাওয়া বড় ভালো লাগল। জাহাজের ভেঁপু বিকট জোরে বেজে উঠল আর জাহাজ ধীরে ধীরে বন্দরের ভিতরে ঢুকতে শুরু করল। কতদিন পরে আবার করাচী দেখব! নিজের অজান্তেই কোথায় যেন একটু ব্যথা পেলাম। গলাটা ধরে এল—কেন জানি না। ১৯৫৩ সালে বোধ হয় করাচী আমায় মনে করিয়ে দিলো ১৯৪৭-র পার্টিশান আর তার দুঃস্বপ্ন। মানুষে-মানুষে হানাহানি, মারামারি, কত রক্তপাত, কত চোখের জল।

"আর ইউ আনওয়েল?"

ঘুরে দেখি কখন ম্যাকগ্রেগরী আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

"নো ম্যাক। আই অ্যাম অলরাইট।"

ধরা গলায় ম্যাক বলে, "ফ্রম্ নাও অন্ ইউ উইল বি এ কেবিন্ প্যাসেঞ্জার, অ্যাণ্ড আই উইল রিমেন্ ইন্ দি ড্যার্টি ডেক। বাট আই উইল কাম ফর মাই বিয়ার টু ইউ"—শুকনো হাসি হাসে ম্যাক।

"শিওর ম্যাক"—ওর হাতটা শক্ত করে চেপে ধরি।

জাহাজের গ্যাঙ্গওয়ে দিয়ে নামছি। হঠাৎ "আপকা পাসপোর্ট?"

"পাসপোর্ট?"

"হাঁ। আপ্ শহর জাইয়েগা না?"

"জী হাঁ।"

"লাইয়ে আপ্কা পাসপোর্ট। চার ঘণ্টেকা অন্দর ওয়াপস্ আজাইয়েগা। আপ্কা ক্যামেরাভী ছোড়্ জাইয়ে।"

"কুঁ্য?"

"If you want to go ashore, keep your camera here or else stay back in the ship."

পোর্ট অফিসারের হাতে পাসপোর্ট আর ক্যামেরা তুলে দিয়ে মুখ নিচু করে জাহাজের গ্যাঙ্গওয়ে নেমে আসি।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম করাচীর রাস্তার উপর।

স্বাধীন পাকিস্তানের রাজধানী করাচী। মাথার ওপর কে. এল. এম. কোম্পানীর এক বিরাট 'কনস্টেলেশন' দেখি মৌরীপুর এরোড্রমে নামার জন্য বোঁ বোঁ করে ঘুরছে।

"বাণ্ডার রোড চলো"—সামনেই দাঁড়ানো একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়লাম।

চার

ঘরের কোণে রাখা চেয়ারটায় বসে ১৬।১৭ বছরের রোগা, লম্বা একটা ছেলে চুপ করে তার বাবা আর তাঁর বন্ধুর আলাপ

আলোচনা শুনেছিল। বড় বড় চোখে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! কান দুটো খাড়া করে প্রত্যেকটা কথা সে যেন গিলে খাচ্ছিল।

“না, না আপনি ভুল করছেন। ছেলেটার ভবিষ্যৎ খুবই । আপনি ওকে বিলাতেই পাঠান। পারিবারিক ব্যবসার মধ্যে ওকে আর ঢোকাবেন না।”

স্যার ফ্রেডরিক ক্র্যাফ্‌ট্ বেশ জোর গলায় টেবল চাপড়ালেন আর ছেলেটির বাবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন।

ব্যস্ হয়ে গেল ভাগ্যনির্ণয়। শুধু মহম্মদ আলী জিন্নারই না, সারা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাজনীতিরও ভাগ্যনির্ণয় ১৮৯২ সালের এক সন্ধ্যায় করাচীর ‘ভজির ম্যানশন’-এর বৈঠকখানায় সেদিন হয়ে গেল। কোথাকার কোন্ এক সাহেবের উপদেশে ৪০ কোটি মানুষের রাজনৈতিক ভবিষ্যতও সেদিন ঠিক হয়ে গেল। ক্র্যাফট্ সাহেবের মনে হয়তো সেদিন এ ধারণাও ছিল না যে, তাঁর উপদেশের শেষ পরিসমাপ্তি একটা দেশের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটাবে।

কিন্তু নসীবের চাকা যে কোন্ দিকে কখন ঘোরে তা আর কে জানে—নয়তো পারিবারিক ব্যবসা ছেড়ে ১৬ বছরের কিশোর মহম্মদ আলী জিন্নাই বা কেন সাতসমুদ্র পার হয়ে ‘লিঙ্কনস্ ইন’-এ খানা-পিনা করতে যাবেন। কিন্তু কথায় আছে না—‘হোতা ওহি হ্যায়, জো মঞ্জুরে-খুদা হোতা হ্যায়’ (ভগবানের যা মর্জি তাই হয়)। খুদার মর্জি ছিল জিন্না সাহেব ব্যারিস্টার হবেন আর তাই তিনি হলেন। মাত্র ২০ বছর বয়সে জিন্না সাহেব ফিরলেন দেশে—শুধু আইন পড়েই না, বিলাতের রাজনীতির মোক্ষম অভিজ্ঞতা নিয়ে। দাদাভাই নৌরজীকে জিন্না সাহায্য করলেন তাঁর ইলেকশন-এ আর দাদাভাই হলেন পার্লামেন্টের প্রথম ভারতীয় সদস্য।

নসীবের চাকা ঘুরতে লাগল তীব্রগতিতে। করাচী থেকে বম্বে। অ্যাডভোকেট জেনারেল ম্যাকফার্সন সাহেবের সুনজর—প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট স্যার চার্লস অলিভ্যান্ট’র প্রশংসা—পনর শ’ টাকার চাকরী প্রত্যাখ্যান—বাওয়লা মার্ডার কেস্—সোপানের পর সোপান চড়তে লাগলেন জিন্না সাহেব।

তারপর এল ১৯০৬ সাল। জিন্না হলেন দাদাভাই নৌরজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী। নৌরজী তখন কংগ্রেসের সভাপতি। তিন বছর পরে জিন্না হলেন ভাইসরয়ের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মেম্বার। প্রথম বেসরকারী বিল পাইলট করে নাম কিনলেন আর মুসলিম ওয়াকফ্ বিলের আইনরূপ দিয়ে ভাইসরয়কে করলেন মুগ্ধ।

কিরোর পামিস্ট্রিতে আছে 'সাইকল্ অব সেভেন'। সাত বছর ঘুরতে না ঘুরতে ১৯১৩ সালে জিন্না হলেন মুসলিম লীগের সদস্য। তারপর এল লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট, খিলাফত আন্দোলন, সাইমন্ কমিশন, ফোরটিন পয়েন্ট ফরমূলা, ১৯১৯ সালের কংগ্রেসের সঙ্গে বিবাদ, ১৯৩০-৩২ সালের রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স। এল ১৯৩৪ সাল। তিনি হলেন কায়েদে আজম। সারা হিন্দুস্থান ঘুরে বলে বেড়ালেন—"A separate homeland for the Muslims. We are a different nation."

নসীবের চাকা আবার ঘুরল। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট। রাত বারোটায় জন্ম হলো ন-কোটি মুসলমানের জন্য পাকিস্তান। একটা রাজনৈতিক স্বপ্নের বাস্তব পরিসমাপ্তি।

এক বছর যেতে না যেতেই চাকা আরেকবার ঘুরল। ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ রাত ১০-২৫ মিনিটে নসীবের চাকা শেষবারের মতো ঘুরে নিশ্চল হয়ে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে ট্যাক্সি করে এসে সেদিন যখন কায়েদে আজমের মার্বেল সমাধির সামনে দাঁড়ালাম তখন এই কথাগুলোই ভাবছিলাম। জিন্নার কর্মবহুল জীবনের বহু খুঁটিনাটি কথাই মনে আসছিল। বম্বেতে তাঁর মালাবার হিলস্-এর 'মাউন্ট প্লেজেন্ট' সামনে ভেসে উঠল।

খবরের কাগজের কয়েকজন লোক গিয়েছিলাম জিন্না সাহেবের কাছে তাঁর ইন্টারভিউ নিতে। মিনিট পাঁচেক পরে বেরিয়ে এলেন। মুখে সিগারেট, পরনে সাদা সার্জের বিলাতি স্যুট। অপূর্ব 'ম্যানারস' (Manners)। চা এল। কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথা নিয়ে গল্প হলো। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটা

প্রস্তাবের উপর যেই তাঁর অভিমত চাওয়া হলো জিন্না সাহেব একেবারে রেগে উঠলেন। তাঁর চোখ দুটো হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল। টেবিল চাপড়ে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলেন—

"I am not prepared to give any interview to the Hindu press, which will distort it and use it against me. You are all Congress lackeys. Let us be good friends and talk something else."

তাঁর সেই বিদ্বেষ, সেই ঘৃণাভরা চাউনি আজও ভুলতে পারিনি। সেদিন সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে বহুদিন আগে বিখ্যাত আমেরিকান সাপ্তাহিক 'টাইম'-এ প্রকাশিত একটা ম্যাপের কথা মনে পড়ল। ভারত আর পাকিস্তানের একটা ম্যাপের নিচে 'টাইম' পত্রিকা ক্যাপশন দিয়েছিল—'Pieces of Hate'. শুভ্র মার্বেলের তৈরি সমাধির সেই শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেকথা বার বার কেবলই মনে হতে লাগল। 'Death is a great leveller' কথাটাও কেন জানি না ভুলতে পারছিলাম না। সঙ্গে আনা কিছু ফুল সমাধির উপর সন্তর্পণে রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, আর শান্ত পরিবেশের সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে হঠাৎ ইরশাদ শ্লেষের স্বরে বলে উঠল "ভাইজান"।

কঠিন বাস্তবের আঘাতে সম্বিৎ ফিরে আসে। অন্যমনস্কভাবেই উত্তর দিই "বলো ইরশাদ ভাই?"

ইরশাদকে এখানে আসার সময়ে একটা 'বার' থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। সে তখন বিয়ারের নেশায় চুর।

জড়িয়ে জড়িয়ে বললো, "ভাইজান, ইকবাল পড়েছ?"

'মজহব নহী শিখাতা আপস্ মে ব্যার রাখ্না।
হিন্দী হ্যাঁয় হাম—বতন হ্যায় হিন্দোস্তাঁ হামারা॥
সারে জহাঁ সে আচ্ছা……'

অমর কবি ইকবালের অমর পংক্তি। 'ধর্ম কাউকে শেখায় না শত্রুতা,—হিন্দুস্তানী মোরা, দেশ মোদের হিন্দুস্তান।' জিন্না সাহেবের সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে ইরশাদ বোধহয় ব্যঙ্গ করছিল অদৃষ্টের পরিহাসকে। 'টু নেশন থিওরি' আর ধর্মের ভিত্তিতে গড়া পাকিস্তানের জন্মদাতার 'মাজার' (সমাধি)-এর সামনে ধর্মের

একতার বাণী। পাকিস্তান আবার আজ ইকবালকে বলে 'পাকিস্তানের ন্যাশন্যাল পোয়েট', যেমন বলে নজরুলকেও।

কথা ঘুরিয়ে ইশরাদকে জিজ্ঞাসা করি "জিন্না সাহেবের শেষমুহূর্ত সম্বন্ধে কিছু জানো?"

"একটা বিরাট ট্র্যাজেডি ভাইজান। যে গলা দিয়ে এত বিষ ছড়িয়েছিল তাঁর থ্রোটে ক্যানসার তো হবেই। যাকগে, যা শুনেছি তাই বলছি। জিয়ারত থেকে কোয়েটায় ফিরে আসেন আর সেইখানেই শরীর একেবারে ভেঙে পড়ে। বললেন, 'আমাকে করাচীতে নিয়ে চল'। ১১ই সেপ্টেম্বর এলেন করাচীতে আর সেই রাতেই সব শেষ"। ইরশাদ থামল।

ইরশাদ আবার বলতে লাগল "জানি না কতদূর সত্যি, কিন্তু কেউ কেউ বলে যে, ১০ তারিখে জিন্নার দিদি ফতিমা তাঁকে বিছানা থেকে একটু উঠে একদাগ ওষুধ খেতে বলায় জিন্না বলেন যে, বিছানা থেকে উঠতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। জানো ভাইজান, এই সিচুয়েশনটা মনে হলে আমার এক কবির দুটো অপূর্ব লাইনের কথা মনে পড়ে"—একটু গম্ভীর হয়ে ইরশাদ কবিতাটা আবৃত্তি করল।

'কাল তো কহতে থে বিস্তর সে উঠা জাতা নহী।
আজ দুনিয়া সে চলে জানে কি তাকত আগই॥'

অপূর্ব! কবি তাঁর প্রেয়সীকে বলছেন "কাল তো বলেছিলে শয্যা থেকে উঠতে কষ্ট হচ্ছে আর আজ পৃথিবী থেকে চলে যাবার শক্তি তুমি পেয়ে গেলে!"

কোনো একটা ট্র্যাজিক সিচুয়েশনের মধ্যে হাসির খোরাক যোগাতে বোধহয় দুনিয়াতে ইরশাদের জুড়ি আর কেউ নেই। কবিতাটার লাইন দুটো তখনও একটু ভাববার চেষ্টা করছি এমন সময়, "কিন্তু কায়েদে আজম বড় অবিচার করে গেলেন। শুনেছি তাঁর কাছে নাকি ৩০০ গরম স্যুট ছিল। কয়েকটা আমার মতো লোককে দিয়ে গেলে কিছু কাজ হতো"—বলে ইরশাদ নিজের কোটের একটা ছেঁড়া অংশ আমার দিকে তুলে ধরল।

"জিন্না সাহেব ৩০০ স্যুট, ১০০ খানেক ফাইল, অজস্র টাকা, দিদি ফতেমা আর মুসলিম লীগকে রেখে মারা যান। মরার সময় কেউ কিছুই নিয়ে যেতে পারে না"—

—এবার ইরশাদকে দার্শনিকের মতো শোনা যায়।

"মানুষের মৃত্যু নিয়ে অনেক কবিই অনেক কিছুই লিখেছে। তোমাদের Tagore লিখেছেন, Death Oh my Death, come and whisper in my ears, কিন্তু কবীরের মতো বুঝি কেউই লেখেনি" ইরশাদ এবার কবীরের দোঁহা শোনায়—

'হম্‌কা ওড়াবে চাদরিয়া রে, চলতি বিরিয়া
প্রাণরাম যব নিকসন্‌ লাগী
উলট গই দোনয়ন-পুতরিয়া ॥
ভীত্‌র সে জব বাহার লায়ে
ছুট্‌ গই সব্‌ মহল আট্‌রিয়া ॥
চার জনে মিলি খাট উঠায়ন,
রোবত্‌ লে চলে ডগ্‌র ডগ্‌রিয়া
কহত কবীর শুনো ভাই সাধো
সঙ্গ চলেগী ওভী সুখী লক্‌ড়িয়া ॥

ঐ শেষের লাইনেই সব। মরবার সময়ে তুমি যাবে, তোমার সঙ্গে যা যাবে, তা শুধু কিছু শুকনো কাঠ, আর কিছুই না।

ইরশাদ হেসে বললো, "চল যাই, একটু নমাজ পড়ে আসি।"

ইরশাদ আর নমাজ। কালনেমীর মুখে রামনাম। একটু ত্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলাম। বললাম, "সে কী হে, মসজিদে আবার তোমার কি কাজ? বিয়ারের গন্ধে তোমার খুদা যে পালিয়ে যাবেন।"

"না, ভাইজান, নেশাটা আজ তোমার জন্য ভালো করে জমতে পারেনি। তাই খুদাতালার কাছে একটু আর্জি পেশ করতে হবে।"

"কিন্তু ইরশাদ-ভাই, শুনেছি তোমাদের কোরানে নাকি মদ্যপান পাপ?" একটু মস্করা করি।

"বিলকুল গলত্‌। একেবারে ভুল মোদ্দা কথা হচ্ছে—'পিনা হারাম নহী, নশা হারাম হ্যায়'। মানে মদ্যপান পাপ না, মাতলামি করা অতি গর্হিত কাজ।"

একেবারে ডাইলেকটিক্সের লজিক।

একরকম জবরদস্তী করেই ইরশাদকে ট্যাক্সিতে টেনে ওঠাই। কবি মানুষ আর তার উপরে আবার বিয়ারের কিঞ্চিৎ রঙীন

নেশা। ইরশাদের ততক্ষণে বেশ 'মুড' এসে গিয়েছে। ট্যাক্সিতে উঠেই ওকে ইকবালে পেয়েছে।

"ইকবালের একটা অপ্রকাশিত কবিতা শুনবে? জানি না আসলে কার লেখা। কিন্তু কেউ কেউ বলে নাকি ১৫ বছর বয়সে ইকবাল তাঁর ভূগোলের খাতায় একটা ম্যাপ এঁকে তার উপরে লিখেছেন।

'গোসল্‌খানা পঁহুচ গয়া বাবুর্চিখানা সমঝকে।
বোরীমে হাত ডাল দিয়া দস্তানা সমঝকে॥
দিল্লী পঁহুচ গয়া, লুধিয়ানা সমঝকে।
মস্‌জীদ পঁহুচ গয়া ময়খানা সমঝকে॥'

মানে,

বাবুর্চিখানা ভেবে গোসলখানাতে পৌঁছে গেলাম। দস্তানা ভেবে হাত ঢোকালাম চটের থলিতে। লুধিয়ানা যাব ভেবে চলে গেলাম দিল্লী আর পানাগার মনে করে মসজিদে ঢুকলাম।

ইরশাদ নিজেই হেসে খুন। ইরশাদকে ঠেকানো দায়। ও একেবারে যাকে বলে 'ইরেসিস্‌টিবল'। আর একবার যখন ইকবাল নিয়ে পড়েছে, ক্লিফটন্‌ বীচ না পৌঁছান পর্যন্ত ও আর থামবে না।

আজ স্যার মহম্মদ ইকবালকে আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। উর্দু সাহিত্যের চেনা-অচেনা, বিখ্যাত-কুখ্যাত কবি আর 'শায়র'দের বাজে লেখনীর নিচে সেই মহাকবি আর তাঁর অমর কীর্তি আজ প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছে। উর্দু আর ফারসীতে অনেক কবিই হয়েছেন, কিন্তু কয়েকজন ছাড়া কেউই ইকবালের স্বচ্ছ ভাষা আর শৈলীর কাছ দিয়েও ঘেঁষতে পারেননি। ঠিক জানি না কিন্তু আমার মনে হয়, এযুগের কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ইকবালের মতো আর কোনো কবিরই লেখা এত দেশী-বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়নি। এদেশে আমরা অবশ্য ইকবালের লেখা অনুবাদ করবার কোনো চেষ্টাই করিনি। হিন্দীর আক্রমণে উর্দু প্রায় লোপ পেতে বসেছে।

একজন বিদেশী লেখক ইকবাল সম্বন্ধে লিখেছেন, 'Like

Goethe Iqbal is a great seer and humanist'। উর্দু সাহিত্যের কতটুকুই বা জানি? কিন্তু যতবারই ইকবালকে পড়তে আর বুঝতে চেষ্টা করেছি, তাঁকে ততই বেশি ভালোবেসেছি। কি অনবদ্য কল্পনাশক্তি, কি ছন্দ, কি ভাবধারা!

ইকবাল লিখতেন উর্দু আর ফারসী ভাষায়। একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি হঠাৎ ফারসীতে কেন লেখা শুরু করলেন। ইকবাল উত্তর দেন—'আমি আরবী ভাষায় লিখতে পারি না বলেই ফারসীতে লিখতে শুরু করি।' কিন্তু ইকবালের সাহিত্য আজ আরব দুনিয়ার কোণেও পৌঁছে গিয়েছে। তাঁর 'তারানা-ই-মিল্লি'র আরবী অনুবাদ 'আল-বসির' পত্রিকায় প্রকাশিত করে হাসান-অল্-আজমী সাহেব আরব দুনিয়ার কৃতজ্ঞভাজন হয়েছেন। মিশরের কবি সৈদী অলী সবলান্ অনুবাদ করেছেন ইকবালের অমর কীর্তি 'শিকওয়া আউর জবাব-শিকওয়া'। ইরাকের বিখ্যাত মহিলা কবি আমিনা নুরুদ্দিনও বাগদাদে ইকবালের অনেক কবিতা আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

কিন্তু ইকবালকে আরবী দুনিয়ায় পরিচয় করিয়ে দেবার গৌরব দাবী করতে পারেন বিখ্যাত সাহিত্যিক ডক্টর আবদুল ওহাব আজম। তিনি আগে রুমীর 'মাথনাওই' অনুবাদ করেছেন আর ইকবালের 'পায়াম-ই-মশরীক'র অনুবাদ তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি। কিছুদিন করাচীতে থেকে উর্দু শিখে তিনি ইকবালের 'জবর-ই-কলিম'ও অনুবাদ করেন। টার্কীতে ডাঃ অলী গনজেলী, ইন্দোনেশিয়ার বহরাম রঙ্গাকুটী, আর ইরানে বাহার খোরসানী তাঁর 'সবক্-সিনাসী' নামক বইয়ে ইকবালের কবিতা নিয়ে পুরো একটা অধ্যায় লিখেছেন।

পাশ্চাত্য সাহিত্যেও ইকবালের দান কিছু কম নয়। ডাঃ নিকলসনের 'আসরার-ই-খুদীর' অনুবাদ, আরবারীর 'পায়ম-ই মশরীক'র অনুবাদ, সুন্দর সাহিত্য-কীর্তি। আরবারী 'পায়ম-ই মশরীক'র অনুবাদ পদ্যে করেছেন আর তাঁর নাম দিয়েছেন 'Tulips of Sinai'। পরে তিনি অনুবাদ করেন 'জবুর-ই-আজমের' গজলগুলো আর নাম দেন 'Persian Psalms'। কিরনান সাহেব লেখেন 'Poems of Iqbal'। আলতাফ হুসেনের

'শিকওয়া আউর জবাব-শিকওয়ার' ইংরেজী অনুবাদ, নিয়াজের 'খিঞ্জরী রাহর' অনুবাদ ছাড়াও আরবারী সাহেব করেন 'রমুজ-ই-বেখুদী'র অনুবাদ।

'দিওয়ান-ই-সমসী তাবারেজের' অনুবাদের ভূমিকায় প্রোফেসর নিকলসন লিখেছেন,

"My translation seems to reconcile the claims of accuracy and art, it is therefore in prose."

ইরলাঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর হেল 'পায়াম-ই-মশরীকর' অনুবাদ জর্মন ভাষায় করেন, কিন্তু প্রকাশিত হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর আনেমারী সিমেলের কাছে বোধহয় সেই পাণ্ডুলিপিগুলি এখনো আছে। ফ্রান্সের মাদাম ইভা মেয়রোভিচ ইকবাল পড়ে এতই অভিভূত হন যে, তিনি ফারসী ভাষা শিখছেন, 'জবুর-ই-আজম' ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করার উদ্দেশ্যে।

প্রথম ইয়োরোপীয় ভাষায় ইকবাল অনূদিত হন ইটালীয়ান-এ। প্রোফেসর আলসেনডরো বাসোনী ইকবালের 'জবিদনামা' 'Il Poema Celeste' নাম দিয়ে সুন্দর অনুবাদ করেছেন। হেলসিঙ্কির একটি ছাত্র কিছুদিন আগে ইকবাল সম্বন্ধে একটি থিসিস্ লিখেছে। আমেরিকার ইয়েল ইউনিভার্সিটির প্রোফেসর নর্থপের পরিচালনায় ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও ইকবাল সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা হচ্ছে। করছে সবাই শুধু আমরা ছাড়া। বছরে একবার 'ইকবাল-মুশায়রা' করেই আমরা খালাস।

ইকবালের ফারসী ভাষায় লেখা কবিতা অনেক আগেই আফগানিস্থানে প্রচারিত হয়। তিনি তাঁর অমর কীর্তি 'পায়াম-ই-মশরীক' আফগানিস্থানের ভাগ্যহীন রাজা আমানুল্লাকে উৎসর্গ করেন। আমানুল্লা যখন দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান, তখন জেনারেল নাদির খান আফগানিস্থানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রস্তুত হন। লাহোর স্টেশনে ইকবাল তাঁর সঙ্গে দেখা করেন আর তাঁকে প্রচুর অর্থসাহায্য করতে তৈরি হন। নাদির খাঁ, যতদূর জানা যায়, অর্থসাহায্য নেননি, কিন্তু ইকবালের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা জন্মায় আর ১৯৩৩ সালে তিনি ইকবালকে

আফগানিস্থানে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তখন জহির শাহ আফগানিস্থানের রাজা। ইকবাল ফিরে এসে 'The Traveller' নামে একটা কবিতায় তাঁর আফগানিস্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। কাবুলে ইকবালের বিরাট অভ্যর্থনা হয়েছিল ও এক সম্বর্ধনা-সভায় তাঁকে "Poet-prophet of the East" বলে অভিহিত করা হয়। সর্দার সালাউদ্দিন সেলজুকী অনেকদিন পর্যন্ত দিল্লীতে আফগানিস্থানের কন্সাল-জেনারেল হিসাবে ছিলেন এবং তিনি ছিলেন ইকবালের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। যতবার ইকবাল দিল্লী গিয়েছেন, তিনি সেলজুকীর গৃহেই আতিথ্য স্বীকার করেছেন।

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যখন ১৭ বছর বয়েসে লাহোর 'আঞ্জুমান-ই-হমায়ত ইসলাম'-এর এক সভায় ভাষণ দেন মহাকবি ইকবাল আর হালি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা দু'জনেই মৌলানা সাহেবের প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হন।

প্রোফেসর কিরনানের 'Poems of Iqbal', কবির উর্দু কবিতাগুলির অনুবাদ। একটি কবিতার অনুবাদের কিছু অংশ :

> "...You are a pinch of dust, and blind ; I am a
> Pinch of dust that feels—
> Are You the flowing stream that lifts from
> life's dry fields, their blight or I ?'

প্রোফেসর আরবারীর 'Tulips of Sinai'-এ এক জায়গায় লিখেছেন :

> '...Thou art the painter ; thy design
> Inspires and moves this brush of mine ;
> Thy hands the living world, adorn,
> And shape the ages yet unborn.
> Much sorrow in my heart I had
> That by the tongue could not be said ;
> Love, lovelessness, truth, treachery—
> All things alike are sprung of thee.'

প্রজাতন্ত্রবাদের (ডেমোক্রেসীর) ব্যাখ্যা অনেক রাজনৈতিক

দার্শনিকই করেছেন, কিন্তু ইকবাল দু'লাইনে যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা অতুলনীয়। ডেমোক্রেসী কি? ইকবাল বলছেন,

'জমহুরিয়ত বহ্ তর্জেহুকুমত্ হ্যাঁয় জিস্‌মে
বন্দোকো গিনা করতে হ্যাঁয়, তোলা নহী করতে।'

দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবে মহাকবি হয়তো চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, তাই অনেক আগে লেখেন—

'বতন কি ফিক্‌র্ কর্ নাদাঁ, মুসীবত আনেওয়ালী হ্যায়
তেরী বর্‌বাদিয়োঁ কে মশ্‌বিরে হ্যাঁয় আস্‌মানোঁ মে॥'

অনুবাদের ধৃষ্টতা না করে ইকবালের অমর সৃষ্টি থেকে কয়েকটা লাইন তুলে দিলাম :

'কিয়া রফয়ত কী লজ্জত্ সে ন দিল্ কো আশ্‌না তুনে,
গুজারী উম্রপস্তী মে মিসালে-নক্‌সেপা তুনে;
ফিদা করতা রহা দিল্ কো হসীনো কী অদাঁয়োপর
মগর দেখী ন ইস্ আইনে মে আপনী অদা তুনে॥

'ঢুঁড়তা ফিরতা হুঁ এ 'ইকবাল' অপ্‌নে আপকো
আপ হী গোয়া মুসাফির আপ হী মনজিল হুঁ ময়'।

'দুনিয়া কি মহফিলোঁ সে উক্‌তা গয়া হুঁ ইয়ারব্,
কয়া লুৎফ্ অঞ্জুমন মে জব দিল্ হী বুঝ গয়া হো'।

'উঠায়ে কুছ বরক্ লালে নে, কুছ নরগিস্‌নে কুছ্ গুল্‌নে,
চমন মে হর্ তরফ্ বিখ্‌রী হুই হ্যায় দাঁস্তা মেরী'।

আর বিখ্যাত সেই চার পংক্তি :

'ফিরদোস্ মে রুমী সে ইয়ে কহতা থা সানাই
মশরিক্ মে অভীতক হ্যায় বহী কাস্ বহী আশ
হল্লাজ্ কী লেকিন ইয়ে রবায়ৎ হ্যায় কি আখির
ইক মর্দে কলন্দর নে কিয়া রাজে খুদী ফাশ॥'

ইরশাদকে ইকবালে পেয়েছিল, তাই ইকবালের সম্বন্ধে এত কথা আমারও মনে হলো। অনেক চেষ্টা করেছি মহাকবি ইকবালকে বুঝতে। কিছু নিজে বুঝেছি কিছু ইরশাদ বুঝিয়েছে, কিন্তু মনে হয়, ইকবালের গভীরতার কোনো হদিসই আজ পর্যন্ত পেলাম না।

"লেও ভাইজান, ক্লিফটন বীচ আগয়ে।" ইরশাদ বলে ওঠে।

পাঁচ

আশ্চর্যনগরীতে গিয়ে রূপকথার অ্যালিস্ একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীন পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে এসে মনে হয় যে, পাকিস্তানের রাজনীতিও 'অ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের' মতো 'গেটিং কিউরিওসার এ্যাণ্ড কিউরিওসার' (Curiouser)—আশ্চর্য থেকে আশ্চর্যতর। কখন যে কি হবে বলা যায় না, কোথায় এর পরিণতি ভাবতে মাঝে মাঝে ভয় হয়। নাজিমুদ্দিন, লিয়াকৎ আলী, মহম্মদ আলী, চৌধুরী মহম্মদ আলী, শহীদ সুরাবর্দী, গুলাম মহম্মদ, ইসকন্দর মির্জা—নয় বছরের মধ্যে কত যে লোক এল-গেল তার হিসাব মেলানই মুশকিল ব্যাপার। রাজনীতির অছিলায় ৯ কোটি লোকের ভাগ্য নিয়ে যে ছিনিমিনি চলছে তার শেষ কোথায় ?

অনেকদিন আগে শ্রীনগরে এক সন্ধ্যায় ঘণ্টাখানেক ধরে আলাপ করেছিলাম বৃদ্ধ গুলাম রসুলের সঙ্গে। রসুল রাজনীতি জানে না। আজাদ কাশ্মীরে আজাদীর পাত্তা না পেয়ে পালিয়ে এসেছিল শ্রীনগরে। ঘণ্টাখানেক পরে যখন রসুলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি, জলভরা চোখে সে একটা কথাই বলেছিল 'সাহাব্ হাম বরবাদ্ হোগায়া।' ছোট্ট চার অক্ষরের একটা কথা 'বরবাদ্' কিন্তু পাকিস্তানের ভবিষ্যতের ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। পাকিস্তানের প্রতি কোনো বিদ্বেষই আমার নেই। চেয়েছিলাম পাকিস্তানও আমার দেশের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠুক, সমৃদ্ধিশালী হোক্—মাঝে মাঝে মনে সন্দেহের মেঘ জমে ওঠে।

আজ নয় বছরের হিসাব নিকাশ করতে গেলে অনেক গলদই বেরোবে। কত এগ্রিমেণ্ট, কত আলোচনা, কত কিছুই তো হলো, কিন্তু সব পড়ে রইল ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। নেহরু-লিয়াকৎ প্যাক্ট নিয়ে লোকের মনে কত আশাই হয়েছিল, কিন্তু কোথায় সে প্যাক্ট। লিয়াকৎ আলী বেচে থাকলে জানি না কি হতো কিন্তু আজ সে প্যাক্ট-এর কোনো দামই নেই।

সেদিন সকলে আলতাফ্ হোসেনের 'ডন' কাগজটা পড়ে মনটা বড় বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। পাকিস্তানকে তখন 'রিপাবলিক' করার জন্য খুব তোড়জোড় চলেছে। 'ডন' এক মস্ত সম্পাদকীয় লিখে প্রশ্ন করেছিল, 'Republic for the People or Republic for the Few'। আসল কথা ওখানেই। সেই চিরন্তন ঝগড়া 'হ্যাভস্ আর হ্যাভ-নটস্'দের মধ্যে, যাদের আছে আর যাদের নেই। এত হৈ চৈ এত চেঁচামেচি, কিন্তু 'যাদের নেই' তাদের আজও কিছু নেই। কত আশা কত উৎসাহ নিয়ে হাজার হাজার লোক গিয়েছে সীমান্তের ওপারে—কিন্তু পায়নি কিছুই। জিন্না সাহেবের সমাধির কিছু দূরেই করাচীর দুর্গন্ধময়, নোংরা রিফিউজীদের কলোনী দেখে এসেছি। ভোরবেলায় মোয়াজ্জিনের আজানের সঙ্গে সঙ্গে তারা অভিশাপ দিতে শুরু করে নিজেদের ভাগ্যকে আর পাকিস্তানের গভর্নমেণ্টকে। বাঙালী দেয় পাঞ্জাবীকে গালি, সিন্ধী দেয় পাঞ্জাবীকে গালি, উত্তর প্রদেশের মুসলমান দেয় বাঙালী, পাঞ্জাবী আর সিন্ধীকে গালি আর ছয় ফুট উঁচু পাঠান করে সবাইকার বাপান্ত।

আমার বন্ধু মোয়েদ সিদ্দিক। একদিন হঠাৎ নাগপুর থেকে চলে গেল। মাসখানেক পরে লাহোর থেকে চিঠি 'I have come over to this side', তারপর আর চিঠি পড়া যায় না। মধু আর দুধের নদী দেখতে গিয়েছিল মোয়েদ, কিন্তু দেখেছিল শুধু 'খুন আউর আঁসুকী দরিয়া।' কিন্তু নাগপুরের ফার্নিচার বিক্রেতা হাজি ফজলের সঙ্গে করাচীর রাস্তায় দেখা হতে সে জানাল, সে মহা সুখেই আছে। ফার্নিচার ব্যবসা ছেড়ে পাঠ্য-পুস্তকের (text book) ব্যবসা করছে। বই ছাপা হবে বিলেতে। দু'দিন পরেই হাজি ফজল বিলেত চলে গেল। ঘুরে ফিরে সেই একই কথা 'হ্যাভস্' আর 'হ্যাভ নটস্'।

সেদিন করাচীর রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে দেখছিলাম পণ্ডিত নেহরুর অভ্যর্থনার জন্য শহরে বেশ তোড়জোড় চলছিল। মহম্মদ আলী প্রধান মন্ত্রী হয়ে নেহরুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ভারতবর্ষে আর পাকিস্তানে মহম্মদ আলীর নেতৃত্বে অনেকেরই

আস্থা হয়েছিল। কিন্তু কি হলো? কাজের মধ্যে মহম্মদ আলী বেইরুটে গিয়ে আরেকটা বিয়ে করে খুব হৈচৈ করলেন আর দিয়ে গেলেন পাকিস্তান-আমেরিকান মিলিটারী প্যাক্ট। তারপর এলেন চৌধুরী মহম্মদ আলী। তাঁর দান হলো বাগদাদ প্যাক্ট আর 'সিটো'। নাজিমুদ্দিন, লিয়াকৎ আর গোলাম মহম্মদ তো আগেই গিয়েছেন। দেখা যাক, শহীদ সুরাবর্দী আর ইস্কন্দর মির্জা সাহেব এবার কি করেন। ক'দিনে যে ভেল্কি দেখিয়েছেন, তাতে বেশ ঘাবড়েই যেতে হয়। আবার শহীদ সাহেবের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশনটা' মন থেকে মুছে ফেলতে বেশ একটু মুশকিলই হয়।

কিন্তু মিশরের সুয়েজ ক্যানালের ব্যাপারটা নিয়ে মির্জা আর শহীদ সাহেব একটু বানচাল হয়ে পড়েছিলেন। বাগদাদ প্যাক্টের অবস্থাও সঙ্গীন। দু'জনেই 'সেলসম্যান' হয়ে ঘুরে বেড়ালেন মধ্য প্রাচ্যে, প্যান-ইসলাম-ইজমের টোট্‌কা নিয়ে—কিন্তু কেনার লোকই নেই। প্যান-ইসলাম-ইজমের দিন ঘনিয়ে এসেছে। মিশরের নাসেরের ওপর খাপ্পা হয়ে গিয়েছিলেন দু'জনেই। নাসের ওদের 'কায়রো টকস্'-এ আমন্ত্রণ তো জানালেনই না, উপরন্তু ইউ. এন. ফোর্সে পাকিস্তানের সৈন্য নিতেও তিনি নারাজ। সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে আর তার ওপর আবার আওয়ামী লীগও প্রায় ভেঙে পড়ার মতো হয়েছে। হাঙ্গারীর ব্যাপারটা নিয়ে পাকিস্তান একটা বেশ চাল চেলেছিল, কিন্তু কিস্তিমাত হলো না। ইউ. এন. হস্তক্ষেপের দোহাই দিয়ে মির্জা সাহেব আর শহীদ সাহেব কাশ্মীরের বেলায়ও সেই নীতি লাগাবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ মেনন সব গোলমাল করে দিলেন। অতঃপর কি করা যায়? বসে আছেন দু'জনেই, 'দুসরা মোওকা' খুঁজছেন। কিন্তু ভাবনা হয়, দুসরা মোওকা আসার আগে পদ্মপত্রে জলবৎ পাকিস্তানের রাজনীতিতে মির্জা-সুরাবর্দী পার্টনারশিপ টিকে থাকলে হয়।

পাকিস্তানের কথা ভাবলেই আজ মনে পড়ে গভর্নর-জেনারেল গুলাম মহম্মদের কথা। গুলাম মহম্মদ না থাকলে পাকিস্তানের অবস্থা যে কি হতো বলা কঠিন। রাজনীতির মারপ্যাঁচের মধ্যে থেকেও তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, 'পলিটিক্স ইজ দি লাস্ট

রিফিউজ অব অল স্কাউণ্ড্রেলস'। নিশ্চিত 'বরবাদী' থেকে তিনি অনেকবারই পাকিস্তানকে বাঁচিয়েছেন। খাজা নাজিমুদ্দীনের বরখাস্ত আর কনস্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীর অবসান ঘটিয়ে তিনি পাকিস্তানের রাজনীতিতে বেশ একটা তোলপাড়ের সৃষ্টি করেন। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে জিন্না সাহেব পাকিস্তানের ভবিষ্যতের সঙ্গে গুলাম মহম্মদকে জড়িয়ে যান। কিন্তু গুলাম মহম্মদ জিন্নার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করতে পারলেন না। ওপারের ডাক এসে গেল।

গুলাম মহম্মদ সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা যায়। একবার সাত দিন ধরে তিনি নিজের আপিস-ঘরে বসে পাকিস্তানের বাজেট তৈরি করেন। বাজেট শেষ হয়ে গেলে একটা ইজি-চেয়ারে গিয়ে বসেন, হাতে একটা বই। চেয়ারে পা তুলে দিয়ে হঠাৎ তিনি বিকট জোরে হেসে ওঠেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী দৌড়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে অবাক! গুলাম মহম্মদ হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন। উঁকি মেরে প্রাইভেট সেক্রেটারী দেখেন, গুলাম মহম্মদের হাতে 'জীভস্ ওমনিবাস'।

জানি না কতদূর সত্যি, কিন্তু লণ্ডনের 'টাইমস' খবরের কাগজের প্রতিনিধি রজার টুলমিন্ আমায় একবার বলেছিল যে, মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই গুলাম মহম্মদের মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না। রজার বলেছিল, তাঁর নাকি মাঝে মাঝে 'ডিলুউশন' হতো। একদিন রাত বারোটার সময় কমাণ্ডার-ইন-চীফকে ফোনে অর্ডার দেন, জেনারেল মোবিলাইজেশনের। পরের দিন সকালে যখন তাঁর কাছ থেকে লেখা অর্ডার চাওয়া হয়, গুলাম মহম্মদ মনেই করতে পারেন না যে, রাতে তিনি কোন অর্ডার দিয়েছিলেন।

তবু মাঝে মাঝে ভাবি যদি গুলাম মহম্মদ আরো কিছুদিন সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতেন, তাহলে বোধহয় ভালোই হতো—পাকিস্তানের তো বটেই—ভারতবর্ষেরও।

পাকিস্তানের কথা ভাবতে গেলে আজ আরেকজনকে মনে পড়ে—খান আবদুল গফফর খান—সীমান্ত গান্ধী। শিশু-সুলভ,

সৌম্যমূর্তি, সেই বৃদ্ধ সেদিনও ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে আর ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, তিনি বন্দী হন তাঁর ভাই ডাঃ খান সাহেবের হুকুমে। কতবার তাঁকে কংগ্রেস সেশনে দেখেছি। পকেট-ভর্তি কাজু-কিসমিস নিয়ে প্যাণ্ডেলের বাইরে এসে ছোট ছেলেমেয়েদের বিলোচ্ছেন! দুর্ধর্ষ পাঠানদের নেতা, অহিংসার প্রতীক সীমান্ত গান্ধী জেলে বসে হয়তো 'থোরো'র (Thoreau) মতোই ভেবেছেন, 'অন্যায়ের সময় ন্যায়ভক্ত লোকের স্থান কারাগারেই।'

বাদশাহ খানের পিতা বহরাম খান সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকারের পক্ষে লড়েছিলেন আর তাঁর ছেলে জীবন-ভোর যুদ্ধ করলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। বাদশাহ খান যখন আলীগড়ে পড়তেন, তখন মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 'আল-হিলাল' পত্রিকার লেখা তাঁকে রাজনীতিতে আকৃষ্ট করে। তারপরের ইতিহাস কারোর অজানা নেই। পাকিস্তানের জন্মের পরেও তাঁর কারাজীবন শেষ হয়নি। দীর্ঘ আট বৎসর পরে ছাড়া পেয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন উৎমনজাইতে, মোজেসের 'প্রমিসড ল্যাণ্ডে' প্রত্যাবর্তনের মতো। ওল্ড টেস্টামেন্টের 'প্রফেটের' মতো এই দীর্ঘকায়, সুপুরুষ পাঠান বারবার ফিরে গিয়েছেন কারাগৃহে। তাঁকে বাইরে রাখতে পাকিস্তানের কর্তাদের সাহস নেই।

'রাওয়ালপিণ্ডি কনস্পিরেসী' কেসে পাকিস্তানে যে ক'জন লোককে ধরা হয়েছিল, তার মধ্যে অন্তত দু'জন, মেজর-জেনারেল আকবর খান আর ফৈজ আহমদ ফৈজ নাম-করা লোক। মেজর-জেনারেল আকবর খান এবার রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন আর কাশ্মীর আক্রমণ করার হুমকি দিচ্ছেন। খবরের কাগজে একটা বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে, কাশ্মীর যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের কমাণ্ডার-ইন-চীফ জেনারেল গ্রেসী জিন্না সাহেবের বলা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ আক্রমণ করেননি।

আর ফৈজ আহমদ ফৈজ কবি। তাঁকে পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ 'শায়র' বললেও অত্যুক্তি হবে না! অপূর্ব তাঁর কল্পনা-শক্তি আর

লেখন ভঙ্গি। পিণ্ডি কেসের বন্দী অবস্থায় তিনি তাঁর জীবনের কিছু শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা করেছেন। 'পাকিস্তান টাইমস্'-এর তিনি নির্ভীক সম্পাদক আর তাই বন্দী অবস্থায়ও তাঁর লেখনীকে বন্ধ করার সরকারী প্রয়াসকে ব্যঙ্গ করে লিখলেন :

'মতাএ-লৌহ-কলম্ ছিন গইতো ক্যায়া, গম্ হ্যায়,
কি খুনে-দিল্ মে ডুবোলী হ্যায় উঙ্গলিয়া ময়নে ;
জবাঁ পে মুহর্ লগী হ্যায় তো ক্যায়া, কি রখ্ দী হ্যায়
হর এক হল্কয়ে জন্জীর মে জবাঁ ময়নে ॥'

আমার হাতের কলম কেড়ে নেওয়াতে আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি আমার আঙুল ডুবিয়ে নিয়েছি রক্তরাঙা হৃদয়ে। আমার মুখ বন্ধ করে দেওয়াতে কি হয়েছে, প্রত্যেক শৃঙ্খলের গলায় আমার ভাষা আমি রেখে দিয়েছি।

'সুবহে—আজাদী' কবিতায় ফৈজ পাকিস্তানে স্বাধীনতার রূপ দেখে তাঁর ব্যথা প্রকাশ করেছেন।

'ইয়ে দাগ্ দাগ্ উজালা ইয়ে শব গুজেদা সহর,
বহ ইন্তেজার্ থা জিসকা, ইয়ে ব ; সহর তো নেহী ;
ইয়ে বহ্ সহর তো নেহী জিস্কী আরজু লেকর
চলে থে ইয়ার কি মিল্ জায়গী কঁহি না কঁহি ॥'

জেলের অন্ধকার সেলে বসে ফৈজ লিখলেন :

'লজ্জতে খাব্ সে মখমুর হাঁওয়াঁয়ে জাগী,
জেল্ কী জহর্ভরী চোর সদাঁয়ে জাগী,
দুর্ দরবাজা খুলা কোই, কোই বন্দ হুয়া
দুর মচলী কোই জন্জীর ; মচলকে রোই
দুর্ উত্রা কিসী তালেকে জীগর মে খনজর্
সর্ পট্কনে লাগা রহ রহ কে দরীঁচা কোই ॥'

ফৈজ রোমান্টিক কবিতাও লিখেছেন :

'ন জানে কিস্ লিয়ে উম্মীদওয়ার বৈঠা হুঁ,
এক এ্যায়সী রাহপর জো তেরী রাহগুজার ভী নহী ॥'

আবার

'তেরা জমাল নিগাঁহো মে লে কে উঠ্ঠা হুঁ।
নিখর্ গই হ্যায় ফিজা তেরে প্যারহন্ কি সী,

নসীম্ তেরে শঁবিস্তা সে হোকে আই হ্যায়
মেরী সহর্ মে মহক্ হ্যায় তেরে বদন কী সী ॥'

কিছুদিন আগে দিল্লীতে পাকিস্তান হাই-কমিশনার খাজা গজনফর আলী 'ইকবাল-ডে-মুশ্যায়রা'র আয়োজন করেছিলেন। পাকিস্তানের অনেক কবিই এসেছিলেন। ফৈজ মহম্মদ ফৈজকে নেহরুর এত ভালো লাগে যে, তিনি ফৈজকে টেনে নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর কবিতা শোনেন।

সেদিন দিল্লীর মুশ্যায়রাতে কিছু বেরসিক শ্রোতাদের ভীড়ে অনেক ভালো ভালো গজল, রুবাই আর নজমা মাঠে মারা গিয়েছিল। 'আদবে-মহফিল' না জানা থাকায় এই সব বেরসিকের দল ডিনারজ্যাকেট আর শিফনের শাড়ির বাহার দেখিয়ে স্থানে অস্থানে 'বাহ-বাহ, মুবারা ইশাক' আর হাততালি দিয়ে মুশ্যায়রাটা প্রায় পণ্ডই করেছিলেন।

পাকিস্তানের কবিদের নিয়ে আলোচনা করতে হলে আরেক জন কবির কথাও বাদ দেওয়া যায় না। তিনি হলেন 'জোশ' মলিহাবাদী। 'জোশ'কে বলা হতো 'শায়রে ইনকিলাব্' (বিদ্রোহী বা ক্রান্তি কবি)। তাঁর অনেক কবিতাই এদেশের যুবকদের দেশ-প্রেমে উৎসাহিত করেছে। আজ জোশ পাকিস্তানে। তাঁর কবিতা মৃত-প্রায়। টাকা-আনা-পাই হিসেব করতে জোশ আজ ব্যস্ত। কবিতা ছেড়ে সিনেমা হাউস চালাচ্ছেন। অথচ জোশ যখন ভারতবর্ষ থেকে চলে যান তখন বলেন যে, উর্দুর ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে অন্ধকার তাই তিনি পাকিস্তানে চললেন। ইস্কন্দর মির্জা কি মন্ত্রই যে জোশের কানে দিলেন, কোনো তর্কই তিনি শুনলেন না। এখনও ভাবতে দুঃখ হয় জোশ, যিনি আজীবন ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে নিজের কলম চালিয়েছেন, তিনি আজ ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি পাকিস্তানে।

'চীন-ও-আরব হামারা' শ্লোগানওয়ালাদের যিনি একদিন চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যিনি গেয়েছিলেন 'অ্যায় বতন, অ্যায় বতন, অ্যায় বতন, জানে-মন, জানে-মন, জানে-মন' তিনি আজ পাকিস্তানে, আর কিছুদিন আগেই পাকিস্তানের খবরের

কাগজওয়ালারা জোশকে কাফির বলে গালাগাল করেছিল। আর পাকিস্তানে চলে যাবার মাস ছয় আগেই ভারত সরকার জোশকে সম্মানিত করেন 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দিয়ে।

আজও মনে পড়ে জোশের কবিতা। শৃঙ্খলিত ভারত জোশকে ব্যথিত করে কিন্তু তার চেয়েও ব্যথা পান তিনি এই ভেবে যে, আমরা নিজেরা শৃঙ্খল সম্বন্ধে উদাসীন ছিলাম। নিজের মনের ভাবকে তিনি প্রকাশ করেন :

'বাহ্ এ নাকামী মুতা এ
কার্‌বাঁহ্ যাতা রহা
কার্‌বাঁহ্ কে দিল সে এইসাসে
জিয়াঁ জাতা রঁহা।'

পাকিস্তান যাবার আগে জোশ দিল্লীর ভূতপূর্ব পুলিস সুপারিণ্টেডেণ্ট, খান বাহাদুর মিয়াঁ মোহম্মদ সাদীককে (এখন লাহোরে) একটা চিঠি লেখেন। তাঁর পাকিস্তান যাবার কারণ দেখিয়ে তিনি বলেন যে, উর্দুর ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে অন্ধকার আর তিনি তার পরিবারেরও আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষার ভবিষ্যৎও খুবই অন্ধকার মনে করেন। চিঠির শেষে জোশ লিখেছেন—

'It is not easy to turn the face from one's own country for ever. It is such a tragic thing that if it befalls on a mountain, streamlets of blood will begin to flow from it. Over here, I remember the trees of my country, rivers of my country its gardens and friends and relatives who have stayed behind.'

'My heart feels a terrible void : songs of sorrow and frustration create chaos in my mind and my whole existence has turned into a great funeral procession.'

'To whom do I belong ? I belong to nobody. Which land should I call my country ? I ran away from Hindi. Urdu is running away from me, I have no place to rest in this world.'

'But anyhow, now I am nearing the shore : I shall strike out my arms a few times more and reach the shore from where no body returns.'

এটা বোধ হয় জোশের কনফেসন। জোশের এই চিঠিটা আমায় তাঁর বহুদিন আগে লেখা একটা কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয় :

'দো গজ্ জমিন চাহিয়ে
দেঁখে কঁহা মিলে
উঠনে কো তো উঠে হ্যাঁয়
তেরে আস্তান সে হাম ॥'

জোশকে হারিয়েছি দুঃখ নেই কিন্তু উর্দু সাহিত্য যেন জোশকে না হারায়। 'মেরে জুবনা কে দেখো উভার'-এর মতো কবিতা যেন জোশ আর না লেখেন। তাতে উর্দু সাহিত্য কলঙ্কিত হবে। সিনেমায় সস্তা গান লিখে একদিন শাহির লুধিয়ানভী দুঃখ করেছিলেন···'আজ উন গীতোঁকো বাজার মে লে আয়া হুঁ, আজ চান্দী কে তরাজুপে তুলেগী হরচীজ···'। ভয় হয় হয়তো একদিন জোশ সাহেবও তাঁর কবিতা বাজারে বিক্রি করতে আসবেন।

ক্লীফটন বীচ থেকে ফিরতে ফিরতে বেশ দেরী হয়ে গেল। ইরশাদকে বললাম, চলো হে ভাই আমাকে পোর্টে পৌঁছে দাও। রাস্তায় ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে "পাঁচ মিনিটে আসছি" বলে ইরশাদ নেমে গেল। ফিরে এসে জানাল যে, জাহাজ কাল রাতের আগে ছাড়বে না। অনেক কার্গো লোড্ করতে হবে। রাস্তার ধারে দোকান থেকে ফোন করে ইরশাদ খবরটা যোগাড় করেছে আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমাকে রাস্তার মাঝখানে জড়িয়ে ধরে প্রায় নৃত্য করতে লাগল।

"অনেকদিন পরে দেখা, চলো আজ একটু ফুর্তি করা যাক্। খুব গুজরেগী জব মিল বৈঠেঙ্গে দিওয়ানে দো"—দেখি ইরশাদের পকেটের ফাঁক থেকে হুইস্কির বোতলের মুখ উঁকি মারছে।

"দেখো ইরশাদ। বেশি ভালো না। একদিন হুইস্কিই তোমাকে খাবে" বোঝাবার চেষ্টা করি ইরশাদকে। "এত বেশি মাত্রায় খেলে বরদাস্ত করতে পারবে না।"

দেবদাসের ভাষায় ইরশাদ গম্ভীর হয়ে জবাব দেয় "কোন্

কামবখত্ বরদাস্ত করনে কি লিয়া পিতা হ্যায়। The More I drink, the more sobre I am."

"চল বাড়ি চল" ইরশাদ আমাকে প্রায় এক রকম টেনেই গাড়িতে ওঠায়।

"তোমার আবার বাড়ি কি হে?" একটু অবাক হয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করি।

"ও তুমি জানো না বুঝি একটা কেলেঙ্কারি করেছি।"

"কেলেঙ্কারি?"

"হ্যাঁ, বিয়ে করেছি।"

আকাশ থেকে পড়লাম। ইরশাদ বিয়ে করেছে। ইরশাদের মতো ছন্নছাড়া মাতাল ভবঘুরে বিয়ে করতে পারে কখনও কল্পনাও করতে পারি না।

"গুল্‌শন্‌কে দেখলে তুমিও বিয়ে করে ফেলতে হে" ইরশাদ আমার আশ্চর্য হওয়া দেখে বলে।

"কিন্তু তুমি দেখলে কোথায় আর সেই বা তোমায় দেখল কখন? লভ অ্যাট্ ফার্স্ট সাইট্ নাকি?" কৌতূহল চাপতে পারি না।

"ব্যস্। নজর সে নজর মিলি মুলাকাত করলি। রহে দোনো খামোস পর বাতেঁ করলি। That explains everything". ইরশাদ ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে তার বাড়ির দিকে গাড়ি ঘোরাতে বললো।

ছয়

ইরশাদকে আমি জানি অনেকদিন থেকেই। কিন্তু চিনতে আজও পারলাম না। ওকে আমি আগে 'হোল্ড-অল্' বলে ডাকতাম। কারণ ইরশাদ ছিল কবি, গায়ক, সাংবাদিক ও আরও অনেক কিছু। ও সেই দলের লোক যাদের বলা হয় 'আনপ্রেডিক্-টেব্‌ল্'। কখন যে কি করে আর বলে বসবে তার স্থিরতা নেই।

স্থান কাল পাত্র কোনো বিবেচনাই সে করবে না। ইরশাদের এই গুণের জন্যেই বোধহয় ওকে ভালোবেসেছিলাম। এতদিন পরে সেদিন দেখা হলো কিন্তু ওর কোনো পরিবর্তনই হয়নি। যেরকম লক্ষ্মীছাড়া 'ট্র্যাম্প' ছিল তাই আছে। আছে বললে ভুল হবে, কারণ ইরশাদ আর নেই। আছে ওর স্ত্রী গুল্‌শন্—ওর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে। সে কথা পরে।

গান বাজনার মহফিল হলে ইরশাদকে ঠেকানো যাবে না। মহফিল যেখানেই হোক না কেন ইরশাদ ঠিক বসে আছে আসর জমিয়ে। নেশায় বুঁদ্ হয়ে থাকলেও তালের ভুল হলেই ইরশাদ ধরবে আর সে গায়কই হোক আর গায়িকাই হোক, তার শ্রাদ্ধ করে ছাড়বে। দিল্লীতে একবার ও এক বাঈজীর বাড়িতে গিয়ে তালের ভুল সহ্য করতে না পেরে পানদান ছুঁড়ে মেরেছিল আর সেই নিয়ে কি বিশ্রী কাণ্ড।

সেই ইরশাদ যখন জানালো যে, ও বিয়ে করেছে তখন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। ইরশাদ আর বিয়ে-করে-সংসার-পাতা ইরশাদ, এ-দুটো জিনিস একসঙ্গে কোনোকালেই কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু ঐ যে ইরশাদ বলতো 'হোতা বহি যো মঞ্জুরে-খুদা হোতা'। হয়েছিলও তাই, কিন্তু খুদার মর্জি বড় নির্মম ক্লাইম্যাক্স এনে দিয়েছিল।

গাড়ি এসে ইরশাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। টোকা মারতেই দরজাটা একটু ফাঁক হলো আর একজোড়া কালো চোখ হঠাৎ একজন অপরিচিত লোককে দেখেই সরে গেল। যখন ইরশাদের সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম গুল্‌শন্ পর্দার একপাশে দাঁড়িয়ে। "গুল্‌শন্, হামারা জিগরী দোস্ত, ইয়ে ব্লাডি হিন্দুস্তানী। লেও ভাই, খানা খিলাও ইন্‌কো।"

ইন্ট্রোডাকশনের বহর শুনে গুল্‌শন্ একটু হাসল। গালটা একটু লাল হলো। "তশরিফ রাখিয়ে ভাইসাব" বলে ভিতরে চলে গেল।

সেতারের সূক্ষ্ম ঝঙ্কারের মতো বেজে উঠল গুল্‌শনের চারটে ছোট টুকরো কথা। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম ইরশাদ কেন বলেছিল গুল্‌শন্‌কে যে দেখবে সেই ভালোবাসবে।

খাবার সময় ইরশাদের পাত্তা নেই। বিয়ারের নেশায় তখনও একটানা ঘুমুচ্ছে। গুল্‌শন্‌ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। বুঝিয়ে বললাম, ইরশাদকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি আর ওর জন্যে আমার কাছে অপ্রস্তুত হতে হবে না। খাওয়ার পরে কখন যে গুল্‌শনের সঙ্গে গল্প করতে করতে চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুমটা ভাঙল যখন দেখি গুল্‌শন্‌ একটা বালিশ আমার মাথার নিচে রাখবার চেষ্টা করছে। তাকিয়ে দেখি সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। উঠতে না উঠতেই গুল্‌শন্‌ চা নিয়ে হাজির। চোখে মুখে আবার সেই কিন্তু-কিন্তু ভাব। "ভাইসাব চলুন, আপনাকে শহরটা ঘুরিয়ে আনি।"

"কেন ইরশাদ কোথায় ?"

"ও বেরিয়ে গিয়েছে। আসতে দেরী হবে। যাবার সময় বলে গেল আপনার দেখাশোনা করতে। বলুন তো কি বিপদ। কোথায় আপনার সঙ্গে থাকবে তা নয় গানের মহফিলে চলে গেল।"

"গানের মহফিলে ? কোথায় ?"

গুল্‌শনের মুখটা আবার লাল হয়ে উঠল। কিছুই বললো না, শুধু মাথা নিচু করে রইল। বললাম, "বুঝেছি। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে ওকে ?"

"শব্‌নমের ওখানেই গিয়ে থাকবে। সেখানেই তো রোজ আড্ডা হয়।" মুখ নিচু করেই উত্তর দেয় ইরশাদের শরিকে-জিন্দগী-গুল্‌শন্‌।

কে শব্‌নম্‌ কিছুই বুঝলাম না। কথাটা জিজ্ঞাসা করে নিজেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল গুল্‌শন্‌ নিজেই—"ভাইসাব, আমি আর পারছি না। ও আমাকে খুবই ভালোবাসে। এর চেয়ে বেশি আমি আশা করি না। কিন্তু আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে ও গানকে—শব্‌নমের গানকে।" গুল্‌শনের গলার স্বর কেঁপে উঠল। "ওকে ওখান থেকে অন্তত আজকে নিয়ে আসুন। একদিন না হয় নাই শুনল গান"। জলভরা চোখে কথাটা বলেই গুল্‌শন্‌ দৌড়ে ভিতরে চলে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা গুল্‌শনের বুকভাঙা কান্না শুনলাম।

আমায় ওখানে দেখে ইরশাদ একটু অবাকই হয়েছিল। ওদের চাকরের কাছে অনেক কষ্টে ঠিকানা নিয়ে যখন শব্‌নমের ফ্ল্যাটে পোঁছলাম, মহফিল বেশ জমে উঠেছে। শব্‌নমের মালকোঁশ তখন ঘরের মধ্যে এক অপূর্ব ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে। ইরশাদ নেশায় চুর। ঘরের সেই নিস্তব্ধ, রুদ্ধ হাওয়ায় শুধু সঙ্গীতের রেশ। ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকতেই একসঙ্গে কয়েকজোড়া চোখের রোষভরা দৃষ্টি আমার দিকে ঘুরল। ইরশাদও। কিন্তু সবাই নির্বাক। শব্‌নম তানপুরার উপর মাথা রেখে তখন মালকোঁশে সুরের জাল বুনে চলেছে। সেই তন্ময়তা ভাঙতে মন চাইল না। প্রায় ২০ মিনিট পরে গান থামল। বিরক্তির সঙ্গে উঠে এসে একটু ঝাঁঝালো স্বরেই ইরশাদ বললো, "তুম কাহেকো ইহাঁ আয়ে ?"

"ঘরে চলো ইরশাদ ভাই।" ওকে মিনতি জানাই।

"তুম্ যাও। আমি মিয়াঁ কি মল্লার শুনে তারপর যাবো।" ইরশাদ বেঁকে বসল।

আমার মাথায় তখন রক্ত চেপে গিয়েছে। বললাম যদি আমার সঙ্গে ও না যায় আমি সোজা পোর্টে আমার জাহাজে ফিরে যাব। ওষুধ ধরল। টলতে টলতে আমায় শাপ দিতে দিতে ইরশাদ গাড়িতে উঠে বসল।

বাড়িতে যখন ঢুকি তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। গুল্‌শন্ দরজায় দাঁড়িয়ে। "মাফ্ করনা গুল্‌শন্"। ব্যস্ ইরশাদের তিনটে কথাতেই সেই স্বর্গীয় হাসি আবার ফিরে এল। আশ্চর্য লাগে এত কাণ্ড হয়ে যাবার পরেও মানুষ হাসতে পারে।

গুল্‌শন্ আমায় বোঝাতে চেষ্টা করে "আজ পর্যন্ত কখনও ও গানের মহফিল থেকে রাতে দেরীতে ফিরবার জন্য আমার কাছে মাফ্ চায়নি। আজ বোধহয় বুঝতে পেরেছে আর তাই অনুশোচনাও হয়েছে। ভাইসাব, তুমি আজ ফরিস্তা হয়ে এসেছ। তোমার এহ্‌সান আমি কি করে ভুলবো। তোমায় অনেক অনেক শুক্‌রিয়া···খুদা তোমার···"

"কিন্তু···?"

"না ভাইসাব। সুবহ কা ভুলা আগর শাম ঘর ওয়াপস্ আযায়ে তো উসে ভুলা নেই কহতে।"

গলার কোথায় যেন কি একটা ওঠানামা করছে। চোখের পাতাটা ভারী মনে হলো। খবরের কাগজটা তুলে নেওয়ার ভান করে শুধু মুখ থেকে বেরল "খুশ রহো বহিন্"।

মাঝ-রাতের সেই নাটকীয় মুহূর্তের কথা আজও বারবার মনে পড়ে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে গুল্‌শনের চেহারা আর সেই কথা ক'টি—"ভাইসাব, তুমি আজ ফরিস্তা হয়ে এসেছো।"

পরের দিন সকালে ইরশাদ আর উঠতে পারল না। গুল্‌শন্ একাই এল পোর্টে আমায় পেঁাছতে। জাহাজ ছাড়ল দুপুর ১২টায় কিন্তু 'এমবার্কেশন' ছিল ভোরে। গ্যাঙ্গওয়ে দিয়ে উঠছি, গুল্‌শন্ বললো "ফির আনা ভাইসাব"।

"জরুর গুল্‌শন্। লৌটতে বকত্ ফির আউঙ্গা।"

"খুদা হাফিজ ভাইসাব।"

"খুদা হাফিজ গুল্‌শন্ বহিন"।

আর পারলাম না। বছরের পর বছরের জমানো সাংবাদিকতার 'সিনিসিজম'-এর বাঁধ ভেঙে চোখের জল নেমে এল। একদিনের জন্যে বিদেশে (পাকিস্তান বিদেশ বই কি। মনে নেই পোর্ট অফিসারের সেই পাসপোর্ট চাওয়ার কথা) এসে এ কী বিভ্রাট!

যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যায় গুল্‌শন্‌কে দেখলাম। আস্তে আস্তে ও ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল। মুখে সেই হাসি। বেশ বুঝতে পারলাম চোখের জল চাপবার চেষ্টা করছে।

ইরশাদ আর আসেনি। আমার জাহাজ যখন মাঝ দরিয়ায় ও হয়তো তখন ঘুম থেকে উঠে 'গুল্‌শন্ চা লাও' বলে চিৎকার করছে।

তিনমাস পরে নভেম্বরের এক সন্ধ্যায় আমার জাহাজ আবার করাচী বন্দরে ফিরে আসে। আমার কথা আমি রেখেছিলাম। ইরশাদকে 'কেব্‌ল' আগেই করে দিয়েছিলাম। ধীরে ধীরে জেটীর দিকে জাহাজ এগোতে থাকলো আমি চারদিকে তাকিয়ে খুঁজছি ইরশাদকে। কে জানে, আসবে কিনা। হয়তো শব্‌নমের গানের মহফিল থেকে ফিরেছে ভোর রাতে। আধো-আলো,

আধোছায়াতে কিছুই চেনা যায় না। গ্যাঙ্গওয়ে দিয়ে নেমে এলাম তবুও কারো দেখা নেই। তবে কি?

হঠাৎ "ভাইসাব, আপ আগয়ে?"

যেদিক থেকে আওয়াজটা এল সেইদিকে ফিরে চাই। কালো জর্জেটের শাড়ি পরা গুল্‌শন্‌কে দেখাচ্ছিল একটা 'সিলহৌট'-এর মতো। বুঝলাম ইরশাদ আসেনি। ধীরে ধীরে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলাম।

"ইরশাদ কি এখনো ঘুমুচ্ছে নাকি?" গাড়ি বাণ্ডার রোডের মোড় ঘুরতেই জিজ্ঞাসা করি।

উত্তর দেয় না গুল্‌শন্‌। শুধু ডুকরে কেঁদে ওঠে। "ভাইসাব তুমহারা ইরশাদ ভাই—"

হাত পা সব ঝিম্‌ ঝিম্‌ করে ওঠে। কিছু বুঝতে পারি, কিছু বুঝতে পারি না।

"কি হয়েছে গুল্‌শন্‌ খুলে বলো। কোথায় ইরশাদ?" কে জবাব দেবে? ট্যাক্সির ঘড়ঘড়ানি আর করাচীর জনবহুল রাস্তার কোলাহলে শুধু শুনতে পাই গুল্‌শনের চাপা কান্না। মাঝে মাঝে ট্যাক্সি ড্রাইভার কিছুই বুঝতে না পেরে এক একবার পেছন ফিরে তাকায়।

ইরশাদ আজ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আমার করাচী ছাড়ার মাসখানেক পরেই সে দুনিয়ার মহফিল ছেড়ে অন্য মহফিলে চলে যায়। ডাক্তারেরা বলে, 'কার্সিনোমা অব দি লিভার'। গুল্‌শন্‌ বলেছিল সে রাত্রের ঘটনার পরে আর ইরশাদ শব্‌নমের ফ্ল্যাটে যায়নি।

নসীবের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। তিনমাস পরে সেদিন আবার দাঁড়ালাম এক সমাধির সামনে। একদিন দাঁড়িয়েছিলাম জিন্না-সাহেবের সমাধির সামনে আমি আর ইরশাদ আর সেদিন দাঁড়ালাম ইরশাদের সমাধির সামনে আমি আর গুল্‌শন্‌। গুল্‌শনের হাতে ছিল কিছু নার্গিস ফুল আর আমার চোখে ছিল জল। বারবার ইরশাদের বড় শখের লাইন দুটো মনে পড়তে লাগল—"বাত করতে করতে সো গয়ে হো

সাথী, এক বাত ভী পুরি না হো পাই। আধী বাত্ আধী রাত্।"

করাচী আমার কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠল। রাতেই জাহাজে ফিরে এসেছি। গুল্‌শন্ সেবারের মতো আবার আমায় পৌঁছে দিতে এল। ওকে কি বলবো, কি সান্ত্বনা দেবো ভাবতে পারি না। ওর দিকে চাইতেও আমার ভয় হয়। কালো চোখ দুটোর নিচে অনিদ্রার গভীর চিহ্ন। আঁচল দিয়ে গুল্‌শন্ কান্না চাপার চেষ্টা করে।

"হাজার বরষ জিয়ো গুল্‌শন্" হঠাৎ কথাটা বলে ফেলি।

"আমায় শাপ দিচ্ছ ভাইসাব? এ-জীবন নিয়ে তুমি আমায় হাজার বছর বাঁচতে বলো? ফির আনা ভাইসাব।"

"হ্যাঁ, গুল্‌শন্ আমি আবার আসবো।"

"খুদা হাফিজ্ ভাইসাব।"

"খুদা হাফিজ্ গুল্‌শন্ বহিন্।"

আজ কত ব্যবধান আমার আর গুল্‌শনের মধ্যে। এক হাজার মাইলের দূরত্ব ছাড়াও একটা দেশের ব্যবধান। কিন্তু গুল্‌শন্‌কে ভুলতে তো পারি না। আর ইরশাদ? আজও কেন জানি না কোথাও মালকৌঁশ রাগ শুনলে ইরশাদ ভাইয়ের কথা মনে হয়। প্রতি রাখী পূর্ণিমার দিনে কেন ফেলে আসা এক বোনের জন্য প্রাণ কেঁদে ওঠে। মাঝে মাঝে ভাবি জিন্না সাহেব যখন ইসলামের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের জন্যে পাকিস্তান তৈরি করেন তখন হয়তো ভাবেননি যে, তাঁর 'হোমল্যাণ্ডে' এক ইরশাদ আর এক গুল্‌শন্‌ও থাকতে পারে আর সেই গুল্‌শনের এক 'কাফের' ভাইসাব হিন্দুস্থানে থাকতে পারে।

মানুষ মানুষকে পুজো করে কি না জানি না। আমায় যদি কোনোদিন করতে হয় তো গুল্‌শন্‌কেই পুজো করবো। পাকিস্তানে যদি কোনদিন নিজের ইচ্ছায় যাই তো যাবো গুল্‌শনের জন্যে আর যাবো তার মেয়ের জন্যে। ইরশাদ বলেছিল মেয়ে হলে নাম রাখবে নাজনীন্।

ইতিহাসের গতি তার নিজস্ব। পাকিস্তান এমন সময়ে গড়ে

ওঠে যখন জীবনের দাম ছিল সস্তা আর মনুষ্যত্ব আর মানবধর্ম ছিল ঘৃণার বস্তু। যারা চালাক, যারা নিষ্ঠুর, যারা ধর্মান্ধ, তারাই হয় জয়ী। কিন্তু নসীবের চাকা ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে ঘুরছে। পাকিস্তানকে আমি ভালোবাসি, কারণ 'সবার ওপরে মানুষ সত্য'—মানুষ সেখানেও আছে আর চিরদিন থাকবে। আমি জানি এক ইরশাদ আর এক গুল্‌শন্‌কে। কিন্তু আরো অনেক গুল্‌শন্‌ আর ইরশাদও আছে। কিন্তু ভয় হয় সেই কথাটা ভেবে 'The finest hour is always followed by less elevated moments.' পাকিস্তানেরও কি তাই হবে?

বিষণ্ণ মনে সে-রাতে জাহাজে ফিরে এসেছিলাম। পাকিস্তানের যে রূপ দেখলাম, তা দেখবো বলে তো কখনও ভাবিনি। মতিলাল নেহরু রোডকে ঔরংজেব রোড আর গান্ধী পার্ককে জিন্না-পার্ক-এ পরিণত করলেও ভেবেছিলাম পাকিস্তান ধীরে ধীরে শান্তি, সমৃদ্ধি আর প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। কিন্তু তার কোনো আভাস পেয়েছিলাম কি? বোধহয় না।

জাহাজের ডেকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। করাচী থেকে ওঠা এক আরব যুবক পাশে এসে দাঁড়াল। ভাঙা ভাঙা আরবী আর ইংরেজী মিলিয়ে যা বললো তার থেকে এইটুকুই বুঝলাম যে, সেও সাংবাদিক। রফৎ আবু গাজালে জেরুজালেমে (জর্ডন) এক খবরের কাগজে কাজ করে। আমার মতো সেও এসেছিল পাকিস্তান দেখতে। আমি ছিলাম একদিন আর ও ছিল ১৫ দিন। অনেক কিছুই শুনেছে অনেক কিছুই দেখেছে। এবার দেশে গিয়ে লিখবে।

কিছু যেন বলবে রফৎ। জিজ্ঞাসা করলাম "কি?"

"পাকিস্তান নো গুড।"

এঁ্যা বলে কি? একটু চমকে উঠলাম।

"ইয়েস, পাকিস্তান নো গুড।"

"নো: নো: পাকিস্তান গুড। ভেরী গুড"। প্রতিবাদ করি।

"নো! নো! পাকিস্তান ভেরী ব্যাড। আই রাইট মাই পেপার রফিক্ (ভাই)। অল ধোকা।"

করাচী শহরে এসে রফৎ 'ধোকা' কথাটা শিখেছে। রফৎ একা ধোকা খায়নি। আমিও খেয়েছি। ধর্মের ধোকায় তৈরি পাকিস্তানে অনেকেই ধোকা খেয়েছে।

পাঁচ বছরের উপর পাকিস্তানে থেকেও হানিফ চেয়েছিল পালিয়ে আসতে হিন্দুস্থানে। কোনো রকমে ঢুকে পড়েছে জাহাজের মধ্যে কুলীদের ভিড়ে মিশে গিয়ে। জাহাজের লোকরা আর পুলিসের দল ওকে জোর করে নামিয়ে নেবে। না আছে ভিসা, না আছে পাসপোর্ট।

কিছুতেই বোঝে না কিসের ভিসা, আর কিসের পাসপোর্ট। জাহাজের গোলমালে আর পুলিসের টানা-হ্যাঁচড়ার মধ্যে ওর বুকফাটা কান্না শোনা যায় "মুঝে দরিয়া মে ডাল দো, মগর করাচী ওয়াপস মৎ ভেজো।"

গুড বাই পাকিস্তান। খুদা হাফিজ গুল্‌শন্।

সাত

১৯৫৬ সাল—সময়, রাত দশটা—তারিখ ২রা মার্চ। একটা কালো বিরাট রোলস-রয়েস গাড়ি চলেছিল এরোড্রোমের দিকে। যাত্রী দু'জন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব সেলউইন লয়েড আর বহেরিনের শেখ সুলেমান বিন্ হামীদ অল্ খলিফা। হঠাৎ ক্রুদ্ধ জনতার চিৎকার শোনা যায়, 'লয়েড গো হোম'। গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। রাস্তা অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল জনসমুদ্র, হাতে তাদের ইট, পাটকেল, লাঠি, সোঁটা যে যা পেয়েছে। জনতার কোলাহল ছাপিয়ে এবার আওয়াজ শোনা যায় পুলিসের টিয়ার গ্যাস, রাইফেলের গুলী, আর বেয়োনেট চালানোর। গাড়ি আবার চলল, পিছনে তখন রাস্তার উপর পড়ে আছে রক্তমাখা এগারোটা লাশ।

ছ'শ ষোলো মাইলে ঘেরা আর দেড় লাখ লোকের বসতি পারস্য উপসাগরের ছোট্ট দ্বীপ বহেরিনে সেদিন যে কাণ্ডটা ঘটল, দেশ-বিদেশের খবরের কাগজে তা হেডলাইনের সৃষ্টি করেছিল। পৃথিবীর লোককে তা এই ক্ষুদ্র দ্বীপের অস্তিত্ব জানিয়ে দিলো। আর সেই সেলউইন লয়েড হয়তো এই ভেবে কেঁপে উঠলেন যে, ব্রিটিশ সূর্য বোধ হয় অস্ত যেতে বসল পশ্চিম এশিয়ার দিগন্তে।

মাত্র ৩০ বছর আগে শুরু হয় বহেরিন দ্বীপে ব্রিটিশ প্রতিপত্তি, যখন স্যার চার্লস বেলগ্রেভ আসেন খলিফা শেখ হামিদ বীন্ ইসা আল্-এর 'এ্যাড্‌ভাইসার' হয়ে। ২রা মার্চ গেলেন সেলউইন লয়েড আর তার কিছুদিন পরেই গেলেন স্যার চার্লস—পেছনে পড়ে রইল তাঁর ৩০ বছরের অক্লান্ত সেবা আর পরিশ্রম। দোষ স্যার চার্লসের না, বোধ হয় সেলউইন লয়েডেরও নয়। দোষ বিংশ শতাব্দীর পশ্চিম-এশিয়ার রাজনৈতিক জাগরণের। একের পর এক সাম্রাজ্যের কলোনীগুলো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে। মরুপ্রান্তরের মাইলের পর মাইল বালুরাশির বুক ঠেলে আজ উঠছে স্বাধীনতার মন্ত্র। মরুপ্রান্তরে মরীচিকার পিছনে ঘুরতে ঘুরতে এই তো দেখলাম। বহেরিন, ওমন, মাসকাট, কাটর, বুরামী, কুয়েট।

কোনোদিন আবার যখন ফিরে যাব তখন হয়তো দেখবো, তাদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীন হয়েছে। সৈয়দ আশুরকে তখন আর ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে বম্বেতে আসতে হবে না। বহেরিনে নামবার সময় আমায় একটা সিল্কের রুমাল উপহার দিয়েছিল আশুর তার বন্ধুত্বের নিদর্শনরূপে। জানিয়েছিল নিমন্ত্রণ তার ক্ষুদ্র দ্বীপের ক্ষুদ্র দোকানে আসবার জন্য। আশুরকে বলেছিলাম, আসবো যখন ওর হাতে থাকবে নিজের দেশের পাসপোর্ট। আমার ভাষা ও বোঝেনি। হেসে ইশারায় আমায় বুঝিয়েছিল—স্বাধীনতা পাসপোর্ট আর ফ্রন্টিয়ার এঁকে, ম্যাপ দিয়ে হয় না। বুকের উপর হাত রেখে বোঝাল—'স্বাধীনতা এইখানে অনুভব করতে হয়।' কে জানে সেদিন সেলউইন লয়েডকে 'গো হোম' বলা শত শত জনতার চিৎকারের মধ্যে আশুরের কম্পিত

আওয়াজ ছিল কি না? নিশ্চয় ছিল, আশুর যে স্বাধীনতা অনুভব করে।

বহেরিনকে বলা হয় "the island of a hundred thousand burial mounds"। মাইলের পর মাইল মরুভূমির বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বিরাট স্তূপ। প্রতি স্তূপের নিচে লুকিয়ে আছে কত না হাসি-কান্নার কাহিনী। ড্যানিশ্-বহেরিন, আর্কেলোজিকাল একস্পীডিশনের নেতা প্রোফেসর গ্লব এক লাখ স্তূপের কথা বলেছেন। তেলের শহর আওয়ালী থেকে উত্তর তীরে খেজুরছায়ায় ঘেরা প্রান্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে এই অসংখ্য স্তূপ। প্রাচীনকালের মানুষের অপূর্ব কীর্তি এই স্তূপগুলোকে মাঝে মাঝে মনে হয় প্রকৃতির খেলা।

মাটির নিচে খুঁড়তে খুঁড়তে পাওয়া গিয়েছে ৫০০০ বছর আগেকার সভ্যতার নিদর্শন। বহেরিন-এর প্রাচীন রাজধানী 'কালা' এখন বিরাট স্তূপে পরিণত হয়েছে। পঞ্চাশ একর জায়গার উপর ৩০ ফুট উঁচু এই স্তূপ এক অপূর্ব দৃশ্য। বিরাট এক প্রাসাদ এই স্তূপের নিচে আছে। আর্কেলোজিকাল টিম তিনটি পুরানো মন্দিরের ভগ্নাবশেষ খুঁজে বের করেছে। এর মধ্যে একটা ছিল 'আইন-উম-এস-সুজর' 'স্প্রিং' এর নিকট 'দিরাজ' গ্রামের কাছে। দুটো পাথরের 'বুল', একটা পাথরের ধূপদানও বেরিয়েছে। অনেকের ধারণা, 'বারবার' স্তূপের নিচে পাওয়া মন্দিরটার স্থাপনা হয়েছিল ৫০০০ বছর আগে। ভারত-মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার অনেক নিদর্শনই পাওয়া যাবে আর পাওয়া যাবে সুমেরিয়ান আর ব্যাবিলোনিয়ানদের পৌরাণিক ইতিহাসে বর্ণিত 'দিলমুন' শহরের কথা। সুমেরিয়ানরা তাদের 'অরিজিন' 'দিলমুন' থেকে বলেই বিশ্বাস করে। 'দিলমুন' থেকেই এসেছিল আধা-মানুষ আর আধা-মৎস্য সেই অদ্ভুত জীব, এও তাদের বিশ্বাস। যখন ভীষণ বন্যা আসে (Deluge of Genesis) তখন ঈশ্বর 'অন্‌লি সারভাইভার', 'জিউসুদ্রা' (Ziusudra)—বাইবেলের নোয়াকে পাঠান। 'গিলগামেশ' (Gilgamesh) এইখানেই তাঁর খোঁজে আসেন অমরত্ব লাভের আশায়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা খোঁজ করলে আরো অনেক কাহিনী—

অলীক বা সত্যি বের করতে পারবেন। 'Jutland Archaeological Society'র ইয়ারবুক (১৯৫৪-৫৫) Kuml-এও অনেক কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

আবার ফিরে আসতে হয় বিংশ শতাব্দীতে। ১৯২৬ সালে যখন চার্লস বেলগ্রেভ আসেন, বহেরিনের অবস্থা তখন শোচনীয়। রাজধানী 'মানামা' প্রায় ধ্বংসের মুখে। বেলগ্রেভ সাহেব এসেই তৈরি করলেন পুলিস। মিসেস বেলগ্রেভকে দেখে পর্দানশীন বহেরিনের রমণীরা ভাবলেন, এ আবার কি বস্তু। শেখের পাটরাণীকে হাতে বাগিয়ে খুললেন মেয়েদের জন্যে প্রথম স্কুল। সাহেব শুরু করালেন আবার ভুলে যাওয়া 'Pearl-Fishing'।

এল ১৯৩২ সাল। স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল এল সুদূর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে। শেখের চক্ষু ছানাবড়া। পঁচাশি লাখ ডলার। বেলগ্রেভ সাহেব ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিলেন। অর্ধেক পাবেন শেখ আর বাকী অর্ধেক ব্যয় হবে জনতার সুরক্ষার জন্যে। শুরু হলো রাস্তা, হাসপাতাল, টেলিফোন। ১৯৫২ সালে রাণী এলিজাবেথ বেলগ্রেভ সাহেবকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করলেন। স্যার চার্লস-এর উপর নতুন শেখ সুলেমান বিন্ হামীদের অপার কৃপাদৃষ্টি। সাহেব বললেন, আমি আর ইংরেজ নেই, আমি হয়ে গিয়েছি 'বহেরিনিয়ন'।

হলো না কিছুই। সাহেবের পরামর্শে শেখ দেশ থেকে তাড়ালেন লোকপ্রিয় নেতা আবদুল রহমান বাকীকে। রহমান আশ্রয় পেলেন নাসেরের ইজিপ্টে। ওদিকে আবার জর্ডন তাড়াল গ্লাব পাশাকে। বেগতিক দেখে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট 'রিকল' করলেন স্যার চার্লসকে।

পৃথিবীতে যত অনুর্বর জায়গা আছে তার মধ্যে 'ওমন' সবচেয়ে নিকৃষ্ট। রাবআলখালির মরুভূমি দিয়ে ক্যারাভান যাওয়াও দুষ্কর ব্যাপার। কিছুদিন থেকে নিকটবর্তী বুরামী দ্বীপগুলো নিয়েও বেশ গোলমাল চলেছে। ওমনের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে যে,

বছরের পর বছর নানাদিক থেকে আসা আক্রমণ রোধ করতে করতেই সুলতানদের প্রাণান্ত। নেজদের ওহাবী আমিরদের দলও বেশ কিছুদিন জ্বালিয়েছে ওমনকে। মাসকাট্-এর অবস্থা প্রায় একরকম। মাসকাটে জাহাজ আসার সঙ্গে একদল লোক জাহাজে আসে বিরাট বড় বড় 'লবস্টার' বিক্রি করতে। মাসকাটেই দেখা হয়েছিল উইন সাহেবের সঙ্গে। উইন এককালে নাগপুরে পুলিসের বড় সাহেব ছিলেন, এখন মাসকাটে পলিটিক্যাল এ্যাডভাইসার। আমি নাগপুরের লোক জানতে পেরেই আমার কেবিনে এসে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা করে যান।

হঠাৎ আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া যাকে বলে কুয়েটের অবস্থা হয়েছে ঠিক তাই। অবশ্য পারস্য উপসাগরের প্রত্যেকটা শেখের রাজ্যই অয়েল রয়ালটির দয়াতে ফেঁপে উঠেছে কিন্তু কুয়েটের তুলনায় কিছুই না। কিন্তু অন্যান্য শেখদের মতো কুয়েটের এই অফুরন্ত ভাণ্ডার হারেমে আর বিলাসে খরচ হয় না—হয় সত্যিকারের কাজে। স্যার আবদুল্লা আস্ সলিম্ অস সুবহ হচ্ছেন কুয়েটের শেখ। নিজের ছোট দেশের জন্য তিনি অনেক কিছুই করেছেন। তিন বছর আগে পর্যন্ত কুয়েটের খাবার জল আসত ৮০ মাইল দূর থেকে জাহাজে করে। কুয়েটকে ব্রিটিশ প্রটেকশান দেওয়া হয় ১৮৯৯ সালে—যখন শেখ মুবারাক অটোমান সুলতানদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ইংরেজদের দ্বারস্থ হন। এতে রাশিয়া ও জার্মানীর সম্মানে প্রচণ্ড আঘাত লাগে।

কুয়েটের ভীষণ বিপদ হয় ১৯২১ সালে, যখন সৌদী আরবিয়া থেকে আক্রমণ আসে। ইব্ন্ সউদ বহুদিন আগে তুর্কীদের আক্রমণ থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেন কুয়েটে আর এখান থেকেই ১৯০২ সালে মাঝ-রাতে তিনি তাঁর বিখ্যাত রিয়াদ আক্রমণ শুরু করেন। কিন্তু কুয়েট আক্রমণ তাঁর ব্যর্থ হয়। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, কুয়েটের লোকেরা সৌদী আরবিয়ার আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে শুধু হাতে সাতদিনের মধ্যে পাঁচ মাইল লম্বা আর চোদ্দ ফুট উঁচু এক মাটির দেওয়াল শহরের চারদিকে তৈরি করে নেয়। সেই বিখ্যাত দেওয়াল আজও দাঁড়িয়ে আছে। বারো জায়গায় দেওয়ালটা ভেঙে গিয়েছে আর

সেই বারো জায়গায় আজও দাঁড়িয়ে থাকে সশস্ত্র প্রহরী। কুয়েটে যেতে হলে তিনটের একটা গেট দিয়ে ঢুকতেই হবে। সশস্ত্র প্রহরীর গায়ে ইংরেজী উর্দি আর হাতে ইংরেজী মেশিনগান।

গত ছয় বছরের মধ্যে কুয়েটের রূপ বদলে গিয়েছে। রাস্তা, ঘাট, হাসপাতাল, টেলিফোন, যানবাহন, স্কুল, নিয়ন-লাইট সবই হয়েছে। রেফরিজারেটর, এয়র-কণ্ডিশন, রেডিয়ো আর মোটর-কারের ছড়াছড়ি। মোটরের আওয়াজের জন্যে মুয়জ্জিনকে আজান পড়তে লাউডস্পীকারের সাহায্য নিতে হয়।

এত মডার্নিটির মধ্যেও পুরনো কুয়েটকে ভালো লাগে। ছোট ছোট মাটির ঘর, গলির ভিড়, গাধার পিঠে চাপানো জলের ভিস্তিওয়ালা, সাগরতীরে লাগানো 'ঢউ', 'বালাম' বেশ লাগে। কুয়েটের ধনী ব্যবসায়ী আর শেখদের অনেকেই ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে এসেছে কিন্তু তাদের 'কুয়েটী' আচার-ব্যবহার আজও যায়নি।

কুয়েটের লোকেরা ফুটবল খেলতে বড় ভালোবাসে। ১১৬।১১৭ ডিগ্রী গরমেও মহা ধুমধামের সঙ্গে তারা হৈ চৈ করে ফুটবল খেলে। মদ্যপান নিষিদ্ধ, চুরি ডাকতি খুবই কম। এখনও চুরির অপরাধে হাত-পা কেটে দেওয়ার শাস্তির কথা মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়।

ওমন, কাটর, বহেরিন, মাসকাট, কুয়েট, বুশায়ার, খোরামশাহ, আবাদান, বন্দর আব্বাস ছাড়িয়ে চলেছি বসরার দিকে। শাতিল-আরব (ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রিসের সঙ্গম) পার হয়ে চলে এসেছি 'সিটি অব থাউজেণ্ড এ্যাণ্ড ওয়ান স্মেল' বসরায়। বসরার গোলাপ দেখিনি কিন্তু আরবদের 'আইহলেন, আইহলেন' আর 'রফিক্, রফিক্' বলে চিৎকার করে অভ্যর্থনাও গোলাপের চেয়ে কম মিষ্টি মনে হয়নি। শাতিল-আরবের ওপর দিয়ে যখন জাহাজ চলেছিল তখন কেবলই মনে হয়েছে, ছোটবেলায় পড়া নজরুলের "শাতিল-আরব, শাতিল-আরব পূত যুগে যুগে তোমার তীর"। মরুপ্রান্তরের জানা-অজানা কত প্রান্তরেই ঘুরেছি। মাটির তৈরি, ছাদ-নিচু কত কুঁড়েঘরেই আরবদের আতিথ্য গ্রহণ করেছি—

গ্রাসের পর গ্রাস খেয়েছি 'কাওয়া' (পণ্ডিত নেহরু যতই সুখ্যাতি করুন, খেতে মোটেই সুস্বাদু নয়)। মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়িয়েছি মরুভূমির দেশে। কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখা মরুভূমির দিগন্তে সূর্যাস্ত, আজও স্মৃতির অন্তরালে উঁকি দেয়। মনে পড়ে ঘোড়া আর উটের পিঠে-চড়া বেতুইনদের 'কাফিলা' চলেছে তপ্ত মরুভূমির উপর দিয়ে একটু সবুজ ছায়া-ঘেরা মরুদ্যানের খোঁজে।

বুশায়ারে এসে ১০০ বছর আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়। ১৮৫৬ সালে 20th Bombay Native Infantry (এখন যার নাম Rajputana Rifles) বুশায়ারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিল ক্যাপ্টেন উড্-এর নেতৃত্বে। ১৯৫৬ ডিসেম্বরের ১০ তারিখের সেই ঘটনার সেন্টিনারী হলো মথুরাতে। ক্যাপ্টেন উড্কে দেওয়া হয়েছিল ১৮৫৬ সালে ভিক্টোরিয়া ক্রশ।

অনেক দেশের মানুষ বেতুইনরা। সর্বহারা রিফিউজিদের মতো ঘুরে বেড়ায় এক মরুদ্যান থেকে অন্য মরুদ্যানে, এক ফোঁটা জল আর একটু ঘাসের খোঁজে। পরিবর্তনশীল বেতুইনদের স্বভাব বুঝতে অনেক বিদেশীরই কষ্ট হয়। হঠাৎ দপ্ করে রেগে উঠবে বেতুইন আবার প্রাণ দিয়ে সেবা করবে অতিথির। অনুর্বর নিষ্ঠুর মরুভূমির সঙ্গে লড়াই করে সে বেঁচে থাকে।

হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, প্রায় ১৫ লাখ বেতুইন আছে সমস্ত আরব দুনিয়াতে। ঠিক নির্ভুল সংখ্যা বের করা দুরূহ ব্যাপার কারণ বেতুইনরা সেন্সাস্-এর ধার দিয়েও যায় না। একবার চেষ্টা করা হয়েছিল সেন্সাসের কিন্তু বেতুইনরা ভাবলো যে, একবার মাথা গোণা হয়ে গেলে গভর্নমেণ্ট ট্যাক্স আদায় করে টাকাও গুণতে শুরু করবে।

উটের লোমের তৈরি 'আব্বা' পরে ঘুরে বেড়ায় বেতুইন পুরুষরা। মেয়েরা আরবদের মতো 'বোরখা' পরে না। অচেনা পুরুষ দেখলে গায়ে ঢাকা দেওয়া শালের এক কোণা দিয়ে ঠোঁটের কাছটা ঢেকে নেয়। উটের পিঠে করে মাইলের পর মাইল যাত্রা করে আবার দরকার হলে উটের দুধ ও মাংস খায়। ভীষণ অলঙ্কার প্রীতি বেদুইন রমণীদের। জীবন-সংগ্রামের দরকারে মাঝে মাঝে লুটতরাজ করতেও বেতুইন পেছপা হয় না। আবার

তার বাড়িতে একবার নিমক্ খেলে বেদুইন তার প্রাণ দিয়েও অচেনা অতিথির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

বসরায় আলাপ হলো ডাঃ পূরণ সিং-এর সঙ্গে। ভারতের অনররি কন্সাল। বহু বছর কাটিয়েছেন ইরাকে। যশ, মান, অর্থ প্রচুর। এতদূরে থেকেও দেশের কথা ভুলতে পারেননি তাই অবৈতনিক কন্সাল হয়ে নিজের পয়সা খরচ করে দেশের সেবা করছেন আর তাতেই তাঁর আনন্দ। বিদেশে আমাদের দূতাবাসগুলিতে যখন 'কেরিয়ারিস্ট' ফরেন সার্ভিসের 'স্নব'দের দেখেছি, কি করে তাঁরা গরীব দেশের পয়সা খোলামকুচির মতো ওড়াচ্ছেন তখন ডাঃ পূরণ সিং-এর নিঃস্বার্থ সেবার কথাই মনে হয় বেশি করে। বসরা শহরে ডাঃ সিং-এর প্রতিপত্তি আর জনপ্রিয়তা প্রচুর। তিনি ভালোবাসেন ইরাকীদের আর ইরাকীরা ভালোবাসে অমায়িক, মৃদুভাষী, বৃদ্ধ এই শিখ ডাক্তারটিকে।

আবার বৃদ্ধ শর্মাজীকেও বড় ভালো লাগে। স্টেশনে আর পোর্টে ঘোরাফেরা করেন যদি কোনো 'হিন্দুস্থানীর' সঙ্গে মোলাকাত হয়ে যায়। কবে ইরাকে এসেছিলেন, বোধ হয় মনে নেই। সুদূর শিয়ালকোটের লোক শর্মাজী।

আরেকজন লোকের কথাও আজ বার বার মনে পড়ছে কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর নামটা ভুলে গিয়েছি—বোস না ঘোষ। দেখা হয়েছিল বসরার 'মার্গিল' স্টেশনে ফেরার সময়। গাড়ি থেকে নেমে 'প্ল্যাটফর্মে' দাঁড়িয়ে আছি, দেখি খাকী হাফ প্যান্ট-পরা এক ভদ্রলোক স্যুটকেসের উপর আমার নামের লেবেল খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন।

"আর ইউ ফ্রম ইণ্ডিয়া"—প্রশ্ন করেন।

"ইয়েস"—গৌরবর্ণ চেহারার ভদ্রলোকটিকে দেখে তাঁর ন্যাশনালিটি সম্বন্ধে কিছু ঠাওর করতে না পেরে আমিও জবাব দিই।

"বাই এনি চান্স্ আর ইউ এ বেঙ্গলী ?"

"ইয়েস বাই অল্ চান্স্" ইচ্ছে করেই একটু রসিকতা করি।

"আপনি বাঙালী ?" বলে ভদ্রলোক প্রায় চিৎকার করে আমার

হাত দুটো চেপে ধরলেন, "মশাই আজ দু' বছর বাঙলা কথা বলিনি।" অভিভূতের মতো কথা ক'টা বলে তিনি আমার স্যুটকেসটা উঠিয়ে নেন। নানা আপত্তি সত্ত্বেও আমায় নিয়ে যান তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে।

অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করেছি তার সঙ্গে। ইণ্ডিয়ান আর্মির হাবিলদার হয়ে এসেছিলেন মেসোপোটেমিয়ায়, ফিরে যাননি দেশে। বসরা থেকে অনেকদূর এক তেল কোম্পানীতে কাজ করেন। মাঝে মাঝে আসেন বসরায়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যান বাঙলাদেশ সম্বন্ধে। বোঝাতে চেষ্টা করি, আমি বাঙলার বাইরে থাকি, অনেক কিছুই জানি না, কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন না বা বুঝতে চান না।

"আমার অবস্থাটা দেখুন। এখন হয়ে গিয়েছি 'ইরাকী'। বছর দুয়েক আগে গিয়েছিলাম ভারতবর্ষে, ইরাকী পাসপোর্ট নিয়ে। ভিসার এক্সটেনশন করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।" ভদ্রলোক দুঃখ করতে লাগলেন।

পরের দিন পোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি আর সঙ্গে দিয়েছিলেন বসরার তৈরি দুটো মাটির জলের কুঁজো। কুঁজো দুটোই ভেঙে গিয়েছে কিন্তু ভদ্রলোকের স্মৃতি এখনও জ্বলজ্বল্ করছে।

বাগদাদ থেকে ইস্তানবুল যেতে ট্রেনে চারদিন লাগে। ট্রেনের নাম 'টরাস্' এক্সপ্রেস। অসময়ে বাগদাদে পৌঁছনোর জন্য সিরিয়ান ট্রান্সিট ভিসা যোগাড় হলো না। ট্রেন সিরিয়ান ফ্রন্টিয়ার দিয়ে যাবে, আর আমাদের এম্ব্যাসির লোকেরা ভয় দেখালো যে, যদি ভিসা না থাকে, সিরিয়ান পুলিস স্রেফ ট্রেন থেকে ঘাড় ধরে নামিয়ে দেবে। বুঝিয়ে বললাম যে, আপনারা দয়া করে সিরিয়ান কর্তৃপক্ষকে 'কেবল' করে জানিয়ে দিন যে, অমুক অমুক জার্নালিস্ট বিনা ভিসায় যাচ্ছেন, তাঁকে যেন রাস্তায় ভিসা গ্র্যাণ্ট করা হয়।

শুষ্ক মুখে থার্ড সেক্রেটারী বললেন, "তা করে দিচ্ছি, কোন ফল হবে না। আমাদের এ্যাডভাইস মেনে আপনি কাল প্লেনে যান।"

যা থাকে কপালে বলে রওনা তো হলাম, কিন্তু ভাবনা হলো যদি নামিয়ে দেয়, তাহলে কি হবে! সিরিয়ান বর্ডার স্টেশন 'তেল কোচেক' আসবে রাত ছটোয়।

ট্রেনের কামরার এক কোণে বসে ভাবছিলাম মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির কথা। ইরাক ইরান, সৌদী আরবিয়া, লেবানন, টার্কী, সিরিয়া, জর্ডন। ইরাক টার্কী আর ইরান একদিকে আর বাকী সব আরেক দিকে। বিশ্ব-শান্তির চাবি আছে এই মিডল-ইস্টে। তেলের রাজ্যে জল নিয়ে মারামারি। কিন্তু তলিয়ে দেখতে গেলে তেলে-জলে একই ব্যাপার। তেল নিয়ে যাবার জন্যই তো সুয়েজের উপর এত মায়া ইংরেজদের। ব্যাপারটা ইরান ঠিক বুঝতে পারছে না, কিন্তু জনমতের চাপে যখন আবার আবাদান (এ. আই. ও. সি.) 'ন্যাশনালাইজ' করার কথা উঠবে, তখন বুঝতে পারবে। যাক সে কথা পরে।

হঠাৎ গাড়ি এসে দাঁড়ালো মোসুল স্টেশনে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে যখন কামরায় ফিরে যাচ্ছি, বৃদ্ধ এক ইরাকী রেল কর্মচারী কাছে এসে দাঁড়ালেন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরখ করে প্রশ্ন করেন, "পাকিস্তান?"

"নো, হিন্দুস্থান" জবাব দিই।

"দ্যাট ইজ ভেরী ফাইন।"

"হোয়াট ইজ ভেরী ফাইন?"

"ইউ কাম ফ্রম ইণ্ডিয়া। টেল মি হাউ ইজ নেরু"—'রু'র উপর চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ভদ্রলোক।

"ইউ মিন নেহরু। ডু ইউ নো হিম?"

"ইয়েস শিওর আই ডু"—নেহরুজীর সঙ্গে লোকটার ঘনিষ্ঠতার কথা ভেবে একটু ঈর্ষান্বিত হচ্ছিলাম, এমন সময় "ওঃ, এভরী চাইল্ড ইন দি ওয়ার্লড নোজ হিম।" "ইজ হি নট গ্যাণ্ডিস সন?"

আশ্বস্ত হলাম। বুঝিয়ে বললাম, "নেরু গ্যাণ্ডির সন না—অন্য কারুর সন।"

"হি ইজ এ গুড ম্যান।"

"ইয়েস।"

"অ্যাণ্ড এ স্ট্রং ম্যান টু।"

"ইয়েস।"

"ইয়েস।"

"ইয়েস" বলে দু'জনেই হাসিতে ফেটে পড়ি। পাশের কামরা থেকে কতকগুলো মুখ বেরিয়ে আমাদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

রাত প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যায়। খোঁজ করে জানলাম, 'তেল-কোচেক' স্টেশন এসে গিয়েছে। সিরিয়ান ভিসা চেক হবে। আমার প্রাণ তো খাঁচা ছাড়া, এই বুঝি নামিয়ে দিলো। তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর নাম স্মরণ করছি, এমন সময় দরজায় টোকা।

"ইউ জার্নালিস্ট ফ্রম ইণ্ডিয়া?" সুপুরুষ সিরিয়ান ফ্রন্টিয়ার পুলিস অফিসার দরজায় দাঁড়িয়ে।

"ইয়েস।"

"উই হ্যাভ ইনস্ট্রাকশনস টু গিভ ইউ ভিসা হিয়ার।"

ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। খানিক বাদে ছাপটাপ মেরে পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে যায় অফিসারটি। বললাম "থ্যাঙ্ক ইউ।"

"রাইট গুড অ্যাবাউট মাই কান্ট্রি" বলে চলে গেল অফিসারটি। তার দেশের সুখ্যাতি করলেই সে সুখী।

পাশের কামরা থেকে করিডর দিয়ে ঘুম চোখে উঠে এলেন মিসেস অ্যান মিলার, চোখে মুখে ভাব "আই টোল্ড ইউ সো।" "কাম লেট আস হ্যাভ এ ড্রিংক অ্যাণ্ড এ গেম অব ব্রীজ টু সেলিব্রেট।"

পিছন ফিরে দেখি আমার সহযাত্রী জন থমাস এক চোখ খুলে আর এক চোখ বন্ধ করে পাতলা ফিনফিনে রাত্রিবাসে ঘেরা মিসেস মিলারের দিকে চেয়ে আছে।

উত্তরের অপেক্ষায় মিলারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জন জবাব দিলো, "গিভ দি ড্রিংকস নাও। কীপ দি ব্রীজ ফর টুমরো।"

এক রাউণ্ড হুইস্কীর পর মিসেস মিলার যখন নিজের কামরায় ফিরে গেলেন, তখন প্রায় ৪টা বাজে।

জন তখনও তন্ময় হয়ে মিসেস মিলারের 'ফিগারের' কথা ভাবছে।

মস্করা করলাম "জন, ডাজন্ট শী লুক কিউট উইথ দ্যাট ড্রেস অন

তন্দ্রার ঘোরে হাই তুলতে তুলতে জন জবাব দেয়, "শী উইল লুক কিউটার উইদআউট ওয়ান।"

বসরার বিরাট বিলিতী কোম্পানীতে এ্যাকাউন্টেন্টের কাজ করে জন। আরব হলে কি হবে হিসাবনিকাশ করে ঠিক বুঝেছে "শী উইল লুক কিউটার উইদআউট ওয়ান।"

আট

"ইস্ আমি যদি সেই ভিড়ের মধ্যে থাকতাম?" দুঃখ করলেন মিস্ সুমতি কলাম্‌কার।

"ওহ্! দি পুওর চিকেন্" চিকেন রোস্টটা নির্মমভাবে কাটতে কাটতে তাঁর আফসোস জানালেন মিসেস্ দীনা কোতওয়াল।

কথা হচ্ছিল সৌদী আরেবিয়ার 'ফ্যাবুলাস্' রাজা ইবন সউদকে নিয়ে। এই কিছুদিন আগে ভারতবর্ষে এসে রীতিমতো একটা তোলপাড় করে গেলেন। সিমলার কুফরী অঞ্চল থেকে ফেরার পথে সৌদের মোটরের চাকার নিচে একটা মুরগী চাপা পড়ে। গরীব এক বৃদ্ধাকে রাজা তক্ষুনি ক্ষতিপূরণ করেন কুড়িটা টাকা ঝনাৎ করে ফেলে দিয়ে। আবার সিমলায় তাঁকে দেখবার জন্য যে ভিড় হয়েছিল তাতে তাঁর মোটরে ধাক্কা লেগে একটি স্কুলের ছাত্রী অজ্ঞান হওয়ায় তাকে পাঠানো হয় সিমলা রিপন হাসপাতালে আর দেওয়া হয় এক হাজার টাকা। রাজা হুকুম দেন নিজের কন্‌সালকে যে তরুণীটির সেবার যেন কোনো ত্রুটি না হয়।

প্রায় ১৩০ জন সঙ্গী-সাথী নিয়ে এসে এখানে ওখানে প্রায় লাখ পাঁচেক টাকা ছড়িয়ে, এক কাপ চায়ের জন্য ২০০৲ দাম দিয়ে, ঘড়ি, তলোয়ার আর এন্তার আরব জোব্বা জায়গায় জায়গায় বিলিয়ে ইবন সউদ বেশ একটা হৈ চৈ করে গেলেন। একসঙ্গে প্রায় ৫০টা মোটরে করে তাঁর পার্টিকে রেলওয়ে স্টেশন থেকে এরোড্রমে যেতে দেখেছি। নাগপুরের কমলা লেবুর প্রশংসা তাঁর মুখ থেকে শুনে নাগপুরবাসীরা গদগদ হয়ে পড়লেন। পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লা আর ডাঃ পট্টভীকে দিলেন ঘড়ি, তলোয়ার আর জোব্বা। পঞ্চাশ জন এরোড্রম স্টাফের জন্য দুটো ঘড়ি দিয়ে করলেন বিবাদের সৃষ্টি। যাক্, ১৯১২ সালের পর এক স্বাধীন নৃপতিকে তাদের মাঝে পেয়ে নাগপুরওয়ালারা বেজায় খুশি। ১৯১২ সালে নাগপুরে পদার্পণ করেছিলেন পঞ্চম জর্জ।

১৯৫৩ সালে তাঁর পিতা আবদুল্ আজিজ অল-সউদ মারা যাবার পর ৫১ বছর বয়সে গদিতে আরোহন করেন হিজ ম্যাজেস্টি সউদ বিন্ আবদুল আজিজ অল্-সউদ। গোঁড়া মুসলমান, মদ্যপান অথবা ধূম্রপান কিছুই করেন না। প্রিয় পেয় হলো 'কাওয়া'। নেহরুজীকেও খাইয়েছিলেন 'কাওয়া'। বাগানের ভীষণ শখ আর দিল্লী থেকে তাঁর রাজধানী রিয়াদে পাঠানো হয়েছিল রকমারি ফুলের চারা আর বীজ।

প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা রাজা ইবন সৌদ মধ্যাহ্নে আধ ঘণ্টা আর লাঞ্চের পর থেকে ৪টা পর্যন্ত কোনো এনগেজমেণ্ট স্বীকার করেন না; কারণ এই সময় তাঁর নমাজ হয়। তাঁর কনভেয়র প্লেনের বসবার আসন এমনভাবে সাজানো যে, প্লেন যে দিক দিয়েই যাক না কেন তাঁর আসন সব সময় থাকবে 'কাবা'র দিকে। এটা অবশ্য শোনা কথা।

সৌদের ঐশ্বর্য অগাধ। তেল বেচে পয়সা। 'আরামকো' (Aramco) আরেবিয়ান আমেরিকান অয়েল কোম্পানীর দৌলতে বেশ আরামেই আছেন। প্রায় ৯৫৩০০০ ব্যারেল তেল উৎপাদন হয় প্রতিদিন, আর হয় ১৫০,০০০ কিউবিক ফিট গ্যাস।

সবশুদ্ধ প্রায় ২১৪৫৪ জন লোক কাজ করে তেলের রিফাইনারী ইত্যাদিতে। সৌদ কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট নন। দাবি করেছেন বুরামী দ্বীপের উপর। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কিছুদিন আগে আরোপ করেছিলেন যে, ইবন সৌদ আবুধাবীতে Coup de tat করবার তালে আছেন। আবদুল্লা অল্ কুরেশী নামে জনৈক লোকের দ্বারা সৌদ নাকি আবুধাবীর রাজার ভাই শেখ জইদ্ বিন্ সুলতানকে এক বিরাট মোটর গাড়ি আর ৪০ হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছিলেন। ইবন সউদ অবশ্য এই সব 'অ্যালিগেশন' অস্বীকার করেছেন।

কিন্তু সউদের এত অগাধ ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি আজ হলেও কিছুদিন আগে ছিল না। ১৯৪২ সালে সৌদী আরেবিয়ার বাজেট দেখে মনে হতো যেন রাজার নিজের পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। আমদানী আর খরচ ছিল প্রায় ২০ লাখ পাউণ্ড। তাছাড়া ৩০ লাখ ছিল বছরে ব্রিটিশ আর আমেরিকান গভর্নমেন্টের 'সাবসিডি' (Subsidy)। মাত্র ছ'বছর পর ১৯৪৮ সালে শুধু তেলের রয়ালটির আমদানী হয় ৫০ লাখ পাউণ্ডে (স্বর্ণ মুদ্রায়)। ১৯৫০-এ দাঁড়ায় ৭৫০ লক্ষ পাউণ্ডে। তেলের বাজারের দৌলতে ইবন সউদ কেন, ছোট ছোট অনেক শেখই, আমেরিকার মিলিওনার আর আমাদের রাজা মহারাজার উপর টেক্কা মেরেছেন। ইবন সৌদ তো তৈলযুগের রক্‌ফেলার— পৃথিবীর সব চেয়ে গরীব দেশের সব চেয়ে ধনী নৃপতি। স্যানফ্র্যানসিস্‌কোতে 'আরামকো'র ২০০নং বুশ্ স্ট্রীটের তেলের দপ্তরের দৌলতে আজ ইবন সউদ ঐশ্বর্যে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। কিন্তু কয়েক বছর আগেও ইবন সউদ দেশ থেকে দেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন প্রাণের ভয়ে। তাঁর পিতাকে সহ্য করতে হয়েছে অনেক কষ্ট আর বরণ করতে হয়েছে অশেষ দুঃখ। ছোট বয়সে পালিয়ে আসতে হয়েছিল কুয়েটে। ১৯০১ সালে মুষ্টিমেয় লোকের সাহায্য নিয়ে রিয়াদ আক্রমণ করেন আর নিজেকে ঘোষণা করেন নেজাদের আমীর বলে। ১৯১৫ সালে তিনি হন নেজাদের রাজা আর ১৯২৫ সালে হেজাজ আক্রমণ করে তিনি তাড়ালেন শরীফ হুসেনকে। শরীফ হুসেন ছিলেন 'হাশেমী'

বংশের অগ্রগণ্য নেতা আর আবহুল্লা আর ইরাকের ফৈজালের পিতা। এবার সৌদ নিজেকে করলেন হেজাজ আর নেজাদের নেতা আমীর—১৯৩২ সালে রাজ্যের নাম দিলেন সৌদী আরেবিয়া। সৌদ ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের নেতা আর সেই জন্য তাঁর প্রতি 'হাশেমী' বংশের বিদ্বেষ আজও যায়নি। আবহুল্লা কোনো কালে তাঁকে স্বীকার করেননি আর সৌদও আবহুল্লাকে পাত্তা দেননি।

মক্কা-মদিনার দেশ সৌদী আরেবিয়া। সৌদ ১৯৫২ সালে পিলগ্রিম ফী উঠিয়ে খুব নাম কিনলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে। আগে মাথা পিছু ৩৭৫্ টাকা ফী নেওয়া হতো। পরের বছরেই তিনি 'তাইফে' মারা যান আর ইবন সৌদ হন রাজা।

দশ লক্ষ বর্গমাইলে ঘেরা সৌদী আরেবিয়ার লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ। সঠিক লোকসংখ্যা জানা যায় না। কারণ আরব উপজাতিরা নিজেদের লোকসংখ্যা গণনার সময় বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক আর বাচ্চাদের ধরে না। তা ছাড়া বেহুইনরা রাজস্ব দেবার ভয়ে 'সেন্সাসের' মধ্যে পড়তে চায় না।

সৌদী আরেবিয়ার বেশির ভাগই মরুভূমি কিন্তু তার মধ্যেও এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে অনেক মরুদ্যান আর উর্বরা উপত্যকা। ইতিহাসের পাতা খুঁজলে পাওয়া যাবে যে, আরেবিয়ার ইতিহাসের শুরু 'সৃষ্টি'র শুরু থেকে। কারণ, আরবরা বলে যে, জেড্ডা হচ্ছে ঈভের (Eve) জন্মস্থান। আরব উপজাতিদের মধ্যে সদ্ভাব কোনো কালেই ছিল না অন্তত সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত তো নয়ই। সপ্তম শতাব্দীতে হজরত মহম্মদ এই কাজে হাত দেন। তিনি প্রচার করলেন যে, ভগবান মাত্র একজনই আর লোকদের বললেন তাদের পাগান (Pagan) ভগবানদের ত্যাগ করতে আর তাঁকে স্বীকার করতে ভগবানের 'প্রফেট' রূপে। কখনো কখনো হজরত মহম্মদ নিজেকে ভুলে যেতেন আর trance-এ পড়ে ঈশ্বরের সঙ্গে হতো তাঁর যোগাযোগ। ঈশ্বরের সেই বাণী তিনি শোনাতেন নিজের

ভক্তদের। সেই বাণী লিখে রাখতো শ্রোতারা—আর সেই হলো পবিত্র কোরান শরীফ। কোরানের আদেশের মধ্যে একটা হচ্ছে হজ যাত্রা অন্তত জীবনে একবার।

ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, অনেক লেখকের মতে, প্রথম প্রথম হজরত মহম্মদকে তাঁর নূতন ধর্মের প্রচার করতে তলোয়ারের সাহায্য নিতে হয়েছিল। ধীরে ধীরে আরবরা (তখন তাদের বলা হতো Saracen) এসে দাঁড়ায় ইসলামের সবুজ পতাকার নিচে। হজরত মহম্মদ ৬৩২ সালে মারা যান কিন্তু ইসলামের পতাকা তখন চলেছে দেশ থেকে দেশে—পশ্চিম এশিয়া হয়ে উত্তর আফ্রিকা, এমন কি স্পেন পর্যন্ত।

কিন্তু একতার অভাবে আবার আরেবিয়ার উপর বিপর্যয় আসে। ১৫১৭ সালে তুর্কীর আক্রমণে আরেবিয়া পদানত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত সমস্ত দেশটা তাদের দখলে ছিল কিন্তু ভ্রাম্যমান উপজাতিরা আর বেদুইনরা কোন কালে কারো বশ্যতা স্বীকার করেনি, আজও করে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শুরু হয় 'ওহাবী' আন্দোলন। এই আন্দোলনের জন্মদাতা ওহাব। তিনি চেয়েছিলেন ইসলামকে কুসংস্কার বর্জিত করতে। অধুনা ইবন সৌদের নেতৃত্বে ওহাবী আন্দোলন ক্রমশ জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, আরব ঐক্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্তত সৌদী আরেবিয়ায়।

কর্নেল টি. ই. লরেন্স ছিলেন আরবদের বন্ধু, আর তিনি আরব ঐক্যের জন্য অনেক চেষ্টাও করেন। আজ লরেন্স সম্বন্ধে নানা-রকম কাহিনী শোনা যায়। কোনো কোনো লেখক বলেন যে, লরেন্স ছিলেন 'বোগাস'। কিছুদিন আগে একটা বইতে দেখলাম লরেন্স সম্বন্ধে এক নতুন থিওরী বেরিয়েছে। লেখক বলেছেন লরেন্স ছিলেন 'ইললেজিটিমেট চাইল্ড' আর তাই তাঁর ছিল এক 'কমপ্লেকস্'। যাই হোক পশ্চিমের কাছে আরবকে তুলে ধরেন লরেন্সই। ১৯১৩-১৪ সালে সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট হয়ে আরব দুনিয়াতে আসেন লরেন্স আর জীবনের বহু বছর তিনি মরুভূমির দেশে কাটিয়েছেন। তাঁর 'ডেসপ্যাচ'গুলোকে মিথ্যা

ও ক্রটিপূর্ণ বলে অভিহিত করলেও একথা অস্বীকার করা চলবে না যে, তিনি যতটা চিনতেন আর কেউই ততটা আরেবিয়াকে চিনতো না। লরেন্সের ভক্ত আমি নই। কিন্তু বেশ জানি যে, লরেন্স আজ 'লিজেণ্ড' (legend) হয়ে দাঁড়িয়েছেন তার কারণ একাধিক।

আরেবিয়ার মধ্যপ্রান্তের মরুভূমিকে বলা হয় 'দাহনা'। ইংরিজিতে অনুবাদ করলে তার অর্থ হয় 'Empty Quarter'। মাইলের পর মাইল শুধু বালি আর কঠিন পাথরের স্তূপ। আজ পর্যন্ত শুধু দু'জন 'হোয়াইটম্যান' এই মরুভূমি পার হয়েছেন। আরবরাও খুব কমই এই বিরাট মরুভূমির এপার থেকে ওপার গিয়েছে।

মরুপ্রান্তরের পশ্চিম কোণ ঘেঁষে 'এল এহকাফ্'-এর কাছে ধ্বংসপ্রায় এক আরব শহর দাঁড়িয়ে আছে। কার কীর্তি কে জানে কিন্তু মনে হয় যে, নিকটবর্তী মরুদ্যানকে দুর্ধর্ষ বেদুইনদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যই বোধ হয় তৈরি করা হয়েছিল এই বিরাট প্রাসাদটিকে। কিছু খেজুরের গাছ আর সবুজ গাছগাছড়া দেখে মনে হয়, হয়তো কাছেই আছে কোনো জলাশয় বা ছোট কোনো স্ট্রীম। থাকলেই বা কি, আরেবিয়ার সব নদীনালার মতো এও বোধহয় বছরের বেশির ভাগ সময়েই শুকিয়ে থাকে।

রেললাইনের বালাই নেই, সব উটের ক্যারাভান। মদিনা থেকে ইয়েম্বো বন্দর ১৩০ মাইল—বালি আর পাথরের স্তূপের মধ্যে দিয়ে চলেছে উঁচু নিচু রাস্তা। হাজার হাজার লোক প্রতি বছর যায় ইয়েম্বো থেকে মদিনায় এই রাস্তা দিয়ে। ইয়েম্বোকে বলা হয় 'Gate of the Holy City'। কিছু দিন আগে পর্যন্ত যাত্রীদের দরকার হতো সশস্ত্র পাহারা, কারণ অনেক হতভাগ্য যাত্রী প্রাণ দিয়েছে বেদুইন আর অন্যান্য উপজাতিদের হাতে। মক্কা-মদিনায় তারা পৌঁছেছে হৃতসর্বস্ব হয়ে নয়তো বা ফিরে গিয়েছে নিজের দেশে মনে এই আশা নিয়ে যে, আবার আসবে পরের বছর মক্কা-মদিনায়। ভীষণ রোদে রোগের যন্ত্রণায় এই রাস্তায় প্রাণ দিয়েছে অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান 'কাবার' দিকে মুখ চেয়ে।

আবার ওয়াদী-মুসা'র Ravine-এর একধারে দাঁড়ালে দেখা যাবে পাথরের নগরী 'পেট্রার' ধ্বংসাবশেষ। অতীতকালে পেট্রা ছিল সমৃদ্ধশালী শহর, কিন্তু আজ হয়েছে ধ্বংসস্তূপে পরিণত। খুঁজলে দেখা যাবে এখানে ওখানে পাথরের গায়ে খোদা কিছু উপাসনাগৃহ আর স্মৃতিস্তম্ভ, দু'পাশে অতিকায় পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে সরু রাস্তা পেট্রা শহরের গা ঘেঁষে। এই রাস্তা ছিল এককালে প্যালেস্টাইন আর আরেবিয়ার বাণিজ্যের একমাত্র যোগাযোগ। এখন হেজাজ রেললাইন তৈরি হবার পর এই রাস্তা আর ব্যবহার করে না কেউই। তবুও কিছু সওদাগর তাদের মালপত্র নিয়ে এখনো ভালোবাসে এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে ঘোড়া বা উটের পিঠে চড়ে যেতে।

পেট্রার কাছে রয়েছে অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত এল-দির'র উপাসনাগৃহ। ভাবলেও আশ্চর্য লাগে যে, মরুভূমির দেশে কী করে এই বিরাট সৌধ তৈরি হয়েছিল। আলাদা পাথর বসিয়ে নয় একটা পাহাড় কেটে। পেট্রার গৌরবশালী অতীতের নিদর্শন এই উপাসনা গৃহ আজও স্মরণ করিয়ে দেয় রোমানদের স্থাপত্যের কথা, অর্থ আর বাণিজ্যের লোভে তাদের পেট্রা শহর অধিকারের চেষ্টার ইতিবৃত্ত। এখন সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। বালি আর পাথরের স্তূপের বুকে দাঁড়িয়ে আছে তাদের সেই কীর্তি।

বাগদাদে জন থমাস্ একদিন বললো সে আমায় আরবী সঙ্গীত শোনাতে নিয়ে যাবে। জনকে নিরাশ করতে মন চায়নি তাই গিয়েছিলাম গান শুনতে সন্ধ্যে বেলায়। ফিরে এসেছিলাম পরের দিন ভোরে আর জনকে জানিয়েছিলাম আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ। মরুপ্রান্তরের দেশে সঙ্গীত! কখনও কল্পনা করতে পারিনি। সঙ্গীতের সমজ্দার আমি নই তাই বোধ হয় এই ধারণা মনে পোষণ করেছিলাম। সে-ধারণা আজ ভেঙে গিয়েছে আর বুঝতে পেরেছি সঙ্গীতের দুনিয়াতে আরবের কত দান। ক্যাবারে আর নাইট ক্লাব ঘুরে ঘুরেও যখন আরব সঙ্গীতের কোন প্রশংসাই আমার মুখ থেকে শুনতে পেলো না,

তখন জন ছাড়লো তার ট্রাম্প কার্ড। অল্ রশীদ স্ট্রীট পেরিয়ে গলির মধ্যে একটা ছোট বাড়িতে আমাকে নিয়ে জন ঢুকলো। খানিকপরে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। জনের সঙ্গে তাঁর কি কথা হলো আরবীতে বুঝলাম না। কথাটা যে আমার সম্বন্ধেই হচ্ছিল শুধু সেটা বুঝলাম 'হিন্দীস্থান', 'হিন্দীস্থান' শব্দটা শুনে। বৃদ্ধ এগিয়ে এসে আমায় গভীর আলিঙ্গন করলেন আর চলে গেলেন বাড়ির ভিতরে

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে জনকে জিজ্ঞাসা করতেই জানলাম সে আমায় নিয়ে এসেছে এক আরবী সঙ্গীতের শিক্ষকের কাছে। খানিক পরেই স্মিতহাস্যে বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। হাতে একটা বিরাট মোটা খাতা আর পেছনে ট্রে হাতে এক চাকর। ছোট ছোট কাঁচের গ্লাসে তিনজনের জন্যে ঢাললেন আরক (কড়া একরকম ইরাকী মদ)। তারপর ক'ঘণ্টা যে তাঁর কাছে বসেছি মনে নেই—মাঝে মাঝে চাকরটা এসেছে আর গ্লাসে আরক ঢেলে দিয়ে গিয়েছে। সেদিন আরবী সঙ্গীতের দরদী বৃদ্ধ যা কিছু বলেছিলেন সব মনে নেই। মনে থাকবার কথাও না, কারণ প্রথমতঃ সঙ্গীতের কিছুই বুঝি না, দ্বিতীয়তঃ তাঁর বক্তব্য আমার বুঝতে হয়েছে জনের ইংরেজীর মাধ্যমে। মাঝে মাঝে তিনি কথা বলতে বলতে এক-একটা সুর আর তান গেয়ে আমায় বোঝাচ্ছিলেন। কখনোও কখনোও তাঁর সেই মধুর কণ্ঠের তান এখনও কানে ভেসে আসে। ডান হাতের তর্জনী দিয়ে বাঁ হাতের তর্জনী আর অনামিকার মধ্যে মৃদু মৃদু আঘাত করে সৃষ্টি করেছিলেন তাল।

বৃদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষকের স্মৃতি আজ মন থেকে মুছে গিয়েছে কিন্তু একটা ময়লা চিরকুট আজও আমার কাছে পড়ে রয়েছে। পেন্সিলের হিজিবিজি থেকে আরবী জানা এক বন্ধুর সাহায্যে যতটুকু উদ্ধার করতে পেরেছি নিচে দিলাম :

"স, রে, গ, ম, প, ধ, নী
ডো, রে, মী, ফ, সাল্, লা, সি
ইয়ক্ দো, সে, চার, পঞ্জ, শষ, হফত্
মীম, ফে, সাদ, লাম, সীন্, দাল, রে।"

যতদূর জানতে পেরেছি শিক্ষক বোধ হয় আমায় বিভিন্ন দেশের সঙ্গীতের সপ্তক দিয়ে রাগের ক্রম বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। ডিসাইফার করতে গিয়ে অনেক ভুলই হয়তো আমার হয়েছে কিন্তু সেই ময়লা চিরকুটটাকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। সঙ্গীতের দরদীরা হয়তো কিছু কিছু বুঝতে পারবেন এর কি অর্থ। যতদূর মনে হয় প্রথম লাইনটা বোধহয় ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আর শেষের লাইনটা আরবী সঙ্গীতের সপ্তক। দ্বিতীয়টা ইউরোপীয় আর তৃতীয়টা ইরাণী সঙ্গীত নিয়ে।

বৃদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষকের আরো কয়েকটা কথাও মনে আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বলে গিয়েছেন আর জন তার যৎসামান্য ইংরিজীর জ্ঞান নিয়ে আমায় বোঝাতে চেষ্টা করেছে। তার কিছু কিছু নোটস্ লিখে রেখেছিলাম। আরব সঙ্গীত সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞান তো সেই নোটস্ থেকেই।

সঙ্গীতের আরবী বৈজ্ঞানিক নাম, 'মুঝিকী' আর মনে হয় তার থেকেই ইংরিজী 'মিউজিক্' শব্দ এসেছে। অনেক আরবী শব্দই আজ ইংরিজী ভাষায় প্রচলিত। যেমন—এ্যালকেমী, কেমিস্ট্রী, এ্যালজেব্রা, এ্যালকালী, এ্যাজিমাথ, নাদির, এ্যাডমিরাল ইত্যাদি। 'মুঝিকী' থেকে 'মিউজিক' আসাও কিছু আশ্চর্য নয়।

সঙ্গীত সম্বন্ধে আরবীতে শ'খানেকের উপর বই আছে। অল্ মসুদী (মৃত্যু ৯৫৩ খৃষ্টাব্দে) আর অল্ ইস্ফাহানির (মৃত্যু ৯৬৭ খৃষ্টাব্দে) আরবী সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ লিখে অমর হয়েছেন। মসুদী সঙ্গীতের প্রারম্ভিক রূপ আর অন্যান্য দেশের সঙ্গীতের ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। ২১টা ভল্যুম-এ ইস্ফাহানি তৈরি আরবী সঙ্গীতের এক সংগ্রহ করেছেন। ইবন্ খালাতুন এই সংগ্রহকে আরবের 'দিবান' বলে অভিহিত করেন। মহম্মদ ইবন্ ইশাক অল বর্কি নামক আর একজন লেখকও আরবী সঙ্গীতের মূল সিদ্ধান্ত, ব্যবহার, আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করেছেন তাঁর এক বইয়ে। ১২৫৮ সালে বাগদাদের পতনের পর আরব সঙ্গীত নিয়ে কোনো বই প্রকাশিত হয়নি কিন্তু

গ্রীক ভাষায় লেখা সঙ্গীতের অনেক বইয়ের অনুবাদ আরবীতে হয়েছে।

আরবী সঙ্গীতে 'কসীদা' আর তার কিছু সুক্ষ্ম রূপ—যাকে 'কিতা' বলা হয়—তার প্রচলন খুব বেশি ছিল। তাছাড়া 'গজল' 'মওয়াল,', 'জলদ্' ও 'মুবাশশাহ্'-এর প্রচারও আছে। গানের সুরকে লয়ের সঙ্গে সপ্তকে বেঁধে দেওয়া হতো আর সেই প্রথার নাম ছিল 'আইকা'। কিন্তু আজকের সঙ্গীতে স্বর আর তালের যে ঐক্য তার সঙ্গে আরব সঙ্গীতজ্ঞেরা পরিচিত ছিলেন না। চৌথী, পাঁচবী বা আঠবী 'টুটের' উপর লয়কে তাঁরা দোহরাতেন আর একে বলা হতো 'তকরীব'।

আরব বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে 'অলউদ' (প্রায় সেতারের মতো), 'তবুর' (তম্বুরা), 'কাম্নুন' (অনেকটা সরোদের মতো,) 'কসবা' (বাঁশী), 'তবল্', 'ডফ্' আর 'কদীব' প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া আরো অনেক বাদ্যযন্ত্র আছে যা গানের আগে বা পরে বাজানো হয়। নানারকম বাদ্যযন্ত্র তৈরি করার বিদ্যাকে আরবরা প্রায় এক নতুন আর্টের মতো গড়ে তুলেছিল। 'সবীল' শহর বাদ্যযন্ত্রের তৈরি স্থান বলে প্রসিদ্ধ ছিল এককালে।

ইরাণী আর গ্রীক সঙ্গীতের কিছু প্রভাব আরবী সঙ্গীতে পাওয়া যায়, আবার আরবী সঙ্গীত ইরাণী আর গ্রীক সঙ্গীতের উপরও নিজস্ব ছাপ রেখে গিয়েছে।

ইসলামের গোঁড়া ভক্তেরা সঙ্গীতকে খুব নেক-নজরে দেখেন কিন্তু সুফী আর দরবেশ সম্প্রদায়ের লোকেরা সঙ্গীতকে আরাধনার অঙ্গ বলে মনে করেন। সঙ্গীত থেকেই 'হাল' (ভক্তি উন্মাদ) সৃষ্টি হয়। প্রসিদ্ধ আরব দার্শনিক অল্ গজলী বলেন 'হাল' মনের সেই অবস্থা, যা সঙ্গীত থেকেই সৃষ্টি হয়। সঙ্গীত থেকে যে 'হাল' সৃষ্টি হয়, কোরান পড়েও তা হয় না। গজলী তার সাত কারণ দেখিয়েছেন।

অল কিন্দো লিখেছেন—সঙ্গীত কারুর কাছে 'শরাব' আর কারুর কাছে 'গিজা' (পুষ্টিকর খাদ্য)। হকীম-হকন্-সীনা আবার সঙ্গীতকে অনেক রোগের 'দাওয়াই' মনে করেন।

তেল-বালির মরুপ্রান্তরে সঙ্গীতের রিসার্চ করার দুঃসাহস আর

করবো না। 'লিটল্ নলেজ ইজ ডেনজারস্' কথাটা আগেই মনে হওয়া উচিত ছিল। সঙ্গীতের মাধুর্য আমি ছাই কি বুঝি? "লুৎফ ম্যায় তুমকো কয়া কহুঁ জাহিদ্ হায় কাম্বকত্ তুনে তো পী হি নহী"র মতোই আমার অবস্থা।

নয়

"মেরে মৌলা, আব পাস বুলালে সরকারে-মদিনা", ছোটবেলায় দিল্লীতে এক অন্ধ মুসলমান ভিখারীকে রোজ বাড়ির সামনে দিয়ে এই লাইনটা গেয়ে যেতে দেখতাম। কালো আলখাল্লা পরা, গলায় একরাশ রঙীন পাথরের মালা ঝোলানো সেই ফকিরের চেহারাটা আজ আর ঠিক মনে পড়ে না। তাকে দেখে বাইরে বেরোতে গেলেই দিদি বলতো ঝুলির মধ্যে ভরে নিয়ে চলে যাবে। 'যে ছেলেটা কাঁদে, তাকে ঝুলির ভিতর বাঁধে' ছড়াটাও মনে করিয়ে দিয়ে ভয় দেখাতে ভুলতো না।

'সরকারে মদিনা' কী তখন জানতাম না। পরে নাম শুনতাম মক্কা-মদিনা আর এখন সাংবাদিকতা সম্বন্ধে লেকচার ঝাড়তে হলেই কপচাই : 'Fleet street is the Mecca of all journalist'.

মক্কা-মদিনার দেশ সৌদী আরেবিয়ায় গিয়েও ফিরে আসতে হয়েছে জেড্ডা থেকে। আমি 'নন-বিলীভার', 'কাবার' দরজা আমার জন্য বন্ধ।

কাবায় যেতে পারিনি, কিন্তু যেতে দেখেছি হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে। কেউ যায় ভয়ে, কেউ যায় আশায় আর কিছু যায় নির্মল শ্রদ্ধা আর ভক্তি নিয়ে। বছরের পর বছর প্রায় লাখ তিনেক মুসলমান আজ ১৪০০ বছর থেকে মক্কা-মদিনায় হাজী হতে যাচ্ছে কোরানের আদেশ মাথায় নিয়ে।

মির্জা গালিব কিন্তু তাঁর নিজের অবস্থার কথা ভেবে হজযাত্রার জন্যে নিজেকে যোগ্য মনে করেননি। তাই লিখেছেন—

"হাম বঁহা হ্যায় জাঁহাসে হামকো ভী
কুছ্ হামারী খবর নেহী আতী
মরতে হাঁয় আরজু যে মরণে কি
মৌত আতী হ্যায় পর নহী আতী
'কাবে' কিস মুহঁ সে যাওগে 'গালীব'
শরম্ তুমকো মগর নহী আতী"

যোগ্যতা থাক না থাক, অর্থ থাকলেই আজ যে-কোনো মুসলমান হাজী হয়ে আসতে পারে। আগের দিনের সেই ভয়াবহ যাত্রাও নেই, সে কষ্টও নেই।

প্রফেট মহম্মদ ৬৩০ খৃষ্টাব্দে চিরতরের জন্য মক্কা-মদিনার দরজা অমুসলমানদের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছেন। অ্যাডভেঞ্চার-এর নেশায় অনেক বিদেশী বিধর্মী 'হ্মাগল' হয়ে যাবার চেষ্টাও করেছে। কেউ কেউ আবার অনেকখানি গিয়েওছে, কিন্তু কোথায় একটা ছোট্ট আনুষ্ঠানিক উপাচারে ভুল করেছে আর নৃশংসভাবে তার হত্যা হয়েছে—ফিরে এসে আর 'রহস্যে ঘেরা' মক্কা-মদিনার কথা কাউকে বলতে হয়নি। গিয়েছে অনেকেই, ফিরেছে খুব কমই।

মক্কা-মদিনার রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা সম্বন্ধে অনেক কাহিনীই শুনেছি। সত্যি-মিথ্যা যাচাই করার কোনো উপায়ও নেই আর চেষ্টাও করিনি। বহুকাল আগে চল্লিশজন 'নন-বিলীভার' নাকি চেষ্টা করেছিল হজরত মহম্মদের সমাধি অপবিত্র করতে। যেই সমাধির কাছে পৌঁছেছে, এক অলৌকিক শক্তির চালনায় পায়ের তলার জমি হঠাৎ দু'ফাঁক হয়ে গিয়ে চল্লিশ জনেরই জীবন্ত সমাধি হয়। আবার শোনা যায় দু'জন ইহুদী মাটির তলায় সুড়ঙ্গ কেটে পৌঁছবার চেষ্টা করেছিল 'কাবায়'। হজরত মহম্মদ রাতে স্বপ্নে সেই ঘটনা জানতে পেরে তাঁর ভক্তদের জানান। তারপর দুই ইহুদীর কি পরিণতি হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়।

আরেবিয়ান নাইট্‌সের বিখ্যাত ইংরিজী অনুবাদক স্যার রিচার্ড বার্টন ১৯৫৩ সালে অল হজ আবদুল্লা নাম ধারণ করে ছদ্মবেশে মক্কা-মদিনায় গিয়েছিলেন বলে দাবি করেন। 'হারিমের' অন্তিম অনুষ্ঠানের পর তিনি লেখেন :

'I stood wonderstruck by the scene before me. The

vast quadrangle was crowded with worshippers sitting in long rows every where facing the centre-block tower ; the showy colours of their dresses were not to be surpassed by a garden of the most brilliant flowers, and such diversity of detail would probably not be seen massed together in any other building.........I have seen the religious ceremonies of many lands, but never—nowhere—aught no solemn, so impressive as this.'

আমি নন-বিলীভার সুতরাং মক্কা-মদিনায় গিয়ে হাজী হতে কোনদিন পারবো না। তাই যা কিছু বলবো, তা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড—অন্যের মুখ থেকে শোনা বা পড়া। আমার যাওয়ার এক বছর আগে আহমদ কামাল নামে এক আমেরিকান গিয়েছিলেন মক্কা-মদিনায়। আহমদ আমেরিকান নাগরিক হলেও তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন মুসলমান। রাশিয়ার উত্তরভাগের তুর্কীদের বংশ। আহমদ জন্মায় কালোর‍্যাডোর এক ক্যাটল র‍্যাঞ্চ-এ (Cattleranch)। ছোটবেলায় তাকে শিখতে হয় কোরান আর পরে মধ্যপ্রাচ্যে বছরের পর বছর ভ্রমণ করায় অনেক ভাষাই সে আয়ত্ত করে। ১৯৫২ সালে আহমদ যখন মক্কা-মদিনায় যাত্রা করে তার সঙ্গে ছিল জাভানিবাসী তার এক বন্ধু আমীর ইজ্জত। আমীর আগে একবার হজ করে এসেছে।

আহমদ কামাল লোকটির খোঁজ অনেক করেছি কিন্তু সন্ধান পাইনি। ফিরে এসে সে লিখেছে সুন্দর এক বৃত্তান্ত। তার সে বৃত্তান্ত আমি পড়েছি আর তার থেকেই কিছু কিছু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। মধ্যে মধ্যে কামালের বৃত্তান্তের ইংরিজী অনুবাদ করে তার নিজের কথাই নিচে দিলাম।

কোরানের 'সুরা' মুখস্থ করতে করতে আহমদ, ইজ্জতের সঙ্গে জাকার্তা থেকে প্লেনে রওয়ানা হয়। সৌদী আরেবিয়ার দহরানে যখন পৌঁছায়, টেম্পারেচার তখন ১১৫° ডিগ্রি। চোদ্দজন যাত্রী সেদিন গরমে মারা যায়। এইখান থেকেই যাত্রার প্রায় শুরু কারণ যাত্রীরা হজের শুভ্র বস্ত্র ধারণ করতে আরম্ভ করে। শুভ্র বস্ত্র ধারণের মানে হিংসা এবং দাম্পত্য জীবন বর্জন ও সুগন্ধ, গহনা

ইত্যাদি শৌখিন অভ্যাসের পরিত্যাগ—সমস্ত আনুষ্ঠানিক কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

কামাল আর তার বন্ধু যখন জেড্ডায় পৌঁছায়, তখন গরম ১২৬° ডিগ্রিতে উঠেছে। সোমালীল্যাণ্ড, ইথোপিয়া, সুদান মিশর, সিরিয়া, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেন নিয়ে আসছে যাত্রীদের আর নানা ভাষা নানারকম বেশভূষার আর চিৎকার কলহে জেড্ডা এয়ারপোর্ট যাকে বলে একেবারে 'বেডলাম'।

এক আরব অফিসার এগিয়ে এসে কামালের আমেরিকান পাসপোর্ট পরীক্ষা করে। অফিসার ভাবলো হয়তো কোনো নতুন অয়েল টেকনিশিয়ান। কিন্তু হজের ভিসা দেখে একটু অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি আরো কয়েকজন অফিসারকে ডাকলো। তারপর শুরু হলো কামালের জেরা। কামাল বুঝিয়ে বলে তার জন্মের ইতিহাস। খানিকক্ষণ চুপচাপ সব। সন্দেহ দোলা দেয় অফিসারের মনে। ডাকা হলো 'কোরানটাইন' ডাক্তার ফাহমী মুরাতকে। ডাঃ ফাহমী, তুর্কী-টার্টার আর তুর্কী ভাষা ভালো করেই জানতেন। তিনি কামালের তুর্কী ভাষার জ্ঞান পরীক্ষা করে রায় দিলেন কামালের পক্ষে। স্বস্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কামাল আর তার বন্ধু চললো আল তায়াসির হোটেলে। একটা ছোট কামরায় ছ'জন আরো সহযাত্রী সব মুসলমান সাংবাদিক, মিশর, টিউনিস আর তেহরান থেকে।

জেড্ডা, মক্কা থেকে ৪৫ মাইল দূর আর এইখানেই পাসপোর্ট জমা রেখে তার বদলে নিতে হয় নতুন একরকম পাস। মক্কা রোডের ইন্সপেকশন পোস্ট ফাঁকি দিয়ে এই পাস না নিয়ে যাওয়ার মানে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

কামাল তার বৃত্তান্তে বলছে, "শুনলাম সেই দিনই দু'জন জেরুজালেমের 'আনবিলীভার'কে এই রাস্তার আবিষ্কার করা হয় আর তাদের পাথরের পর পাথর মেরে হত্যা করা হয়।"

এক আরব অফিসার পরে কামালকে বলে ব্যাপারটা বড়

তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, কিছুই করা গেল না। মারা যাবার পর লোক ছুটোর জামা কাপড় খুঁজে জানা গেল তাদের কাছে ঠিক পাসই ছিল। কিন্তু তখন কিছুই করা যায় না। লোক ছুটোর কটা চুল আর সঙ্গের ক্যামেরা দেখে একটু ভুল হয়ে গিয়েছে। যাক শহীদ হয়ে তারা বেহস্তে যাবে।"

কামালের অবস্থা তখন সঙ্গীন। শরীরের রক্ত জমে জল হয়ে যায়।

চারদিন হয়ে গেল তবু কামালের 'পাস' আর এসে পৌছায় না। সন্ধ্যেবেলা হাঁটুর উপরে দেখা দিলো 'হিট র‍্যাশ' (Heat Rash)। এইবার এজেন্টের (আমাদের পাণ্ডার মতো) দয়া হলো আর এক স্বর্ণমুদ্রার বদলে সে এক ঘণ্টার মধ্যে পাস যোগাড় করে আনলো।

সন্ধ্যার একটু পরে কামাল আর ইজ্জতের শুরু হলো যাত্রা। টেম্পারেচার বেড়েই চলেছে আর তার সঙ্গে বাড়তে লাগল যাত্রীদের সংখ্যা। মোটর, লরী, বাস, গাধা, উট, আর পায়ে হেঁটে হাজার হাজার যাত্রীর সে কি আগ্রহ আগে পৌছাবার। কিসের অদৃশ্য টানে তারা যেন চলেছে এক অনিশ্চিতের অভিমুখে। কামাল দেখলো আর অবাক হলো এইজন্যে যে, এই অসংখ্য যাত্রীর মধ্যে এমন লোকও ছিল, যারা দু'বছর থেকে হাঁটছে—সিয়েরা লিয়ন (Sierra Leon) আর গোল্ডকোস্ট থেকে আরম্ভ হয়েছে তাদের যাত্রা।

পঁয়তাল্লিশ মাইল রাস্তায় তিনবার 'চেক' পোস্টে পাস পরীক্ষা করা হলো। ছ'ফুট লম্বা আরব পুলিস গার্ডরা একবার কামালের চেহারার দিকে চায়, তার পাসটা দেখে আর নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করে কামালকে ছেড়ে দেয়।

তারপর······

তারপর শোনা যাক কামালের নিজের মুখে :

"Then suddenly the gates of Mecca loomed out of the dusty night. Headlight beams laced the stifling darkness and Arabs with water skins offered to quench thirst, for silver. Heat lay upon us like a vast panting beast. But

the night was filled with the sound of rapturous prayer. Pilgrims neither remembered nor cared that they had been victimised every step of the way. We crossed a pot-holed incline and descended towards the random yellow lights of Mecca. My scalp tightened. We had reached the secret city."

কিছু দূরেই মক্কার বিরাট মসজিদের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রয়েছে 'কাবা'—নিকষ কালো পাথরের তৈরি নীল পাতলা কাপড়ে ঢাকা 'কাবা'—দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র স্থান। নমাজের সময়ে হাঁটু গেড়ে পৃথিবীর এক কোণ থেকে অন্য কোণের সব মুসলমান মুখ করে 'কাবার' দিকে। অনেকেরই বিশ্বাস তাদের প্রার্থনা সব এক হয়ে কাবা থেকে সোজা আল্লার কাছে পৌঁছোয়। এই অতিকায় সৌধ মুসলমানদের মতে পৃথিবীর সর্বপ্রথম ভজনাগাদ।

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ভবন 'কাবা'—স্বর্গ থেকে তার বহিষ্কারের পরে আদম এই মন্দিরে এসে উপাসনা করতো, তার ভাঙা হৃদয় নিয়ে।

("the most ancient edifice on earth, the temple beside which Adam worshipped, heart-sick after his expulsion from Paradise")

এইবার কামালকে 'কাবার' দরজায় অপেক্ষা করতে বলে আমরা একটু ইতিহাসের পাতা নিয়ে নাড়াচাড়ি করি। খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে হজরত মহম্মদের মক্কা অভিযান, দখল আর কাবার ভিতরে প্রবেশের সেই কাহিনী।

কুরেশদের সঙ্গে মহম্মদের সন্ধি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে কুরেশ উপজাতির সর্দার খুজাহ উপজাতিদের উপর আক্রমণ করে। খুজাহ উপজাতিরা আপীল জানায় মহম্মদের কাছে। দশ হাজার সশস্ত্র সঙ্গী নিয়ে মহম্মদ অভিযান আরম্ভ করলেন আর শুরু হলো তাঁর মক্কা যাত্রা। সন্ধ্যার কিছু পরে মহম্মদ তাঁর ফৌজ নিয়ে এসে পৌঁছলেন মক্কার বাইরে। সৈন্যদের হুকুম দেওয়া হলো, বিনা কারণে যেন কোনো রক্তপাত না হয়। কিছুক্ষণ পড়ে সৈন্যেরা তিনজন শত্রুকে ধরে নিয়ে এসে হাজির

করলো মহম্মদের সামনে। এই তিনজনের মধ্যেই ছিল দুর্ধর্ষ কুরেশ সর্দার আবু সুফিয়ান।

জীবনের প্রধান শত্রু, যার জন্য মহম্মদকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তার সামনে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আর মহম্মদের চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছে। সুফিয়ানের হৃদয় পরিবর্তন হলো মহম্মদের মহান ক্ষমায় আর কিছুক্ষণ পরেই বিনা রক্তপাতে মহম্মদ মক্কা জয় করে নিলেন। সেযুগের সামরিক ইতিহাসে এ বিরল ঘটনা। শোনা যায়, একজন ছাড়া বাকি সব বিজিত শত্রু-নেতাদের মহম্মদ ক্ষমা করেন।

আবু সুফিয়ান, 'কাবার' পূজারীরা আর মক্কার হাজার হাজার নরনারী ইসলাম ধর্ম এবার স্বেচ্ছায় বরণ করলো। মক্কা মুসলমানদের আর ইসলামে মূর্তি-পূজার (বুৎ-পরস্তি) স্থান নেই। একদিন ভোরে হজরত মহম্মদ গেলেন কাবার মন্দিরে, যেখানে রাখা ছিল রঙ-বেরঙের কাঠ, তামা আর পাথরের নানা আকৃতির প্রায় ৩৬০টা মূর্তি।

এক একটা মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ান আর 'আয়ত' বলতে থাকেন—"সত্যিই এবার হক্ক (সত্য) স্থাপিত হয়েছে—আর বাতিল (মিথ্যা) উঠে গিয়েছে।" সেই দিন দুপুরেই সব মূর্তি কাবা থেকে এবং মক্কার আরো অন্য জায়গা থেকে চিরতরে সরিয়ে ফেলা হলো আর 'কাবা' হলো মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে পবিত্র স্থান।

ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির ধার্মিক স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করে আর তাই যদিও ইসলামে মূর্তিপূজার কোনো স্থান নেই তবুও যতদূর পর্যন্ত অন্যের ধার্মিক স্বাধীনতার প্রশ্ন ওঠে ইসলামে মূর্তি পূজারী আর নিরাকারের পূজারীদের মধ্যে কোনো ভেদ করা হয়নি। মহম্মদ নিজেই আদেশ দিয়েছেন যে, সব ধর্মের উপাসনা গৃহ রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের ফর্জ (কর্তব্য)। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর থেকে শুধু সেখানেই নয় সমস্ত আরবের লোকেরা মূর্তি পূজা বর্জন করে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা শুরু করে। তাদের বিশ্বাস (কুরানেও লেখা আছে), 'কাবার' স্থাপনকারী ইব্রাহীম কোনো মূর্তিই সেখানে স্থাপন করেননি।

তিনি নিরাকারের পূজাই করতেন। পরে 'নাসমঝী'র দিনে কিছু মূর্তি ওখানে স্থাপন করা হয়েছিল।

'কাবা' থেকে মূর্তি সরানো শুধু এক জায়গা থেকে উঠিয়ে মূর্তিগুলো অন্য জায়গায় রাখার ব্যাপার নয়। একটা বিরাট দেশের কুড়ি-তিরিশ বছরের পুরোনো মজ্জাগত উপাসনার রীতি-নীতির আমূল পরিবর্তন। তামাম আরব জাতির সেদিন 'কায়াপলট' হলো ; এক নূতন আরব জাতির জন্ম হলো। শত শত বছরের জমানো সংস্কার ঐতিহ্য আর জীবন যাত্রার প্রণালী কিছুদিনের মধ্যে সব বদলে গেল আর তা করাবার জন্য মহম্মদ হলেন ঈশ্বরের হাতে নিমিত্ত মাত্র।

সেদিন দুপুর বেলা মহম্মদের আদেশে হাবশী-গুলাম বেঁলাল্ 'কাবার' সর্বোচ্চ শিখরে উঠে সারা শহরের ও আশেপাশের লোকদের নমাজের জন্য আহ্বান জানালো। ইসলামের সর্বপ্রথম মুয়জ্জেন্ (আজানের ডাক যে দেয়) বেলাল্।

আজ পৃথিবীর সব মুসলমানেরা কাবার দিকে মুখ করে নমাজ পড়ে কিন্তু হজরত মহম্মদ পয়গম্বর হবার ১৩ বছর পরে পর্যন্ত যতদিন তিনি মক্কায় ছিলেন, নমাজের সময় কোনো বিশিষ্ট দিকে '(কিব্লা)' মুখ করার কোনো রীতি ছিল না বলেই জানা যায়। মদিনায় যাবার পর ১৬ মাস পর্যন্ত মহম্মদ উত্তর দিকে মুখ করে নমাজ পরিচালনা করেন আর কাবা মদিনার ঠিক দক্ষিণে। মদিনার উত্তরে, বরঞ্চ উত্তর-পশ্চিমে তো জেরুজালেম, যে দিক ফিরে ইহুদীরা উপাসনা করতো।

মদিনায় পৌঁছানোর ১৬ মাস পরে মহম্মদ আবার দক্ষিণ দিকে মুখ করে নমাজ পড়া শুরু করলেন। ইহুদীরা কারণ জিজ্ঞাসা করলো।

কুরানে জবাব আছে :

"নাসমঝ্ লোকে জিজ্ঞাসা করবে এরা 'কিবলা' (নমাজ পড়ার দিক) কেন বদলে দিলো ? তাদের জবাব দাও যে, পূর্ব আর পশ্চিম দুই-ই আল্লার। তিনি যাকে চান তাকে ঠিক দিকেই টানেন" (কুরান—২।১৪২)।

"পূর্ব আর পশ্চিম দুই-ই আল্লার সুতরাং তুমি যে দিকেই মুখ

করবে সেদিকেই আল্লার মুখ আছে। সত্যিই আল্লা সর্বব্যাপী আর সর্বজ্ঞানী" (কুরান—২।১১৫)।

কাবা যাত্রার (হজ) অনেক পুরোনো কুসংস্কারে ভরা আনুষ্ঠানিক উপাচারকে হজরত মহম্মদ পরিবর্তন করেন। আগে লোকে নগ্ন হয়ে কাবার চারিদিকে চক্কর লাগাতো, মহম্মদ এই রীতি বন্ধ করে আদেশ দেন বস্ত্র ধারণ করতে।

দুপুরের নমাজের পর সেদিন মহম্মদ এক নিরাকার ঈশ্বর আর সব মানুষে ভাই-ভাই হবার সম্বন্ধে উপদেশ দেন। কুরেশের সর্দার আবু সুফিয়ান এবার নিজের সব ভুলের জন্য মহম্মদের ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। মহম্মদ কি জবাব দেবেন? তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। ধীরে ধীরে তিনি বললেন :

"আজ আমার দিক থেকে আপনাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। আল্লা আপনাদের ক্ষমা করবেন। আল্লা সব দয়াবানের শ্রেষ্ঠ দয়াবান) রহেমার্নেরহিম্)"।

'তায়েফের' বিদ্রোহ দমন সম্বন্ধে একটা সুন্দর ঘটনা শোনা যায়। তায়েফ-এর নিকটবর্তী কিছু উপজাতি তখনও মদিনার সরকার আর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। বারবার উপজাতির লোকেরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। বিদ্রোহ দমন করতে মহম্মদ এলেন তাইফে শহরে। দশ বছর আগে এই শহর থেকেই মহম্মদকে অপমানিত হয়ে রক্তাক্ত দেহে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। 'ঔতাসের' যুদ্ধের পর প্রায় ছয় হাজার উপজাতিকে বন্দী করে আনা হয়।

ছয় হাজার বন্দীর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে এমন সময় এক বৃদ্ধা হঠাৎ উঠে আসে মহম্মদ-এর সামনে। নিজের আসন থেকে উঠে এসে মহম্মদ বৃদ্ধাকে সম্মানের সঙ্গে বসান আসনে। বৃদ্ধার কথায় মহম্মদ ছয় হাজার বন্দীকেই মুক্তি দেন।

সেই বৃদ্ধা ছিল হলীমা—মহম্মদের ধাইমা।

মদিনায় হজরত মহম্মদের মৃত্যু হয়। কিন্তু সে কথা পরে। আবার শোনা যাক আহমদ কামালের কাহিনী।

কাবার দরজার সামনে একটু জায়গা পেয়ে কামাল আর তার বন্ধু দাঁড়ায়। অসংখ্য নরনারীর ভিড়ের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে

কামালের সামনে ভেসে উঠলো সেই পবিত্র কালো পাথর—কাবার এক কোণে রাখা সেই উল্কা। দেবদূত গ্যাবরিয়েল পাঠিয়েছিলেন এই পাথর আব্রাহাম আর ইশামেলের কাছে—ভয়ানক বন্যার (Deluge) পর আবার কাবা তৈরি করবার জন্যে।

হাজার কণ্ঠের সমবেত উপাসনা তখন সমস্ত পরিবেশে এক অভূতপূর্ব রূপ ধারণ করেছে। রাতের আঁধার চিরে শোনা যাচ্ছে সেই গুঞ্জন—কেউ কেউ আবার কাঁদছে অঝোরে।

উপাসনা শেষ করে কামাল আর তার বন্ধু ইজ্জত সাতবার প্রদক্ষিণ করলো আস-সাফা আর আল-মারহওয়ার পাহাড়ের মধ্যের রাস্তাটুকু।

আব্রাহামের মেইড্ (Maid) হাগার (Hagar) এইখানেই শিশুপুত্র ইশামেলের তৃষ্ণার জলের জন্য ছুটোছুটি করেছিল মরীচিকার পিছনে।

যে রাস্তার উপর দিয়ে 'হাগার' শিশুপুত্র ইশামেলের জলের জন্য মরীচিকার পিছনে ছুটেছিল, আহমদ কামাল আর তার বন্ধু আমীর ইজ্জতও সেই রাস্তার উপর দিয়ে ৫০০০০ লোকের সঙ্গে মৃদু স্বরে প্রার্থনা আওড়াতে আওড়াতে দ্রুত চলতে লাগল। আহমদের চোখের সামনেই এক বৃদ্ধ হজ-যাত্রী সেই ভিড়ের চাপে মারা গেল।

পরের দিন সকালে যখন গরম প্রায় ১১৬° ডিগ্রী (১৬০ জন যাত্রী সেই তাপে মারা যায়) কামাল 'আরাফাতে' রওনা হলো। হজের বেশির ভাগ ধার্মিক উপাচার হয় মরুভূমির কোলঘেঁষা আরাফাতে। বিকেলের দিকে লরী বোঝাই হয়ে আসতে লাগল মৃতদেহ, সেই সব যাত্রীদের যারা অর্থের অভাবে পায়ে হেঁটেই সেই অসহ্য গরমের মধ্যে রওনা হয়েছিল।

কামাল আর তার বন্ধু চাপলো এক বাসে। বাসের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে দুটো বাছুর, কুরবানীর জন্যে। আরাফাতে তারা যখন পৌঁছালো প্রায় ৮০০০০ তাঁবু সেখানে পড়েছে। পাথুরে জমির উপর পাতা তাঁবুর কাতার আর তার চারধারে ঘেরা এক বিরাট পাহাড়। স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হবার পর আদম আর ইভ আলাদা আলাদা হয়ে গিয়ে ২০০ বছর পৃথিবীর এক কোণা থেকে

আর এক কোণা পর্যন্ত খুঁজেছে একে অন্যকে। তাদের নিবিড় প্রেমের গভীরতা দেখে, স্বর্গের দেবতাদের হৃদয় বিগলিত হলো। আবার তারা এই পাহাড়ের কোলে পুনর্মিলিত হলো। পাহাড়ের চূড়ার উপর থেকে ইভ দেখলো আদমকে আসতে।

গরম তখন ১২৭° ডিগ্রী। আবার তিনজন লোক মারা গেল। দুপুরে সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর তখন না এসে পৌঁছলে হজ-যাত্রাই বৃথা। তাই এত কষ্ট সহ্য করেও হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমান তখনও চলেছে। নিজের সেবকদের সেদিন ঈশ্বর দর্শন দিয়েছিলেন তাই সেদিনটা ছিল সবচেয়ে পুণ্যদিন। দুপুরের সময় পাহাড়ের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো সব যাত্রীরা। দুপুরের প্রখর রোদে মনে হতে লাগল পাহাড়টা যেন রূপোর পুকুরে ভাসছে। শুরু হলো প্রার্থনা, প্রথমে ধীরে তারপর চড়তে লাগল আওয়াজ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়, প্রার্থনা শেষই হয় না। গোধূলির সময়ে সূর্য যখন ধীরে ধীরে চক্রবালের দিকে হেলে পড়লো হাজার হাজার যাত্রী তখন পালাতে শুরু করলো। এই পালানোও উপচারের একটা অঙ্গ। সবাই এবার যাবে 'মীনা'তে, যেখানে হবে হজের শেষ কাজ। মীনাতেই আব্রাহাম তার পুত্রকে (Gensis XXII) বলিদান করতে নিয়ে এসেছিলেন, যখন ঈশ্বরীয় কৃপায় একটা ভেড়া সেখানে এসে পৌঁছয়। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে ভাঙা পাথরের তিনটে মনুমেণ্ট যেখানে 'স্যাটান' (Satan) তিনবার উপস্থিত হয়ে আব্রাহামের ছেলেকে পালাতে বলে আর তিনবার পাথর নিক্ষেপ করে। হজ-যাত্রীরা এইখানে এসে পাথরের মনুমেণ্টগুলোর উপর তিনদিনে তিনবার পাথর ফেলে। মীনাতে আবার বলিদানও করা হয়। কামাল বলে যে, সেদিন দেড়লাখ ভেড়া কুরবানী হয়েছিল।

পরের দিন টেম্পারেচর পৌঁছেছে ১৪২° ডিগ্রীতে। প্রায় ৪০০০ যাত্রী সেইদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মারা যায়। রাতে কামালের ঘুম ভাঙে একটা গোঙানি শব্দ শুনে। ইজ্জত Heat Rash-এর যন্ত্রণায় শিশুর মতো কাঁদছে আর কাতরাচ্ছে। নাক দিয়ে তার বয়ে চলেছে রক্তের ধারা। ইজ্জতের মাথার কাছে পড়ে রয়েছে দুটো মৃতদেহ। 'আর না অনেক হয়েছে' মনে

মনে ভাবলো কামাল। এইবার তার নিজের মুখেই শোনা যাক :

"...Two swollen corpses lay on a broken massonry wall ...We had enough. Holding our robes to our nostrills we stepped over the sleeping Javanese pilgrims and hurried through the dark village, casting our remaining stones at the three pillars of Satan to fulfil the ritual".

"Beyond the summit of the valley we bought a ride and were in Mecca within the hour. A week later I was in New York. I had witnessed the most ancient religious ritual on earth—a ritual which antedates by millenniums the faith that adopted it"...

আহমদ কামালের হজ-যাত্রার কাহিনীই আমায় বলতে হলো কারণ মক্কা-মদিনার দ্বার থেকে আমি ফিরে এসেছি। 'মেরে মৌলা আব পাস্ বুলালে সরকারে-মদিনা' বলে আমার কোনো লাভ হবে না। মৌলা কখনই সরকারে-মদিনাতে আমায় 'বুলা'বে না। যেতে পারিনি তার জন্য অনুশোচনা নেই কিন্তু মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ-এর জন্মস্থান মক্কা আর যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল সেই মদিনা দেখতে পেলাম না বলে দুঃখ চিরকাল থেকে যাবে।

ধর্মের কিছুই বুঝি না কিন্তু মহম্মদের জীবনী আমার ভালো লাগে, আর তাই বার বার পড়েছি তাঁর সম্বন্ধে আর যতবারই পড়েছি ততবারই বেশি ভালো লেগেছে এই মহাপুরুষকে। "পৃথিবীর ইতিহাসে মহম্মদের দৃষ্টান্ত বিরল কারণ তিনি একসঙ্গে তিনটে কীর্তি স্থাপন করেন—এক জাতি, এক রাজ্য, আর এক ধর্ম।"*

কিছুদিন আগে 'Religious Leaders' বই নিয়ে আমাদের দেশে খুব হৈ চৈ হয়ে গেল। হজরত মহম্মদের বিবাহিত জীবনের উপর নাকি এই বইয়ে কিছু মিথ্যা ইঙ্গিত করা হয়েছে। যতদূর জানি দশবার মহম্মদ বিবাহ করেন আর তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম খদীজা। খদীজা মহম্মদের

* Mohammed and Moha mmadanism by Bosworth Smith P. 340.

চেয়ে ১৫ বছরের বড় ছিলেন। খদীজা যখন ৬৫ বছর বয়সে মারা যান তখন মহম্মদের বয়েস ৫০। খদীজার মৃত্যুর পর জীবনের বাকি ১৩ বছরে মহম্মদ আরো ৯টা বিবাহ্ করেন। মহম্মদের জীবনী ভালো করে পড়লে বোঝা যাবে যে, এই ৯ জনের মধ্যে প্রায় সবাই বিধবা—যাদের স্বামীরা ইসলামের যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল। তাদের মৃত্যুর পর মহম্মদ নিজের কর্তব্য মনে করে সেই বিধবাদের আশ্রয় দেন নিজের কাছে।

মহম্মদের দ্বিতীয় বিবাহ হয় গরীব বৃদ্ধা সৌদাহর সঙ্গে। তৃতীয় বিবাহ হয় আবুবকরের মেয়ে আয়েশার সঙ্গে আর চতুর্থ বিবাহ হয় হজরত উমরের বিধবা মেয়ে হফসাহর সঙ্গে। মহম্মদের পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম আর দশম স্ত্রীদের নাম যথাক্রমে—হিন্দ, জেনব, জুবেরিয়হ, সাফয়হ, উম্মী-হবিবহ সল্‌মা আর মেমুনাহ।

হজরত মহম্মদের তুই পুত্রই শিশু অবস্থায় মারা যায় আর তাঁর তুই মেয়ের মধ্যে ফত্‌মার বিবাহ হয় হজরত আলীর সঙ্গে।

মহম্মদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্মে ভাঙন ধরতে শুরু হয়। শিয়া আর সুন্নী দলের সৃষ্টি হয়। এর প্রধান কারণ মৃত্যুর সময় মহম্মদ নিজের উত্তরাধিকারী রেখে যাননি। তাঁর মারা যাবার পর ২২ বছর পর্যন্ত আরেবিয়ার উপর রাজত্ব করে তিন খলিফ্। সুন্নীরা পয়গম্বর মহম্মদের উত্তরাধিকারীকে নির্বাচন করার অধিকার দাবি করে আর শিয়ারা বলে হজরতের জামাই আলীই তাঁর উত্তরাধিকারী। সেই ঝগড়ার এখনও শেষ হয়নি। কিছু কিছু শিয়ারা আবার কোরানের কিছু অংশ মানতে নারাজ। তারা বলে কোরান দেবদূত গ্যাবরিয়েলকে দেওয়া হয়েছিল আলীর কাছে পৌঁছে দেবার জন্তে কিন্তু ভুলে গ্যাবরিয়েল তা পৌঁছে দেন মহম্মদের কাছে।

এবার হজরত মহম্মদের জীবনের শেষ ক'টা দিনের বৃত্তান্ত দিয়ে মক্কা-মদিনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুরু করবো আবার আমার যাত্রা।

অনেক তুঃখ কষ্ট সহ্য করে হজরত মহম্মদের শরীরের অবস্থা

প্রায় কাহিল হয়ে এসেছিল। একদিন সকালে আবুবকর মহম্মদের দাড়িতে কিছু পাকা চুল দেখে মহম্মদের বার্ধক্যের কথা ভেবে কাঁদতে শুরু করে দেন। হজরত হেসে জবাব দেন, "সুরে হুদ্, সুরে আল্‌বাকায়হ, সুরে আল্ কারয়হ, (কোরানের বিভিন্ন ভাগের নাম) আমার চুল পাকিয়ে দিয়েছে।"

মহম্মদের বয়স তখন ৬৩। একদিন সন্ধ্যেবেলা ভীষণ জ্বর এল। মাঝরাতের মদিনা শহর তখন ঘুমে আচ্ছন্ন। একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে মহম্মদ ধীরে ধীরে ঘুমন্ত নগরীর মধ্যে দিয়ে শহরের বাইরে 'কবরস্থান'-এ এসে উপস্থিত হলেন। ছুটো কবরের মধ্যে তিনি অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন কবরের নিচে চিরনিদ্রায় শায়িত লোকদের উদ্দেশ্যে :

"তোমাদের উপর সলাম্ (শান্তি) হোক। আল্লাহ তোমাদের আর আমাদের সবাইকে মাফ্ করুক। সেদিনের সকাল শান্তিময় হোক যেদিন তোমরা আবার জেগে উঠবে। সেদিন তোমাদের জীবন সুখী হোক। তোমরা আমাদের আগে চলে গিয়েছো। আমরা তোমাদের পরেই আসছি।"

পরের দিন সকালে নিজের তুই খুড়তাতো ভাই আলী আর ফজলকে নিয়ে, হজরত মসজিদে গিয়ে নমাজ পড়েন আর লোকদের বলেন,—"যদি কখনও আমি তোমাদের কারো কোনো ক্ষতি করে থাকি, তার ক্ষতিপূরণ করতে আজ আমি তৈরি। যদি কাউকে আমার কিছু দেবার থাকে, তাহলে আমার কাছে আজ যা কিছু আছে, সবই তার হবে।"

ধীরে ধীরে মহম্মদের শরীরের অবস্থা আরো খারাপ হতে লাগল। জুম্মার নমাজের জন্য তিনি নিজে আর যেতে পারলেন না, পাঠালেন আবুবকরকে। লোকের মনে সন্দেহ হলো যখন তারা দেখলো মহম্মদ নিজে আসেননি। তিনি তখন ক্লান্ত শরীর নিয়ে পৌঁছলেন মসজিদে। ভক্তরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। লোকেদের তিনি বোঝালেন যে, কারুর জীবনই স্থায়ী না। সবাইকেই একদিন যেতে হবে। ভক্তদের তিনি তখন তাঁর শেষ উপদেশ শোনালেন—"আল্লা তুনিয়াতে

তাদেরই সুখ দেবেন যারা বড় হতে চেষ্টা করে না, যারা অন্যায় করে না।"

মসজিদের কাছেই ছিল আয়েশার ছোট্ট কুঁড়েঘর। আলী আর ফজলের কাঁধে ভর করে তিনি আয়েশার বাড়ি গেলেন। সেদিন ছিল জ্বরের চতুর্থ দিন। পরের দিন শনিবার—জ্বরের প্রকোপ বেড়েই চললো। তাঁর অস্থিরতা দেখে নবম স্ত্রী উম্মা-সলমা চিৎকার করে কেঁদে উঠতেই মহম্মদ তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন, "চুপ করো। আল্লার উপর যার ভরসা আছে সে কখনও এমন চিৎকার করে কাঁদে না।"

সমস্ত রাত তিনি কোরানের 'সুরা' আবৃত্তি করতে থাকেন আর আল্লার প্রশংসা করেন। রবিবারের দিন তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়। অনশনে তাঁর শরীর খুবই দুর্বল ছিল। তাঁর মুখে এক ফোঁটা ওষুধ দেওয়াতে তিনি বড় দুঃখ করে বলেন—

"আল্লার কোপ (গজব) তাদের উপর পড়বে যারা পয়গম্বরদের কবর পুজো করে। আমার কবর কেউ যেন পুজো না করে।"

আয়েশাকে কাছে ডেকে বললেন—"নিজের কাছে কখনও অর্থ রেখো না। যা আছে সব গরীব দুঃখীদের দিয়ে দাও।"

আয়েশা তার সারা জীবনের জমানো ছ'টা সোনার 'দীনার' মহম্মদের হাতে তুলে দিলে তিনি হুকুম দিলেন এক্ষুনি ভিখিরীদের ডেকে এই 'দীনার' তাদের দিয়ে দাও। যখন তাকে জানানো হলো তাঁর হুকুম পালন হয়েছে, তিনি বললেন,—"এইবার আমি শান্তি পেলাম।"

মহম্মদ সত্যিই নিঃস্ব হয়ে গেলেন। রাতে ঘরে প্রদীপ জ্বালাবার তেল আয়েশা প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে নিয়ে আসে।

রবিবারের রাত কাটলো। সোমবারে জ্বরের প্রকোপ একটু কম। বাইরে মসজিদের প্রাঙ্গণে হাজার হাজার নরনারীর ভিড়। নমাজের সময় হয়েছে। আবুবকর নমাজ পড়াতে শুরু করলেন। সবে মাত্র দুটো 'রকায়েত' শেষ হয়েছে—এমন সময় আয়েশার কুঁড়েঘরের পর্দা ঠেলে, দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে হাসতে

হাসতে হজরত মহম্মদ বাইরে এলেন। নমাজ শেষ হলো। মহম্মদ আবার ফিরে গেলেন কুঁড়েঘরে। আয়েশার কাছ থেকে দাঁতন চেয়ে নিয়ে দাঁতন করলেন তারপর মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লেন। আয়েশার হাত মহম্মদের ডান হাতের ওপর রাখা ছিল, তিনি ইশারায় আয়েশাকে হাত সরাতে বললেন।

খানিকক্ষণ সব নিস্তব্ধ। তারপর ধীরে ধীরে হজরত মহম্মদ শেষবারের মতো বললেন—"এ আল্লাহ্, আমায় মাফ করো আর আমার সেই তুনিয়ার সব সাথীদের কাছে নিয়ে চলো।" তারপর আবার 'চিরকালের জন্য স্বর্গ'। 'মাফ্'। 'হাঁ!' 'সেই তুনিয়ার সাথী'। ব্যস শেষ হয়ে গেল—সোমবার ১২ রবিয়ল আউয়ল, ১১ হিজরী, ৮ জুন, ৬৩২ খৃষ্টাব্দে হজরত মহম্মদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

হাজার হাজার লোকের ভিড়। তারা বিশ্বাসই করতে চায় না যে, হজরত মহম্মদ আর নেই। আবুবকর ভিতরে গিয়ে চাদর উঠিয়ে মহম্মদের মুখে চুমু খেয়ে বললেন, "তুমি জীবনে সুন্দর ছিলে, মরণেও তুমি সুন্দর।"

বাইরে এসে আবুবকর কোরানের তুটো 'আয়ত' লোকদের মনে করিয়ে দিলেন। তার মধ্যে একটা ছিল মহম্মদকে দেওয়া আল্লার সেই বাণী, 'সত্যি তুমি মরবে আর সবাই মরবে।'

আবুবকর সবাইকে বললেন, "যারা মহম্মদের উপাসনা করে তারা জানুক যে, মহম্মদ সত্যিই আর নেই। কিন্তু যারা আল্লার আরাধনা করে তারা জানুক আল্লা জীবিত আর সে অমর।"

পরের দিন মদিনায় আয়েশার সেই কুঁড়েঘরে, যেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, সেখানেই আলী, ওসমান, আর ফজল, মহম্মদকে মাটির নিচে চিরবিশ্রামের জন্য শুইয়ে দেয়।

মৃত্যুর পর মহম্মদের সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটা সাদা খচ্চর, কিছু অস্ত্র আর এক টুকরো জমি। তাঁর কথা মতো তা গরীবদের বিলিয়ে দেওয়া হয়।

মহম্মদ একটা কাঠের পেয়ালাতে করে জল খেতেন। ভেঙে যাওয়াতে তিনি লোহার পাত দিয়ে সেটাকে বাঁধিয়ে ব্যবহার

করতেন। আনস্ নামে একটা লোকের কাছে সেই পেয়ালাটা পাওয়া যায়। আনস্ সেটা রূপো দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছিল।

কোরানে এক ঈশ্বরের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। 'তোহীদ' কোরানের সব সুরার সার। এক ঈশ্বর হওয়াতে পৃথিবীর সব মানুষকেই কোরানে এক বলা হয়েছে। 'কানান্নাসো উম্মতঁবাহিদতন্'—সব মানুষ একই জাত। 'বমা কানান্নাসো ইল্লা উম্মতঁবাহিদতন্'—সব মানুষই এক জাত ছাড়া আর কিছুই না।

এত সব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করলেই হতো কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়ে পৃথিবীতে যে আজ কত অন্যায় হচ্ছে তার কথা ভাবতে গেলে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় বই কি। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' আর 'হিন্দুস্থান হিন্দুকা' চিৎকার শুনতে শুনতেই তো এত বড় হলাম। 'জেহাদ' আর 'হিন্দুরাজ', 'মাইনরিটি' আর 'মেজরিটি' নিয়ে কত হৈ চৈ তো রাত দিন শুনছি। তীর্থ করতে জগন্নাথ-পুরী যাইনি,—মক্কা-মদিনায়ও যেতে পারিনি, কিন্তু কোন ধর্মই বুঝতে কষ্ট হয়নি। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের হানাহানির রক্ত-গঙ্গাও দেখেছি আবার মরুপ্রান্তরের বালির উপর ইহুদী আরবদের রক্তের ধারাও দেখেছি। অমৃতসরে স্বর্ণ-মন্দিরও দেখেছি আবার হাজার হাজার গৃহহীন শিখদের পাঞ্জাব থেকে পালাবার মিছিলও দেখেছি। মার্বেলের তৈরি মসজিদের মিনারও দেখেছি আবার মসজিদের পাশে বৃদ্ধ মুসলমান ভিখিরীকে করাচীর রাস্তার উপর মরতেও দেখেছি। লক্ষ লক্ষ প্যালেস্টাইন বিতাড়িত আরব ছিন্নমূলদের জর্ডনের কাছে দারুণ শীতে কুঁকড়ে মরতেও দেখেছি আবার বড় দিনের সময় গরীব খৃষ্টান আরবদের, মুসলমান আরব প্রতিবেশীর কাছে থেকে মোমবাতি ধার চাইতেও জেরুজালেমে দেখেছি। আবার ইহুদীরা যখন তাদের স্বপ্নের দেশ 'কানান' (Canaan)—ইজরাইল স্থাপন করলো কাউন্ট ফোক বার্নাডেটের মৃতদেহের উপর, নসীবের এমনই বিড়ম্বনা যে, তাদের হোলি সিটি জেরুজালেম হলো বিভক্ত আর 'প্রিন্স অব পীস' যীশুখৃষ্টের জন্মস্থান বেথেলহেম গেল মুসলমান-আরব জর্ডনের হাতে। আবার ইহুদীদের বিরুদ্ধে আরব-লিজনের সৈন্যাধক্ষ্য হলেন গ্লাব পাশা—জেনারেল জন্ ব্যাগট গ্লাব্

দশ

দু'হাজার বছর আগের রাত বারোটার এক পুণ্য মুহূর্ত স্মরণ করে এই সেদিনও বেথেলহেমের গীর্জায় গীর্জায় ঘণ্টা বেজে উঠেছিল। বছরের পর বছর জেরুজালেমের রোমান ক্যাথলিক প্যাট্রিয়ার্চ, চার্চ অব নেটিভিটির সঙ্কীর্ণ, ধ্বংসপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে রূপোর তারার উপর সযত্নে রেখেছেন শিশু যীশুর মূর্তি ঠিক সেই জায়গায়, যেখানে তাঁর জন্ম হয়।

দেড় হাজার বছর পুরনো চার্চ অব নেটিভিটির 'ডিকন্' (Deacon) প্রতিবারের মতো সেদিনও হাত বাড়িয়ে মূর্তিটা তুলে নেন। ধীরে ধীরে তিন পা এগিয়ে গেলেন, ডানদিক ঘুরে দুটো সিঁড়ি নেমে মূর্তিটা রাখলেন কাঠের তৈরি চৌকো একটা বাক্সে। যীশুখৃষ্টের জন্মের পুনরভিনয় প্রতি খৃষ্টমাসের মতো সেদিনও বেথেলহেমে হয়ে গেল।

দু'হাজার বছর আগে মেরী আর জোসেফ যখন ক্লান্ত শরীর নিয়ে এসে পৌঁছেছিল সরাইখানায়, তখন স্থানাভাবে তারা আশ্রয় নিয়েছিল পিছনের নোংরা আস্তাবলে। কিন্তু আজ আর সরাইখানায় জায়গার কোন অভাব হয় না—বেথেলহেমে না, আশেপাশের অন্য অনেক সরাইখানাতে। বেথেলহেমের সে সরাইখানা আজ আর নেই। আশেপাশের সরাইখানা সবই প্রায় খালি। যুদ্ধের ভয়ে তীর্থযাত্রীদের ভিড় আর হয় না। বিদেশ থেকে আসা দু'শ' আর ইজরাইলের দু'হাজার খ্রীষ্টান আরব সেদিন যীশুর জন্মোৎসব দেখতে এসেছিল বেথেলহেমে। পথে প্রতি পদক্ষেপে তারা দেখতে পেয়েছে সঙ্গীনধারী বর্ডার গার্ডদের সন্ধানী দৃষ্টি।

প্রাচ্যদেশ থেকে দু'হাজার বছর আগে এসেছিল 'ওয়াইজ মেন' (wise men) জেরুজালেমে, "ফর্ উই হ্যাভ্ সীন হিজ স্টার ইন দি ঈস্ট, অ্যাণ্ড আর কাম টু ওয়ারশিপ হিম"। সীজার আগস্টসের ট্যাক্সের ভয়ে জোসেফ মেরীকে নিয়ে চলে এসেছিল

বেথেলহেমে। রাখাল ছেলেরা দেখেছিল তাদের আসতে গভীর রাতে বেথেলহেমে দেখা যায় সেই অভূতপূর্ব নক্ষত্র আর জন্ম হয় যীশুখৃষ্টের।

মোজেস্ যখন 'ইজরাইলের' শিশুদের নিয়ে শুরু করে তাঁর যাত্রা, কল্পনায় তখন ছিল 'দুধ আর মধুতে' ভরা তাদের ভূমি 'কানান' (Canaan)। মডার্ন কানান ইজরাইলের আজ জন্ম হয়েছে কিন্তু 'হোলি ল্যাণ্ড' পড়ে রয়েছে কাঁটাতারের বেড়ার সীমান্তে জর্ডনে। 'হোমল্যাণ্ড ফর দি জুস' স্থাপন হলো কিন্তু বেথেলহেম পড়ে রইল তাদের সীমানায় যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ইহুদীরা পেলো তাদের ইজরাইল।

টাওয়ার অব্ আন্টোনিয়ার প্রাঙ্গণে আরেকদিন পাইলেটের বিচারে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, "অ্যাণ্ড ইট্ ওয়াজ দি থার্ড আওয়ার অ্যাণ্ড দে ক্রুসিফায়েড হিম"। Ecce Home Arch, পাইলেটের বিচারসভার—এক হাজার গজ দূরে রয়েছে সেই মহামানবের সমাধি। কনস্টাণ্টাইন ৩২৬ সালে তৈরি করে দেন চার্চ অব হোলি শিপালচার। প্রাচীন, ভগ্নপ্রায় সেই চ্যাপেলের পাথর থেকে কাটা 'টুম' (Tomb) দেখতে বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ নরনারী আসে। তারা দেখে সেই খালি 'টুম' যা মেরী ম্যাগডালেন দেখেছিল ক্রুসিফিকেশনের তিনদিন পরে। গ্যালিলিতে দেওয়া সেই অমর ভবিষ্যৎবাণীও তাদের মনে পড়ে, "দি সন্ অব ম্যান মাস্ট বি ডেলিভারড্ ইনটু দি হ্যাণ্ডস অব সিনফুল অ্যাণ্ড বি ক্রুসিফায়েড অ্যাণ্ড দি থার্ড ডে রাইজ এগেন"।

১৯৪৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় শান্তিদূত কাউণ্ট ফোক্ বার্নাডোট নিহত হন জেরুজালেমে। 'থার্ড ডে'তে তিনি আর 'রাইজ' করেননি। হোলি ল্যাণ্ডের মরুপ্রান্তরের বালুকণার সঙ্গে মিশে গিয়েছে তাঁর রক্ত আর তার উপর তৈরি হয়েছে ইহুদীদের নতুন 'কানান' ইজরাইল। কিন্তু মৃত্যুর তিন মাস আগে ২৮শে জুন তারিখে বার্নাডোট যে কাঁটাতারের বেড়া বসিয়ে দিয়ে গিয়েছেন 'হোলি সিটি' জেরুজালেমে, সে বেড়া আজও ইজরাইলের বুকের কাঁটা হয়ে রয়েছে আর থাকবেও।

লক্ষ লক্ষ আরব আর ইহুদীর রক্তে তৈরি হয়েছে ইজরাইল। প্যালেস্টাইনের বুকে নির্মমভাবে ছুরি বসিয়ে ছু'টুকরো করে তৈরি হলো জর্ডন আর ইজরাইল। চিরকাল সুখে শান্তিতে বাস করেছে খৃষ্টান আর মুসলমান আরব প্যালেস্টাইনে। বিংশ শতাব্দীর রাজনীতির মার-প্যাঁচ তারা এখনো বোঝেনি। জর্ডনের খৃষ্টান আরব জানে না কেন সে ছিন্নমূল হয়ে শীতে, গরমে, রোগে মরছে 'হোলি ল্যাণ্ডের' সীমান্তে আর হাজার হাজার মুসলমান আরবও বোঝে না কেন প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত হয়ে রাস্তার ধারে ছেলে, মেয়ে, মা, বোন নিয়ে সে মরছে।

ছু'ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে জেরুজালেমের পাহাড়ের কোলঘেঁষা বেইত-সাফাফা (Bait Safafa) গাঁয়ের ঠিক রাস্তার মাঝ দিয়ে। বেড়ার ছু'পাশে সঙ্গীন উঁচিয়ে ২৪ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে ইজরাইল আর জর্ডনের বর্ডার গার্ডরা—রক্ষা করে নিজেদের গভর্নমেণ্টের এলাকা—১৯৪৮ সালের ২৮শে জুন কাউণ্ট বার্নাডোট যা এঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন।

২৮শে আগস্ট ১৯৫৬ সালের বিকেলে ছোট্ট বেইত সাফাফা গ্রাম হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো। জেরুজালেমের বেলজিয়ান কনস্যুলেটের মালী মুসা আয়েশার (Moussa Ayasha) সেদিন বিয়ে ফাতিমা বিন্-এর সঙ্গে। হৈ চৈ করে বাজনা বাজিয়ে মুসা চলেছে বিয়ে করতে। জর্ডন সীমান্তের ছোট ছোট ছাদ নিচু কুঁড়েঘরের দরজার কাছে দেখা যায় আরবদের কৌতূহলী চোখ। মুসা চলেছে ফতিমাকে বিয়ে করতে। ফতিমার ছোট বোন জরিফ (Zariphe) হঠাৎ কেঁদে ওঠে—"আজকের দিনেও কেন আমি আমার বোনের কাছে যেতে পারবো না।" বর আর আত্মীয়স্বজনরা ভিড় করে দাঁড়ায় কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে। তারা দেখলো ফুলের সাজে সেজে, নতুন অর্গাণ্ডির সাদা গাউন পরে ফতিমা উঠলো গিয়ে ট্যাক্সিতে। সোনালী কাজ করা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে ফতিমা। ধীরে ধীরে ট্যাক্সি চলতে শুরু করে —আগে বরযাত্রীর দল আর পেছনে ফতিমার বন্ধুরা। বিভক্ত গাঁয়ের ছু'পাশ থেকে হাততালি বেজে ওঠে, মঙ্গলগীত শুরু হয়

আর যুবক যুবতীরা আনন্দে নেচে ওঠে। "আজ আমাদের এদিকে ভোজ খেয়ে যাও তোমরা", চিৎকার করে বেড়ার ওপারে গলা বাড়িয়ে নিমন্ত্রণ জানায় জর্ডন সীমানার এক বৃদ্ধ। "না আমাদের কাছে এখন বেশি মাংস আছে আর তাছাড়া মুর্গীগুলোও বেশ মোটা"—উত্তর দেয় ওপার থেকে এক ইজরাইলী আরব।

হঠাৎ ইজরাইলী আরবরা চুপ করে যায়। আনন্দে তাদের বাধা পড়ে। জর্ডন সীমান্তের ভিড় তখন শুরু করেছে দুঃখের গান। মোড় ঘুরতে গিয়ে ট্যাক্সিটা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। দুঃখের গানটা ধীরে ধীরে থেমে আসে। চোখের জল ঢাকতে বর্ডার গার্ডরা এবার নিজে নিজের জুতোর ফিতে বাঁধবার ভান করে নিচু হয়ে বসে, চোখ ফিরিয়ে নিয়ে। কাঁটাতারের বেড়া টপকিয়ে হঠাৎ জরিফ গিয়ে জড়িয়ে ধরলো ফতিমাকে। কাঁটাতারের ওপার থেকে আত্মীয়স্বজনরা হাত বাড়িয়ে দেয়। এবার ট্যাক্সি মোড় ঘুরলো বরের বাড়ির দিকে যাবার জন্যে। জর্ডন সীমান্তের আরবরা যতদূর দৃষ্টি যায় দেখতে লাগল—ফতিমা আর তার বর মুসা চলেছে পাহাড়ের দিকে।

বর্ডার গার্ডদের এবার সম্বিত ফিরে আসে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে তারা—শুরু করে সঙ্গীন উঁচিয়ে তাদের ভারী বুটের পদচারণা, সেই কাঁটাতারের দু'পাশে, যা প্যালেস্টাইনকে ইজরাইল আর জর্ডনে বিভক্ত করেছে।

সাধারণ লোকের কাছে এই ছোট্ট ঘটনাটার হয়তো কোনো দাম নেই। কিন্তু আমেরিকার 'টাইম' সাপ্তাহিকও এই খবরটাকে ফলাও করে ছাপিয়েছিল। ইজরাইল আমার শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি। আরব দেশগুলির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে ইজরাইলে গিয়ে আর বিপদে পড়তে চাইনি। (ইজরাইলের পাসপোর্টের ব্যাপার আগেই বলেছি।) কিন্তু জর্ডন সীমান্তে দাঁড়িয়ে দেখছি বিভক্ত 'হোলি সিটি' জেরুজালেম আর জানতে পেরেছি নতুন দেশ গড়ে তোলার জন্য ইজরাইলের কি অসম্ভব প্রচেষ্টা। মাত্র ৭ বছর আগে যে দেশ তৈরি হলো, ভাবতেও অবাক লাগে, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি-

ভঙ্গ করতে সেদিন, সেই দেশ কি ভীষণ চেষ্টাই না করেছিল। সুয়েজ খালের ব্যাপার নিয়ে যুদ্ধের যে কালো মেঘ সেদিন দেখা গিয়েছিল তার সৃষ্টি তো ইজরাইলই করে।

ইজরাইলকে জানতে হলে ফিরে যেতে হবে বহুদিন আগে ১৯১৬ সালে যখন সাইকস্-পিকট্ (Sykes-Picot) চুক্তি অনুসারে মধ্যপ্রাচ্যের তিন টুকরো করে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ আর রাশিয়ানদের মধ্যে। তারপরে আসতে হবে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে যখন বেলফোর ডিক্লারেশন (Belfour Declaration) অনুযায়ী ইহুদীদের 'ন্যাশনাল হোম' প্রতিজ্ঞা করা হয়। তারপর আবার ফিরে যেতে হবে ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন লর্ড অ্যালেনবীর অধীনে ব্রিটিশ সৈন্যরা প্রবেশ করে জেরুজালেমে। এর পরের পাতাগুলো তাড়াতাড়ি পাল্টাতে হবে—১৯২৩—প্যালেস্টাইনের উপর ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট শুরু—১৯২৯—প্যালেস্টাইনে আরব বিদ্রোহ—১৯৩৬-১৯৩৯—আবার প্যালেস্টাইনে আরব বিদ্রোহ—১৯৩৭—প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করা সম্পর্কে রয়াল কমিশনের প্রস্তাব—১৯৩৯—প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের আগমন (Immigration) কমাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে হোয়াইট পেপার প্রকাশ।

এইবার আমাদের যেতে হবে লণ্ডনে ফ্লিট স্ট্রীটে, রয়টার্স-এর আপিসে। তারিখটা ২৬শে জুলাই, ১৯৪৫। রয়টার্স-এর আপিসে সেদিন ইরাকের রিজেন্ট আমীর আবদুল্লা ছিলেন অতিথি। তিনি বসে বসে ভাবছিলেন ইংরেজগুলো কি পাগল? রয়টার্স-এর লোকগুলোর হয়েছে কি? এত ছুটাছুটি কিসের? আবদুল্লা তো জানতেন না সেই দিনটা ইংরেজের কাছে কত আশা ভরসা নিয়ে আসছিল। সেদিন লেবার পার্টি ইলেক্শন জিতেছে। নূতন আশা ও উদ্দীপনার স্বপ্ন দেখলো ইংরেজ। তেল-আভিভে ইহুদী যুবক-যুবতীরা শুরু করলো নাচ-গান। তারা ভাবলো, এইবার 'লেবার' তাদের 'প্রমিস' রাখবে আর ইহুদীরা পাবে তাদের 'ন্যাশনাল হোম'। আর্নেস্ট বেভিন চললেন ফরেন আপিসে।

কিন্তু কিছুই হলো না। লেবার গভর্নমেন্ট প্রতিজ্ঞা তো রাখতেই পারলো না উপরন্তু প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের ইমিগ্রেশন কমাবার চেষ্টা শুরু করলো। এক বছরের মধ্যেই প্যালেস্টাইনে সন্ত্রাসবাদীরা আতঙ্কের সৃষ্টি করে আর ১৯৪৭ সালে প্যালেস্টাইন 'সমস্যা' ইউ. এন. ও-তে পাঠায় লেবার গভর্নমেন্ট, আর সেপ্টেম্বর মাসে ইউ. এন. কমিশন পার্টিশনের প্রস্তাব করে। এবার ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নিজেদের দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে ম্যাণ্ডেট শেষ করে প্যালেস্টাইন ত্যাগ করার সঙ্কল্প জানান।

জুন মাসটা বোধ হয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অপয়া মাস। ৩রা জুন, ১৯৪৭ মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যান অনুযায়ী ছাড়তে হয় ভারতবর্ষ। ৩০শে জুন, ১৯৪৮ ছাড়তে হয় প্যালেস্টাইন আর ২৮শে জুন ১৯৫৬ সালে ছাড়তে হয় সুয়েজ।

শুক্রবার, ১৪ই মে, ১৯৪৮ সাল সকাল। প্যালেস্টাইনের হাইফা শহরের দু'পাশে ব্রিটিশ পুলিস আর মিলিটারী রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক ন'টার সময় প্যালেস্টাইনের শেষ ব্রিটিশ হাইকমিশনার জেনারেল স্যার আল্যান ক্যানিংহাম হাওয়াই জাহাজে নামলেন হাইফা এয়ারপোর্টে। সৈন্য আর পুলিসদের সেলাম নিলেন—বিদায় জানালেন ইহুদী আর আরবদের—বেজে উঠলো শেষবারের মতো প্যালেস্টাইনে 'গড্ সেভ্ দি কিং' আর ধীরে ধীরে ইউনিয়ন জ্যাক নেমে এল। ৩০শে জুন শেষ ব্রিটিশ সৈন্য প্যালেস্টাইন ছেড়ে চলে গেল।

সেইদিনই ১৪ই মে, ১৯৪৮ সাল জন্ম হয় ইজরাইলের আর ইহুদী ইতিহাসের প্রায় ১৯০০ বছরের ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা আবার জোড়া লাগে। সন্ধ্যা ৪টার সময় ডেভিড্ বেনগুরিয়ন তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে নীল লাউঞ্জ স্যুট পরে ঢুকলেন তেল-আভিভ মিউজিয়ামের হলে। তাঁর হাতে পঁয়ত্রিশজন নেতার সই করা 'স্টেট অব ইজরাইলস্ প্রক্লেমেশন।' ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন বেনগুরিয়ন :—

"......The Land of Israel was the birthplace of the Jewish people. Here they achieved independence and created a

culture of national and universal significance. Here they wrote and gave the Bible to the world......"

"With trust in Almighty God, we set our hand to this Declaration at this Session of the Provisional State Council in the city of Tel-Aviv, on this Subbath eve, the fifth day of Iyar, 5708, the fourteenth May, 1948".

সতেরো মিনিটে পুরো ডিক্লারেশন পড়ে শোনালেন বেনগুরিয়ন আর ইজরাইলের জন্ম হলো! আর সেই সঙ্গেও বুঝিবা শুরু হলো মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কালো মেঘের খেলা। পৃথিবীর ৭৪ দেশ থেকে ইহুদীরা এল ইজরাইলে, যখন নতুন গভর্নমেন্ট ১৯৫০ সালে 'ল অব রিটার্ন' পাস করে ইমিগ্রেশন করতে অনুমতি দেন। ষোল লাখ থেকে এখন ইসরাইলের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩ লাখে। এর মধ্যে ৭ লাখ বাইরে থেকে এসেছে।

কিন্তু ইজরাইলের জন্মের কাহিনীর শেষ এখানেই নয়। আমাদের যেতে হবে আবার পিছনে। জুন ১৯৪৬ সালে প্যালেস্টাইনের ইহুদীদের 'হাগ্যানা' পার্টির লোকেরা বোমা দিয়ে কিছু ব্রিজ উড়িয়ে দেয়। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতিপত্তিতে এর চেয়ে বড় আঘাত আর হয়নি। মিলিটারীর হাতে এবার সব ছেড়ে দেওয়া হলো আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় দোষী নির্দোষ সব ইহুদীদের নির্যাতন। এর পরের ঘটনা হচ্ছে জুলাই মাসের ২২শে তারিখে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্যালেস্টাইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হেড-কোয়ার্টার ছিল জেরুজালেমের কিং ডেভিড্ হোটেলের পূর্বদিকে একই বাড়িতে। এবার 'ইরগুন' পার্টি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হেডকোয়ার্টারকে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেবার সংকল্প করে। এই অভেদ্য অট্টালিকার শত শত সশস্ত্র প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে যে কি করে এই প্ল্যান সফল করা হয়েছিল তা পড়লে রোমাঞ্চকারী নভেলের মতো মনে হয়।

আরবদের ছদ্মবেশে 'ইরগুন' দলের লোকরা দুপুরবেলা একটা ট্রাকে করে এসে পেঁ ছায় কিং ডেভিড্ হোটেলের পশ্চিম কোণে। তাদের সঙ্গে টিনের পর টিন দুধ। হোটেলের লোকেরা ভাবলো, এরা রোজকার দুধ যারা সাপ্লাই করে তাদেরই লোক। দুধের

টিনগুলো সব নিচের বেসমেণ্টে ঠেলে ঠেলে ফেলতে লাগল আরবের ছদ্মবেশে ইরগুন দলের লোকেরা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যদিও বেসমেণ্টটা প্যালেস্টাইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আপিস পর্যন্ত লম্বা ছিল, এখানে কোন পাহারা বসানো হতো না। রিভলবারের ভয় দেখিয়ে রান্নাঘরের লোকদের ঠেকিয়ে রেখে 'আরবরা' বেসমেণ্টে পৌঁছায়। তাদের কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, হঠাৎ এক ব্রিটিশ মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে তাদের দেখা হতেই অফিসারটিকে তারা গুলী করে। গুলীর আওয়াজে লোকজন দৌড়ে আসতেই ট্রাকে করে 'আরব'বেশী সন্ত্রাসবাদীরা পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই কিং ডেভিড হোটেল আর 'প্যালেস্টাইন পোস্ট' খবরের কাগজের আপিসে ফোন আসে যে, এক্ষুনি বিস্ফোরণ হবে। কিন্তু কিছু করবার আগেই ভীষণ শব্দ করে বিস্ফোরণ হয় আর ৯০ জন ইংরেজ, আরব আর ইহুদী তাতে মারা যায়।

এইবার শুরু হয় মিলিটারীর অত্যাচার আর লেফ্‌টেন্যাণ্ট জেনারেল ই. এইচ. বার্কারের সেই কুখ্যাত অর্ডার-অব-দি-ডে বেরোয় যাতে তিনি ইহুদীদের এই ব্যাপারের জন্য শাস্তি দেবার আদেশ দেন মিলিটারীকে। ধর-পাকড়, কার্ফু, অত্যাচারে ইহুদীরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে আর ওদিকে সন্ত্রাসবাদীদের আতঙ্কও ছড়াতে থাকে। এই সময় নাকি প্যালেস্টাইনে দু'লাখ সাবালক পুরুষের জন্যে এক লাখ সৈন্য ছিল। এরপর শুরু হয় 'অপারেশন ইগলু,' (Operation Igloo) আর সমস্ত 'ইল্‌লিগ্যাল ইমিগ্রাণ্টস'দের ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা হয়। কিছুদিন পরে ব্রিটিশ সৈন্যরা একজন ইহুদী যুবককে ধরে প্রকাশ্য রাস্তায় বেত মারে। ইরগুন এর শোধ নেয় একজন ব্রিটিশ মেজর আর পাঁচজন এন. সি. ও-কে বেত মেরে ও পরে তাদের কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইহুদী আর আরব নেতারা প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করার প্রস্তাব অস্বীকার করেন আর তার পরেই প্যালেস্টাইনের প্রশ্ন ইউ. এন. ও-তে যায়। কিন্তু গ্যালিলির তীরে ব্রিটিশ সূর্য ডুববার আগেই শুরু হয়ে যায় ইহুদী আর আরবদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ। সে সঙ্ঘর্ষ আজও চলেছে

আর দুই মহাযুদ্ধের 'প্রবলেম চাইল্ড' ইজরাইল ধীরে ধীরে আবার তৃতীয় যুদ্ধের 'প্রবলেম' হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মাত্র আটত্রিশ দিনের আরব-ইজরাইলী যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করে আজ আর কোন লাভই হবে না, আর যুদ্ধের ব্যাপক বর্ণনা করেও কোন ফল নেই। যুদ্ধের শিশু (চাইল্ড অব ওয়ার) বলা হয় প্যালেস্টাইনকে আর বিভক্ত প্যালেস্টাইনকে নিয়েই আরব-ইজরাইলী সঙ্ঘর্ষের সূত্রপাত। এই সমস্যা চিরকালই পৃথিবীকে যুদ্ধের কাছে টেনে নিয়ে যাবে আর ইজরাইল প্রবলেম চাইল্ডই থেকে যাবে।

প্যালেস্টাইনের কাহিনীকে এক ইংরেজ সাংবাদিক বলেছেন : "story of unfulfilled promises, broken pledges and half-hearted measures !"

এডমণ্ড বার্ক লিখেছেন : "Unsettled questions have no pity for the repose of nation."

পৃথিবীর বড় বড় শক্তিরা যতদিন পর্যন্ত না মধ্যপ্রাচ্য থেকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির স্বপ্ন ত্যাগ করেন, আরব-ইজরাইল সমস্যাও 'আনসেটেল্ড' রয়ে যাবে।

মধ্যপ্রাচ্যের আধুনিক ইতিহাস রচনার সময় যদি লরেন্স অব আরেবিয়া বেঁচে থাকতেন, তাহলে কয়েকটি স্মরণীয় তারিখ তিনি তাঁর ডায়েরীর পাতা থেকে তুলে ধরতেন। আরব-লিজনের কিছু দিন আগের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ জেনারেল গ্লাব পাশার ডায়েরীতে নিশ্চয়ই এই তারিখগুলোয় লাল আঁচর কাটা আছে।

কাইরোর এক হোটেলে ১৯৪৫ সালের ২২শে মার্চ জন্ম হয় 'আরব-লীগের'। দু'বছর পরে ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে, ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট শেষ হবার পর ইউ. এন. জেনারেল অ্যাসেম্বলী অনুমোদন করে প্যালেস্টাইন পার্টিশন প্ল্যান। পরের মাসে আরব-লীগ ঘোষণা করে যে, আরব রাষ্ট্রেরা নতুন ইহুদী রাজ্য ইজরাইলের স্থাপনাকে বাধা দেবে। সঙ্ঘর্ষের 'স্টার্টিং পয়েন্ট' এইখান থেকেই। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে

ইজরাইল রাজ্যের ঘোষণা হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে দিনের বেলা ইহুদী সৈন্যরা দখল করে 'একর' (Acre) আর আরব সৈন্যেরা রাতে প্যালেস্টাইন সীমান্ত অতিক্রম করে। আবার সেই দিনই ইউ. এন. অ্যাসেম্বলীতে কাউণ্ট ফোক বার্নাডোটকে প্যালেস্টাইন মেডিয়েটর নিযুক্ত করা হয় আর সেই দিনই শেষ ব্রিটিশ হাই-কমিশনার স্যার অ্যালান ক্যানিংহাম প্যালেস্টাইন ত্যাগ করেন।

এর পরের ঘটনাগুলো দ্রুত ঘটতে থাকে আর আমেরিকা ও রাশিয়া নতুন ইহুদী রাজ্যকে স্বীকার করে। ১১ই জুন এক মাসের জন্য যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হয়, কিন্তু যুদ্ধের বিরতি হয় না, তাই আবার ১৮ই জুলাই দ্বিতীয় ট্রুস (Truce) হয়। ঠিক এক মাস পরে দুই পক্ষই আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে আর ১৫ই সেপ্টেম্বর ইহুদীরা জানায় যে, আরবরা শীঘ্রই জেরুজালেম আক্রমণ করবে। কাউণ্ট বার্নাডোট ঠিক করলেন, তিনি নিজে গিয়ে 'সিচুয়েশন স্টাডি' করবেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর দুপুর বেলা জেরুজালেমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে 'স্টার্ন গ্যাঙ্গের' লোকেরা তাঁকে হত্যা করে নির্মমভাবে। বার্নাডোটের হত্যা সমস্ত পৃথিবীকে বিচলিত করে। এবার ইউ. এন. ও. কিছু সাহস দেখিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইজরাইলের সঙ্গে ইজিপ্ট, লেবানন আর সিরিয়ার সন্ধি হয়।

ফেব্রুয়ারী মাসের সেই 'আর্মিসটিস'-এর আজ আর কোন দাম নেই। ইজরাইল তার অস্তিত্ব প্রায় অস্বীকার করতে বসেছে। সিনাই মরুভূমির বুকে আবার সেদিন রক্তের ধারা বয়ে গিয়েছে আর তীরানা, রসুনসীর, ইলিয়াত আর আকাবার মোহানা আবার কামানের গর্জনে কেঁপে উঠেছিল। নতুন জেরুজালেমে ইজরাইলী 'নেসেট' (Knesset)—পার্লামেণ্টে—বেনগুরিয়ন, মঁশে স্যারেটের আর কাইরোতে কর্নেল নাসেরের বক্তৃতায় হাততালির ফোয়ারা ছুটেছে।

পুরনো জেরুজালেমের 'আজহারা' হোটেলে বসে সেদিন অনেক কথাই ভাবছিলাম। একের পর এক অনেক চেনা-

অচেনা মুখই যেন চোখের সামনে দেখতে পেলাম—গ্র্যাণ্ড মুফতি অব জেরুজালেম, আমীর আবতুল্লাহ, হুসেন, জেনারেল গ্লাব পাশা, ডেভিড বেনগুরিয়ন, কাউন্ট ফোক বার্নাডোট, ডাঃ র‍্যালফ বুঞ্চ, ড্যাগ হামারশীল্ড, অর্নেস্ট বেভিন, স্যার আলেক কার্কব্রাইড, জেনারেল বার্কার এবং আরো কত শত। আরব-ইজরাইলী সঙ্ঘর্ষের নাটকের ড্রামাটিস্ পারসোনে।

মহম্মদ আমিন আল হুসেনী উঠে পড়ে লেগেছিলেন একটা আরব জনমত তৈরি করতে আর তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে রাজনৈতিক চেতনা। ১৯৪৬ সালে যখন ইহুদী 'ইমিগ্রেশন' শুরু হয়, হুসেনী ফ্রান্স থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন কাইরোতে রাজা ফারুকের কাছে। এই নিয়ে তার চতুর্থ পলায়ন হলো আর তিনি আবার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন।

মহম্মদ আমিন কিছুদিন লেখাপড়া করেন অল্ আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু পড়া শেষ না করেই চলে যান মক্কায়। তাঁর নাম হয় হজ আমিন। তারপর টার্কীতে কিছুদিন সৈনিক স্কুলে শিক্ষালাভ করে ফিরে এসে চাকরি নেন কাস্টমসে। শেষে জেরুজালেমে, তাঁর জন্মস্থানে স্কুলের মাস্টার হলেন। এইখানেই হয়তো হজ আমিনের বাকি জীবনটা কেটে যেতো, কিন্তু তাহলে আরব রাজনীতির গতিও অন্যরকম হতো। ১৯২০ সালে জেরুজালেমের এক ব্রিটিশ কোর্ট তাঁকে দশ বছরের জন্য জেলে পাঠায় ইহুদীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা করার অভিযোগে। কিছুদিন পরেই কিন্তু আমিন জেল থেকে পালালেন ট্রান্সজর্ডনে। আশ্রয় পেলেন আমীর আবতুল্লার কাছে।

প্যালেস্টাইনের ইহুদী হাইকমিশনার স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েল আরব বন্ধুত্বের আশায় আমিনকে শুধু মার্জনাই করলেন না, তাঁকে জেরুজালেমের মুফতিরূপে নির্বাচিত করলেন; হজ আমিন হলেন প্রথমে মুফতি, তারপর ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্র্যাণ্ড মুফতি অব জেরুজালেম। তিনি শুরু করলেন জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ। হিটলার তখন সবে জার্মানীর রাজনীতিতে উদয় হয়েছেন। ১৯৩৬-এর আরব বিদ্রোহের জন্য তৈরি হতে

থাকলেন গ্র্যাণ্ড মুফতি। তাঁর রাজনীতি ছিল দয়ামায়াহীন। যে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্যালেস্টাইন গভর্নমেণ্ট মুফতিকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করলেন। মুফতি আশ্রয় নিলেন 'ডোম অব দি রক'-এ।

যখন ধীরে ধীরে আরব বিদ্রোহের আগুন নিভে আসতে লাগল, মুফতি একদিন রাত্রে চুপ করে আরব রমণীর ছদ্মবেশে পালিয়ে গেলেন লেবাননে, আর সেখান থেকে ফরাসী কর্তৃপক্ষের চোখ এড়িয়ে পেঁছিলেন বাগদাদে।

যুদ্ধের সময় তাঁকে পাওয়া গেল বার্লিনে হিটলার আর হিমলারের সঙ্গে। আরব দুনিয়ায় তাঁর প্রতিপত্তি তখন বেশ বেড়ে চলেছে, আর ইরাক, সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনে তিনি পরে বেশ জনপ্রিয় হয়ে পড়লেন। রব উঠতে লাগল ইহুদীদের 'ইমিগ্রেশন' বন্ধ করার জন্যে। আর সেই সব আরব নেতারা, যাঁরা মুফতির সঙ্গে কোন কালেই একমত ছিলেন না, তাঁরাও বেগতিক দেখে সুরে সুর মেলালেন। দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের টনক নড়লো। আরবদের খুশি করতে গিয়ে আর্নেস্ট বেভিন্ আরেকটা ভুল করে 'ইমিগ্রেশন' বন্ধ করে শুরু করলেন 'ডিপোর্টেশন।' মিডিল-ইস্ট এক্সপার্টদের পরামর্শের উপরে নির্ভর করে মুফতিকে খোশামোদ করতে গিয়ে চটালেন ডেভিড বেনগুরিয়নকে। ট্রান্সজর্ডনে বসে আমীর আবদুল্লাও শঙ্কিত হলেন। তাঁর 'কিং অব জেরুজালেম', 'গ্রেটার সিরিয়ান এম্পায়ার' আর আরব 'ফেডারেশনের' স্বপ্ন বুঝি মাঠে মারা গেল।

জেনারেল গ্লাব পাশা আর তাঁর 'আরব-লিজন' নিয়ে আবদুল্লা তখন খুব হৈ-চৈ করছেন। আরবরা ইজরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরব লিজনের উপর ভরসা করেই ছিল। ১৯৪৬ সালে ইংলণ্ড থেকে ফিরলেন আবদুল্লা স্বাধীন হাশেমী রাজত্ব ট্রান্সজর্ডনের রাজা হয়ে। ৩৭২ মাইল রাস্তা দিয়ে ঘেরা মাত্র সাড়ে তিন লাখ লোকের বসতি ট্রান্সজর্ডনের জন্য তিনি আনলেন সঙ্গে করে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড বাৎসরিক ব্রিটিশ সাবসিডি। কিন্তু আবদুল্লার আশা অনেক বেশি। মনে মনে তৈরি করতে লাগলেন অনেক প্ল্যান। কিন্তু

ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আবদুল্লাকে জানালেন যে, তাঁরা আবদুল্লার 'গ্রেটার সিরিয়া' বা 'গ্রেটার ট্রান্সজর্ডন' কিছুই পছন্দ করেন না।

আরব-লীগের বৈঠকে আবদুল্লা দাবী জানালেন যে, ইজরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁকে সেনাপতি করা হোক। ঈজিপ্ট আর সিরিয়া ঘোর আপত্তি জানালো। যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে আরব-লীগের মধ্যে বেশ একটা ছোটখাট ঝগড়ার সৃষ্টি হলো। গ্র্যাণ্ড মুফতি অব জেরুজালেম আবার প্রায়ই আবদুল্লাকে খোঁচা দিতে থাকলেন, ফলে এই হলো যে, আবদুল্লার 'আরব-লিজন' একবার ইজরাইলের যুদ্ধে মনোযোগ দেয় তো আবার মুফতির খোঁচা ঠেকায়।

১৯৪৮ সালে ডিসেম্বর মাসে যখন প্রায় এক লাখ ছিন্নমূল আরব সিরিয়ায় এসে পৌঁছলো, তখন সিরিয়ার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ালো। ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় ক্রুদ্ধ জনতার চিৎকার, সমস্ত রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা। সিরিয়ায় যখন এই অবস্থা, তখন আবদুল্লা হঠাৎ একদিন জেরিকোতে প্যালেস হোটেলে ডেকে পাঠালেন প্যালেস্টাইনের আরব নেতাদের। নিজেকে তিনি প্যালেস্টাইন আর জেরুজালেমের রাজা বলে ঘোষণা করলেন যদিও তিনি জানতেন যে ঈজিপ্ট আর অন্যান্য আরব রাজা এর বিরুদ্ধে। আবদুল্লাকে আরব-লীগ ভয় দেখাতে লাগল যে, তাঁকে লীগ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে আর এর পর শুরু হলো নিজেদের মধ্যে নিন্দা আর গালাগালি।

আবদুল্লা ভাবলেন যে, তাঁর 'গ্রেটার সিরিয়ার' স্বপ্ন বুঝি সফল হতে চলেছে—আর তিনি এক সময় নাকি ইজরাইলের সঙ্গে সন্ধি করার পক্ষেও ছিলেন। কিন্তু ১৯৫১ সালে তিনি নিহত হন আর নতুন জর্ডন রাজ্যের গদীতে আরোহণ করেন তাঁর নাতি হুসেন।

আবদুল্লার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হলো না, কিন্তু ইহুদীদের স্বপ্ন রাজ্য 'কানান' স্থাপিত হলো। ডেভিড বেনগুরিয়ন ছিলেন নূতন 'মেসায়া'—'দি মেসায়া ইন ব্লু লাউঞ্জ স্যুট'। তেল-আভিভের কেরেন কেমথ্ স্ট্রীটের তাঁর ছোট্ট লাইব্রেরী ঘরে বসে নতুন রাজ্যের ভাগ্য নির্ণয় করতে লাগলেন। পক্ককেশ, বৃদ্ধ বেনগুরিয়ন আজ

ইজরাইলের কর্ণধার। জারের রাশিয়ায় তাঁর জন্ম। প্যালেস্টাইনে অটোমান সুলতানদের রাজত্বকালে তাঁর প্রথম শিক্ষা, আর পরে প্রায় আবদুল্লার সঙ্গেই তিনি পড়তে যান ইস্তানবুল ইউনিভার্সিটিতে। প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের হয়ে তিনি 'জুইশ-লিজনে' লড়াই করেন আর ইজরাইলের প্রথম বিদেশী মন্ত্রী মঁশে শ্যারেট তাঁরই বিরুদ্ধে টার্কীর সেনার হয়ে যুদ্ধ করেন। পরের জীবনে তিনি ইহুদীদের 'হোমল্যাণ্ডের' জন্য শুধু আরবদেরই না, ইংরেজদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেন। স্টার্ন গ্যাঙ্গের লোকেরা যখন কাউণ্ট বার্নাডোটকে হত্যা করে, বেনগুরিয়ন এই নিষ্ঠুরতার জন্য তাদের ক্ষমা করেননি।

কাউণ্ট বার্নাডোটকে ইহুদীরা বিশ্বাস করেনি। ১১ই জুন কাউণ্ট তাঁর সহকারী ডাঃ র‍্যালফ বুঞ্চকে নিয়ে রোডস দ্বীপ থেকে তাঁর কাজ শুরু করেন। আরবরাও তাঁকে খুব ভালো চোখে দেখেনি। ইহুদীরা কাউণ্টের তথাকথিত 'নাৎসী' সহানুভূতির কথা বলে বেড়াতে লাগল, আর ওদিকে আরবরা তাঁর সহকারী ডাঃ বুঞ্চকে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেণ্টের এজেণ্ট ভেবে বসলো। মজার ব্যাপার হলো এই যে, ইহুদীরা কাউণ্টকে আরবদের বন্ধু আর আরবরা ডাঃ বুঞ্চকে ইহুদীদের বন্ধু মনে করলো। জেরুজালেমকে আবদুল্লার শাসনে রাখবার প্রস্তাব প্রথমে করে কাউণ্ট মস্ত বড় এক ভুল করে বসলেন। কাউণ্ট আর বুঞ্চ দু'জনেই আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন শান্তি স্থাপন করতে, আর কাউণ্টকে তার দাম দিতে হয়েছিল নিজের রক্ত দিয়ে। ডাঃ বুঞ্চের প্রচেষ্টা পরে পুরস্কৃত হলো, আর তিনি পেলেন নোবেল প্রাইজ শান্তির জন্যে।

কিন্তু পশ্চিম এশিয়ার শান্তি এখনো অনেক দূরে। মরুপ্রান্তরে শান্তি-মরীচিকার পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শান্তিদূত হয়ে এবার ড্যাগ হ্যামারশীল্ড। শান্তিপ্রিয় স্বাধীন দেশ সুইডেনের কৃতী সন্তান ড্যাগ। তাঁর ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও তিনি ইলিয়ট, হেরমান হেস আর উলফ পড়েন আর পশ্চিম এশিয়ার শান্তির স্বপ্ন দেখেন। নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় থেকে সুইডেন নিরপেক্ষ রয়েছে আর

সুইডেনকে প্রথম মহাযুদ্ধে নিরপেক্ষ রাখেন ড্যাগের পিতা, যিনি সে সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

আজ ইজরাইল আর জর্ডন টুরিস্টদের ডাকছে। আরব জর্ডনে গিয়ে দেখতে হবে খৃষ্টানদের হোলি ল্যাণ্ড আর ইজরাইলে গিয়ে দেখতে হবে জেজার পাশার তৈরি, 'আকার'-এর মসজিদ। ১৯১৫ থেকে ১৯৪৭—মাত্র ৩২ বছর। 'হোয়াট ইজ থার্টি টু ইয়ার্স ইন দি লাইফ অব নেশন।' কিন্তু ৩২ বছরে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের গতিই বদলে গিয়েছে।

এগারো

স্কটল্যাণ্ডের সেণ্ট বসওয়েলসে সেদিন ২রা মার্চ (১৯৫৬) রাতে নিজের ঘরের এক কোণে বসে রেডিয়ো শুনছিলেন, ৬১ বছরের বৃদ্ধ পীক্ পাশা—কর্নেল ফ্রেডরিক পীক্। তাঁর তামাটে মুখের উপর চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো আর প্রায় ২৬ বছর আগেকার একটা ঘটনার কথা তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

জীবনের শেষ ক'টা দিন ৯৫০ জন লোকের বসতি ছোট গ্রাম বসওয়েলে কর্নেল পীকের বেশ কেটে যাচ্ছিল। রেডিয়োর খবরটা শুনে তিনি একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

বি. বি. সি-র সংবাদ ঘোষক শান্ত কণ্ঠে খবরটা পড়ে গেলেন, "এ রয়াল ডিক্রি ওয়াজ ইশুড অ্যাট আম্মান (জর্ডন) টুডে টারমিনেটিং দি সারভিসেস অব ব্রিটেনস জেনারেল জন গ্লাব অ্যাজ চীফ অব দি জেনারেল স্টাফ অব দি আরব লিজন"।

১৯৩০ সালের আরেকদিনের কথা মনে পড়লো কর্নেল পীকের। সেদিন তিনি ৩২ বৎসরের সুপুরুষ যুবক লেফ্‌টনেণ্ট জন ব্যাগট গ্লাবকে নিজের আপিসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। গ্লাবকে হুকুম দিলেন বেদুইনদের নিয়ে তৈরি করতে একটা ছোট 'ডেজার্ট পেট্রোল'। স্যালুট করে চলে গেলেন জন গ্লাব আর প্রশংসা-ভরা

দৃষ্টি নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন কর্নেল পীক্। ছাব্বিশ বছর পরে তাঁর সেই 'প্রটেজী'র বরখাস্তের খবর শুনে চঞ্চল হয়ে পড়বারই কথা কর্নেল পীকের।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ঘরে ঢোকে খবরের কাগজের রিপোর্টারদের এক ঝাঁক। কর্নেল পীক্ বললেন, "এতদূর থেকে আমি কি-ই বা মন্তব্য করবো? ১৯৩৯ সালে যখন আমি আরব লিজন ছেড়ে আসি, গ্লাব তখন আমার কাছ থেকে 'টেক ওভার' করে। আমাদের সময় অনেকদিন পর্যন্ত আমরা দু'জনই মাত্র ব্রিটিশ অফিসার ছিলাম। পরে অবশ্য কিছু কিছু আরো জুনিয়ার লেফ্‌টনেণ্ট আসে। বেদুইনদের পেট্রোল তৈরি করার পর জন আমার সেকণ্ড-ইন-কমাণ্ড হয়।

আজ থেকে ৩৬ বছর আগে কর্নেল পীক্ নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন দুর্ধর্ষ আরব লিজন ১৯২০ সালে। তখন কতই বা তাঁর বয়েস—২৩।২৪ আর কি। লরেন্স অব আরেবিয়ার বন্ধু তিনি। তাঁর সঙ্গে মরুপ্রান্তরে অনেক লড়াই করেছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। যখন ট্রান্সজর্ডনের ম্যাণ্ডেট ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট নিজের হাতে তুলে নেন কর্নেল পীক্ হলেন তার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। ইরাক থেকে হাইফা পর্যন্ত বিস্তৃত মরুভূমির বুকের ওপর পাতা তেলের পাইপ লাইন আর বর্ডার রক্ষা করতো কর্নেল পীকের আরব লিজন।

সে সব অনেকদিনের কথা। ১৯৪৮ সালে ইজরাইল-আরব যুদ্ধে লিজন কমাণ্ড করলেন জেনারেল জন গ্লাব। হোলি সিটি জেরুজালেম পড়লো আরবদের ভাগ্যে, আর জর্ডনের গ্রীক অর্থোডক্স শ্রেণীর লোকেরা ডিসেম্বর ১৯৫৬ সালে গ্লাবকে বিভূষিত করলো 'গ্র্যাণ্ড অর্ডার অব দি লাইটস অব দি হোলি শিপালচার' উপাধি দিয়ে 'ফর হিজ কারেণ্ট সার্ভিসেস ইন রেস্টোরিং পীস টু দি হোলি ল্যাণ্ড'। রাজা হুসেনের প্রিয়পাত্র জেনারেল জন গ্লাব। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল আরব লিজন, যার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট দিতেন ৯০ লক্ষ পাউণ্ড 'সাবসিডি' বছরে।

গ্লাবকে ডিসমিস করলেন রাজা হুসেন। আম্মানের রাস্তায় রাস্তায় লোকেরা করলো রাজার জয়ধ্বনি আর বিলাতের খবরের

কাগজওয়ালারা গেল ক্ষেপে। প্রধানমন্ত্রী ইডেন তলব করলেন মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠক আর পার্লামেন্টে দীর্ঘ বক্তৃতায় জর্ডনের অকৃতজ্ঞতার নিন্দা করলেন। দু'দিন পরে গ্লাব এসে পৌঁছলেন লণ্ডনে আর দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট থেকে ঘোষণা হলো "হার ম্যাজেস্টি দি কুইন ইজ প্লিজড টু অ্যাপয়েন্ট লেঃ জেনারেল জন গ্লাব অ্যাজ নাইট কমাণ্ডার অব দি বাথ"। কিছুদিন পরে তিনি আবার হলেন স্যার জন গ্লাব।

লাঞ্চ খেতে গিয়ে লণ্ডনের এক বিখ্যাত হোটেলে স্যার জন নিন্দা করলেন ব্রিটেনের পশ্চিম এশিয়ার নীতিকে। "Ideas were more powerful than weapons. The world is being stolen from us by ideas."

গ্লাব পাশার বরখাস্তে পশ্চিম এশিয়ার ব্রিটিশ সম্মানে ভীষণ ধাক্কা লাগল। পাশাও গেলেন আর তার সঙ্গে গেলেন আরব লিজনের ইন্টেলিজেন্স-এর বড়কর্তা কর্নেল কম্বিল প্যাট্রিক আর তিনজন জর্ডন অফিসার—কর্নেল সালিম কারদশেষ, মেজর ইমিল জুমিয়ান আর মেজর আবদুল করিম সাহেন্। আর গ্লাবের ডিসমিসাল এমন সময় হলো যখন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব সেলউইন লয়েড মিডিল-ইস্ট আসছিলেন বাগদাদ প্যাক্ট বিক্রি করতে। পাশার বরখাস্তের খবর যখন পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে লয়েড তখন দিল্লীতে বাগদাদ প্যাক্টের গুণগান করে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। লয়েড সাহেব বোধ হয় বড়ই অপয়া। যেখানেই যান বা যাবার সিদ্ধান্ত করেন, কিছু না কিছু গোলমাল হয়ই। বহেরিনে গিয়েছিলেন সেখানেও মারামারি, ধরপাকড় টিয়ার গ্যাস, ফায়ারিং সব করিয়ে এসেছেন।

আম্মানের রাস্তায় রাস্তায় যখন বাগদাদ প্যাক্টের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ জনতার রব উঠলো, রাজা হুসেনের টনক নড়লো। পর পর চারটে গভর্নমেণ্ট বদলে গেল একমাসের মধ্যে। ১৪ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী সইদ-এল-মুফতির গভর্নমেণ্ট ইস্তফা দিয়ে জান্ বাঁচালো। এলেন হাজার মাহালী, কিন্তু থাকলেন তিন দিন। ১৬ দিনের 'উজীরি' করলেন ইব্রাহিম হাশেম আর তারপর এলেন সামী

রিফাই। জেনারেল গ্লাব পাশাকে মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠকে ডাকা হলো ১লা মার্চ। সাত ঘণ্টার জরুরী বৈঠকে তলব করা হলো রয়াল ক্যাবিনেটের চীফ্ বহাজেৎ তালজুনিকে। রাজা হুসেন নিজে গেলেন দু'বার প্রধানমন্ত্রীর কাছে। ব্রিটিশ রাজদূত ডিউক সাহেব প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার জানালেন দু'বার, কিন্তু হলো না কিছুই। গ্লাব পাশাকে যেতে হলো 'হোয়াইল দি গোয়িং ওয়াজ গুড'। গ্লাবের সেকণ্ড-ইন-কমাণ্ড ব্রিগেডিয়ার রাদি ইনাব হলেন আরব লিজনের প্রধান। এরোড্রোমে গ্লাবকে বিদায় জানালেন বহাজেৎ তালজুনি। ক্রুদ্ধ জনতার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে চলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে গেল ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজম-এর শেষ প্রতীক জর্ডনের ভূমি থেকে। যুবক রাজা হুসেন জনতার জয়ধ্বনি শুনে প্রফুল্ল হলেন। জনতাকে বললেন, "আজকের দিন পবিত্র দিন। আল্লার দয়ায় আমরা কৃতকার্য হয়েছি। আল্লা আমাদের হারানো সব অধিকার এবার ফিরে পাইয়ে দেবেন"।

আরব ইতিহাসের পাতা আর একবার পাল্টে গেল। অল্ কাহিরাতে কর্নেল নাসের ভাবলেন 'মারহওয়া'। ১৯৬৯ পর্যন্ত মেয়াদী অ্যাংলো-জর্ডন ট্রীটির ভবিষ্যৎ ঝুলতে লাগল সুতোর আগায়। জেনারেল টেম্পলারের জর্ডনকে বাগদাদ প্যাক্টে আনবার রঙীন স্বপ্ন ছারখার হয়ে গেল। কিন্তু আম্মানে আর মাফ্রাকে রয়াল এয়ারফোর্সের ঘাঁটি আর মান (Maan) আর আকাবার ব্রিটিশ সৈন্যদের কি হবে আর ১২০ লক্ষ পাউণ্ড সাবসিডির বা কি হবে! আরেকটা পাতা উল্টে ইতিহাসই দেবে তার উত্তর।*

'বিগ পাওয়ারস'দের শক্তির জাতাকলে পড়ে জর্ডন আজ বাঁচবার চেষ্টা করছে। হোটেলে, ক্লাবে, আর কাফেতে জর্ডনের লোকে অল্ কাহিরা রেডিয়োর কর্নেল নাসেরের বক্তৃতা শোনে আর আরব একতার স্বপ্ন দেখে। ভবিষ্যতের কোলে কি আছে কেউ জানে না, কিন্তু রাজা হুসেনের হাতে ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্ভর করছে। লাজুক, ছোটখাটো, রাজা হুসেন। অনেকদিনের

* অ্যাংলো-জর্ডন ট্রীটি পরে নাচক হয়ে যায়।

শখ নিজের প্লেনে আম্মান থেকে লণ্ডন যাবেন আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবেন এবং আম্মান থেকে বাগদাদ পর্যন্ত মোটর রেস করাবেন। বালক-সুলভ এইসব পরিকল্পনা এখন তাকে তুলে রাখতে হয়েছে। নিজের দাদুর রাজনৈতিক কুশলতার কিছু অংশ তিনিও পেয়েছেন আর তাই সিরিয়া, লেবানন আর ইজিপ্ট তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করছে। আবার ভয় হয় হুসেন তো দ্বিতীয় ফারুক হবেন না? সে-ক্ষেত্রে দ্বিতীয় নাসের কে হবে? লেঃ কর্নেল অলী নূয়র তো নয়? মাত্র ৩৪ বছর বয়েসে অলী হন চীফ্ অব স্টাফ্। গ্লাব পাশার বরখাস্তের ব্যাপারে তার হাত কিছু কম ছিল না। নির্ভীক এই আর্মি অফিসারটিকে গ্লাব পাশা কোনদিনই পছন্দ করেননি আর তাই নূয়রকে পাঠানো হয়েছিল প্যারিসে মিলিটারী অ্যাটাশে রূপে। কিছুদিন পরেই নূয়র ফিরে আসেন আম্মানে রাজার এইড-ডি-ক্যাম্প হয়ে। জর্ডনের আর্মিতে তাঁর প্রতিপত্তি প্রচুর। আরব লিজনের কমাণ্ডার-ইন-চীফ্ জেনারেল রাদি ইনাবের বয়েস হয়েছে, কিছুদিন পরেই অবকাশ গ্রহণ করবেন। তারপর? নূয়র? ফার্স্ট ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার আলী হায়ারী?

পাশ্চাত্য-প্রীতি হুসেনের ছিল এবং আছে। লক্ষ লক্ষ আরব ছিন্নমূল রয়েছে জর্ডনের সীমান্তে আর ইজরাইলকে আক্রমণ করার বাসনা নিয়ে আরব-লিজন হয়েছে চঞ্চল। এইসব মিলিয়ে যদি একটা নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয় হুসেনের সিংহাসন টলমল হতে বেশি দেরি হবে না। বাগদাদ প্যাক্টের বাইরে সৌদী আরেবিয়া ছাড়া এক জর্ডনেই এখন 'রাজা' রয়েছেন। জর্ডনের সিংহাসন গেলে সিরিয়া, আর সৌদী আরেবিয়ার আশা বেড়ে যাবে। কিন্তু জর্ডনের উপর বিপদ এলে হুসেনের খুড়তুতো ভাই ইরাকের রাজা ফইজাল কি চুপ করে বসে থাকবেন? নূয়র কি নতুন নাসের হবেন? এইসব মিলিয়ে জর্ডনকে মনে হয় একটা বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন।*

নূতন আর পুরাতনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে লেবানন।

---

* কিছুদিন আগে জর্ডনের রাজনীতিতে তোলপাড় হয়ে গিয়েছে। নূয়র হিয়ার আরো অনেকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন সিরিয়ায়। হুসেনের ওয়াশিংটন প্রীতি একটু বেড়েছে।

লেবাননের গিরিপথ দিয়ে এসেছে বছরের পর বছর আক্রমণকারীর দল। ইংরাজ লেথক ফারগুসন আধুনিক লেবাননকে 'নতুন আর পুরাতনের মধ্যে এক সেতু' বলে বর্ণনা করেছেন। আরকেলজিস্টরা বলেন যে, খৃষ্টের ৩০০০ বছর পূর্বে ব্যাবিলস নামে একটা গ্রাম, বেরুট থেকে ২০ মাইল দূরে জেবহল-এর কাছে ছিল। রমণীয় রাজধানী বেরুট, আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, মুসলমান আর খ্রীষ্টানদের সৌহার্দ্য, আর নতুন আর পুরাতনের 'ককৃটেল', লেবাননকে পশ্চিম এশিয়ার অন্য আরব দেশ থেকে অনেক আলাদা মনে হয়। হঠাৎ বেরুটকে দেখলে বোঝাই দায় যে, লেবানন আরব রাষ্ট্র। বহুদিন ফরাসীরা লেবাননের ওপর রাজত্ব করে গিয়েছে তাই আজও লেবাননের উপর স্পষ্ট ফরাসী ছাপ পাওয়া যাবে। লেবাননের রাজনীতির ধারাও অন্য আরব রাষ্ট্র থেকে আলাদা। আরব আর খ্রীষ্টানদের জনসংখ্যা প্রায় সমানই। লেবাননের প্রেসিডেন্ট খ্রীষ্টান আর প্রধানমন্ত্রী একজন সুন্নী আরব।

টুরিস্টদের প্যারাডাইস লেবানন, তাই আবার কেউ কেউ লেবাননকে 'সুইজারল্যাণ্ড অব দি ওরিয়েন্ট' বলেন। বেরুট থেকে দামাস্কাসের পথে মোটরের যাত্রা সত্যিই অপূর্ব। বেরুট তো প্রায় 'ইন্টারন্যাশনাল' সিটি আর সেইজন্যেই বোধহয় বেরুটে যত বিদেশীদের একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় মিডিল-ইস্টে অন্য কোন দেশে তা পাওয়া যায় না। ইন্টারন্যাশনাল সিটি হওয়ার দুর্ভোগও আছে আর তাই লেবাননের হোটেল, কাফে আর বার ইন্টারন্যাশনাল ডিপ্লোমেসী, এস্পায়ওনেজ (Espionage) আর অ্যাডভেঞ্চারের হ্যাপি হান্টিং গ্রাউণ্ড।

ইউনাইটেড নেশন-এর রিসলিউশনের দৌলতে 'ডেজার্ট কিংডম' লিবিয়ার জন্ম ১৯৫১ সালে। তার আগে লিবিয়ার অস্তিত্ব ছিল শুধু জার্মান, ইটালিয়ান, আর ব্রিটিশদের কাছে আর তারও আগে ফোনেশিয়ান্স (Phoenicians), গ্রীক, রোমান, আরব আর তুর্কদের কাছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মণ্টগোমারীর এইট্থ আর্মি তাড়ায় ইটালিয়ান আর জার্মানদের। ১৯৫১ সালে স্বাধীনতা পেলেও লিবিয়া আজও ব্রিটিশ আর আমেরিকান গভর্নমেন্টের দয়ায় বেঁচে আছে। ইজিপ্ট আর টুনিসিয়া,

মরোক্কো আর আলজেরিয়ার মধ্যে 'স্যাণ্ডউইচ'- হয়ে রয়েছে লিবিয়া। রাজধানী ট্রিপোলীর ঠিক মাঝখানে ওড়ে সোভিয়েট রাশিয়ার ফ্ল্যাগ, রাশিয়ান এম্ব্যাসীর উপর—উত্তর আফ্রিকায় 'হাতুড়ী আর কাস্তে'-র প্রথম পদার্পণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে।

প্রায় সাত লাখ বর্গমাইল-এর মধ্যে শুধু ১০০০ মাইলেই লিবিয়ার যা কিছু সব। গ্রীকো-রোমান শহর সাইরেন, ট্রিপোলী, টোব্রুক, সব মনে করিয়ে দেয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথা। টোব্রুকের কাছে 'ডেথ ইস্ এ লেভেলার' কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পর পর সাজানো রয়েছে ব্রিটিশ আর জার্মান সৈন্যদের কবর।

আর ফিল্ড মার্শাল রোমেল? লিবিয়ার লোকেরা প্রায় তাকে ভুলতে বসেছে কিন্তু ব্রিটিশ 'ওয়ার' আপিস তাঁকে এখনও ভুলতে পারেনি। টোব্রুক, এল-আলামিন আর বেনগাজীর লড়াই রোমেলের কথা মনে করিয়ে দেয়। মিডিল ইস্টে এখনও অনেক ইংরেজ মা বাচ্চাকে ঘুম পাড়ানোর সময় 'লালেবী' শোনায় 'স্লিপ বেবী স্লিপ, রোমেল উইল কাম'। রোমেলের মারা যাওয়ার খবর শুনে এক ব্রিটিশ কর্নেল নাকি রেগে বলে উঠেছিলেন, 'দিস্ ইজ নো টাইম ফর জোক্'।

ধীরে ধীরে শামুকের গতিতে এগিয়ে চলেছে লিবিয়া প্রগতির পথে। ১৯৫১ সালে যখন স্বাধীন হয় শুধু ৫ জন গ্রাজুয়েট ছিল লিবিয়াতে। আজ বেনগাজীতে ৩২ জন ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। প্রথম শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু বুড়ো আঙুলের ছাপ মেরে দু'বছর কাজ চালান। এখনও ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে গাধার পিঠে করে স্কুলে যেতে দেখা যায়।

কিন্তু ট্রিপোলীর লোকেরা টেলিভিশন দেখেছে। হুইলাস্-এর আমেরিকান এয়ারবেস থেকে টি. ভি. প্রোগ্রাম প্রসারিত হয় আর লিবিয়ানরা 'আই লাভ লুসী' গান শুনে হাততালি দেয়।

ব্রিটিশ, আমেরিকান আর রাশিয়ান—সবাই নজর রেখেছে লিবিয়ার উপর কিন্তু যতদিন পর্যন্ত ৬৮ বছরের বৃদ্ধ রাজা ইদ্রিস বেঁচে আছেন তিনি ব্রিটিশদেরই আমল দেবেন। পুরনো বন্ধু ব্রিটিশরা, যাদের দয়ায় তিনি নিজের হৃত সিংহাসন ফিরে পেয়েছেন।

প্রশ্ন কিন্তু আবার ওঠে ইদ্রিসের পরে কি হবে? ইদ্রিস নিঃসন্তান। কিছুদিন হলো তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন ইজিপ্টের ফতিমাকে। কিন্তু ফতিমাও তাঁকে নিরাশ করেছেন। ইদ্রিসের ভাইপো সিদ্দিক-অল ফিদা আছেন কিন্তু অন্য এক ভাইপো তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ও পরামর্শদাতা ইব্রাহিম আহমদ আল সাহলীকে হত্যা করায়, ইদ্রিস সব আত্মীয়দের ওপর খাপ্পা হয়ে আছেন।

সবচেয়ে ছোট আরব দেশ ইমন। রাজধানী সানার লোকসংখ্যা মোটে ৩০০০০। পঁচাত্তর হাজার বর্গমাইলের রাজ্যের ৫ লাখ লোকের ভাগ্য নির্ণয় করেন ইমনের ইমাম। কফি, চামড়া বেচে আর অন্য দেশের দয়ার ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে ছোট ইমন। রাজধানী সানার চারদিকে ঘেরা পাঁচিল। তার মাঝে ৪০টা মসজিদ। শেবা-র রানীর রাজ্যের প্রধান শহর ছিল সানা—'লিজেণ্ড' তাই বলে। কুইন অব শেবা গিয়েছিলেন রাজা সলোমনের কাছে—সেটা বাইবেল বলে। আজও উটের 'কাফিলা' নিয়ে ইমনের বণিকেরা সানা থেকে হাদিদায় যায়।

লরেন্সের 'সেভেন পিলারস অব উইসডম'-এর সব থামের চুন বালি খসে পড়েছে আর নতুন থাম আজ সে জায়গায় তৈরি হচ্ছে—নতুন জর্ডন, নতুন সিরিয়া, নতুন ইরাক, নতুন ইরান, নতুন ইজিপ্ট, নতুন টার্কী আর নতুন সৌদী আরেবিয়া'।

বারো

"পার্লেভূ ফ্রাঁসে মঁসিয়ে?"

"নো ফ্রাঁসে।"

"উঁহু।"

"নো ফ্রাঁসে। আই নো ইংলিশ।"

ক্যাসিয়ান হোটেলের পোর্টারের ফ্রেঞ্চের তুবড়ির মুখে আমার সিরিয়ার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। রকেটের মতো ছুটো লোমশ হাত দিয়ে বত্রিশ পাটি দাঁতের একজিবিশন দেখিয়ে এক লহমায় আমার সুটকেশ আর টাইপরাইটারটা উঠিয়ে, পোর্টার আবদুল তিন লাফে ত্রিশটা সিঁড়ি পেরিয়ে উপরে গিয়ে উঠলো আর হাসতে হাসতে হোটেলের প্রোপ্রাইটার মিস্টার খাব্বাজ এগিয়ে এলেন আমায় অভ্যর্থনা জানাতে।

"ওয়েলকাম্ টু দি মোস্ট এন্‌শিয়েন্ট সিটি অব্ দি ওয়ার্লড, দামাস্কাস।" হাত বাড়িয়ে দেন সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ মিস্টার খাব্বাজ। পোর্টার আবদুল দৌড়ে এসে তার মালিককে হাত পা নেড়ে হাসতে হাসতে জানায় যে, আমি এক অদ্ভুত মানুষ, কারণ "মঁসিয়ে নো ফ্রঁাসে"। আমি ফ্রেঞ্চ জানি না বা বলতে পারি না।

খাব্বাজ সাহেব আমায় বুঝিয়ে বললেন যে, তাঁর পোর্টার আবদুলের ধারণা দুনিয়ার সবাই ফরাসী আর আরবী জানে। জ্ঞান হবার পর থেকে সে সিরিয়ায় ফরাসী রাজত্বই দেখেছে তাই তার পক্ষে এ ধারণা হওয়া কিছু অস্বাভাবিক না।

"হোয়েন দি ফ্রেঞ্চ লেফ্‌ট দিস্ কান্ট্রি" খাব্বাজ সাহেব রসিকতা করে ওঠেন, "দে লেফ্‌ট বিহাইণ্ড দেম দি ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ, থাউজেণ্ডস অব্ শ্যাম্পেন বটলস্ অ্যাণ্ড ডজেন্স অব্ গার্লস ইন দি ব্রথেলস্।" যাওয়ার সময় ফরাসী কর্তারা নিজেদের ভাষা, এন্তার শ্যাম্পেন বোতল, আর একরাশ মেয়ে সিরিয়ার পতিতালয়গুলিতে ছেড়ে যান।

আমি বললাম যে, আমাদের দেশ ছেড়ে যখন ইংরেজ প্রভুরা চলে যান তাঁরা তখন ভারতীয়দের জন্য রেখে যান ক্রিকেট ব্যাট, ব্যালট বক্স আর জয়েন্ট স্টক কোম্পানী। তুলনা শুনে খাব্বাজ সাহেব ভীষণ খুশি। চেঁচিয়ে নিজের স্ত্রী-পুত্রদের ডাকেন। তাঁর চিৎকারের আগেই হাসি শুনে সবাই এসে উপস্থিত। পরিচয় হলো সবার সঙ্গে। তাঁর স্ত্রী স্যালীর সঙ্গে—"মাই সুইটহার্ট ইভেন অ্যাট ফিফটী ফোর", ছেলে টোনী, কন্যা নোর্মা আর পুত্রবধূ—কেরী। খাব্বাজ সাহেবের মতে এঁরা সব তাঁর হোটেলের 'বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট'।

ক্লান্ত শরীর নিয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে পৌঁছেছিলাম ক্যাসিয়ান হোটেলে। খাব্বাজ-দম্পতীর আদর-আপ্যায়নে আর কিছু কড়া হুইস্কীর দৌলতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানতেই পারিনি। ঘুম যখন ভাঙলো তখন দেখি, চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে পোর্টার আবদুল। আমায় উঠতে দেখেই আবার তার বত্রিশ পাটি দাঁত বার করা হাসি —"বঁ জুর মঁসিয়ে—পার্দন, পার্দন, গুট মর্নিং, গুট মর্নিং।"

ঝাড়া কয়েক ঘণ্টা ঘুমের পর শরীর আর মেজাজটা ভালোই ছিল কিন্তু মাঝে মাঝে হাঁটুর ব্যথাটা চাড়া দিয়ে উঠে সেই ভয়াবহ এ্যাক্সিডেণ্টের কথাটাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল। তু'মিনিটের মধ্যে কি যে হলো কিছুই বুঝতে পারিনি। যখন বুঝতে পারলাম তখন দামাস্কাসের হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি। তিনদিন পরে যখন ছাড়া পেলাম হাসপাতাল থেকে, তখন সিরিয়ায় থাকার আমার মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ট্রান্সিট্ ভিসার দয়ায় মোট তিনদিন আরো থাকতে পারি।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে ট্যাক্সিতে চড়ে, আধ ঘণ্টাটেক এখানে ওখানে ফালতু ঘুরে পৌঁছেছিলাম খাব্বাজ সাহেবের ক্যাসিয়ান হোটেলে। আমার এই অবস্থার জন্যে কাকে যে দায়ী করবো ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। রাগ হচ্ছিল সুরিন্দর চোপরার উপর। ইস্তানবুলে ইণ্ডিয়ান এম্ব্যাসীর প্রেসঅ্যাটাশে সুরিন্দর চোপরা। 'বাই রোড' সিরিয়া যাবার এমন 'রোড'ই তিনি দেখালেন যে, প্রায় পরপারেই পৌঁছে গিয়েছিলাম।

ইচ্ছে ছিল ফেরার পথে সোজা সিরিয়ান ডেজার্ট পার হয়ে বাগদাদ যাবো কিন্তু চোপরা সাহেব এমন শর্ট কাট রুট বাতলে দিলেন যে, চিরদিন মনে থাকবে। চোপরাকে কোনদিন হয়তো ভুলে যাবো কিন্তু যখনই হাঁটুতে ব্যথা পাই তাঁর কথা ভালোভাবেই মনে পড়ে।

চোপরাকে গিয়ে বললাম সিরিয়া যাবার 'বাই রোড' রাস্তাটা আমায় জানাতে। অনেকদিন কাটিয়েছে টার্কীতে সুতরাং সব তার নখদর্পণে। এম্ব্যাসীর 'ফ্রেণ্ড ফিলসফার, গাইড' বে নিয়াজীকে ডেকে পাঠালেন চোপরা সাহেব। খানিকক্ষণ তু'জনে

মিলে তুর্কীতে ডুবড়ি ফোটালেন। তারপর আমায় বোঝালেন, 'বাই রোড' সিরিয়া যাবার রাস্তা অতি সহজ। বেলা এগারোটার ট্রেন ধরলে বিকেলের মধ্যে পৌঁছে যাবো তুর্কীর সীমানায় ইস্কন্দরু স্টেশনে। ইস্কন্দরু থেকে বাস ধরে ৮ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবো সিরিয়ার দামাস্কাসে। এক মিনিটের মধ্যে ম্যাপ এঁকে স্বুরিন্দর চোপরা সব জলের মতো পরিষ্কার করে দিলেন।

বেশ খুশি মনে এম্ব্যাসীর এক অর্ডালির সঙ্গে গেলাম হাইদারপাশা স্টেশনে (ইস্তানবুলের স্টেশনের নাম হাইদারপাশা। হাইদারপাশা থেকে স্টীমারে করে যেতে হয় ইস্তানবুল শহরে)। মারামারি ধ্বস্তাধ্বস্তি করে টিকিট কিনে আনলো এম্ব্যাসীর অর্ডালি ইমরান বে। দুম্‌দাম্ করে চলন্ত গাড়িতে আমার সুটকেস আর টাইপরাইটারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমায় প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে কামরায় ঢুকিয়ে দিয়েই ইমরান বে গায়েব। ইমরান বে তো গায়েব হলেন কিন্তু কামরার মধ্যে ভিড় দেখে আমারও প্রায় হুঁশ গায়েব হবার দশা। ভাবলাম, যাক্‌গে, বিকেলেই তো পৌঁছে যাবো, দাঁড়িয়েই মেরে দেবো রাস্তাটুকু। ছোট ছ'জন বসার কামরায় প্রায় দশজন লোক ঠেসে বসে আছে। এক স্থূলকায়া বৃদ্ধা সেই গরমের মধ্যে ঘেমে নেয়ে একাকার। একটা বিরাট থলেতে আপেল ভরতি আর তাই সামলাতেই বুড়ীর প্রাণান্ত। হঠাৎ ঝিমানো অবস্থায় থলিটা বেসামাল হওয়ায় আপেলগুলো মেঝেতে গড়িয়ে পড়তেই কামরাশুদ্ধ লোক হো হো করে হেসে ওঠে। ধড়মড় করে জেগে উঠে বুড়ী তাঁর আপেলের অবস্থা দেখে হৈ হৈ রৈ রৈ শুরু করে দিলো। জায়গাটা খোয়াবার ভয়ে উঠতেও পারছে না আর তার চোখের সামনে শখের আপেলগুলো কামরার মেঝের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। আপেলগুলো তুলে দেবার উৎসাহ কারুর নেই কারণ সবারই ভয়, উঠলেই জায়গাটা অন্য কেউ হয় দখল করে নেবে, নয় পাশের যাত্রীটি নিজের স্থানের পরিধিটা একটু বাড়িয়ে নেবে। সিচুয়েশনটা দেখবার মতো। চলন্ত ট্রেনের ঝাঁকুনিতে আপেলগুলো গড়গড় করে একবার মেঝের ওদিকে

আরেকবার অন্যদিকে চলে যাচ্ছে আর বুড়ী হায় হায় করে 'এল্মা', 'এল্মা' (তুর্কীতে আপেলের নাম এল্মা) বলে চেঁচাচ্ছে, আর বাকী যাত্রীরা হো হো করে সমানে হেসে যাচ্ছে।

মিনিট পাঁচেক ধরে আপেলের গড়াগড়ি বুড়ীর হায় হায় আর যাত্রীদের হো হো হাসি চললো। হঠাৎ বাক্সের কোণায় ধাক্কা খেয়ে একটা বেশ বড় গোছের আপেল থেঁতলে গেল। বুড়ীর চোখ দুটো এবার সজল হয়ে উঠলো আর কাঁদো কাঁদো মুখে সে আমার দিকে চেয়ে রইল। উপরের বাক্সের চেনটা ধরে দাঁড়িয়ে চলন্ত গাড়ির টাল সামলাচ্ছিলাম আর ভরসা ছিল ওমনিভাবেই কাটিয়ে দেবো রাস্তাটা। চেনটা ছাড়লেই অন্য কেউ জায়গাটা দখল করে নেবে, কিন্তু বুড়ীর কাতর চাউনি, যা একবার আমার দিকে আর একবার থেঁতলা আপেলটার দিকে যাচ্ছিল, একটু বিচলিত করে দিলো। চেনের মায়া ত্যাগ করে হঠাৎ নিচু হয়ে বসে আপেলগুলোর গড়াগড়ি বন্ধ করার চেষ্টা করলাম। অনেক কষ্টে সবক'টাকে তুলে বুড়ীর হাতে দিলাম। ছলছল চোখে থেঁতলা আপেলটার দিকে একবার চেয়ে জানলা দিয়ে বুড়ী সেটাকে ফেলে দিলো। কৃতজ্ঞতায় বুড়ীর মুখ দিয়ে শুধু একটা কথাই বেরোয়—'তশক্কুর, তশক্কুর' (ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ)। কামরার মধ্যে এবার একটু মৃদু গুঞ্জন শুনতে পাই। হাসির ফোয়ারা আর নেই। অন্যান্য যাত্রীরা লজ্জা পেয়েছে কিনা বলতে পারলাম না, কিন্তু বেশ বুঝতে পারলাম, সবারই মনে একটু 'কেমন কেমন' ভাব দেখা দিয়েছে। একটা বিশ্রী নিস্তব্ধতা কামরার মধ্যে ঘোরাফিরা করছে আর সেই চাপা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শুধু শোনা যাচ্ছে ট্রেনের চাকার ঘট্-ঘট্-ঘটাং— ঘট্-ঘট্-ঘটাং।

সাহস দেখিয়ে নিস্তব্ধতাটাকে ভঙ্গ করলো বাঁদিকের সীটে বসা একটি তরুণী। এতক্ষণ নজরটা সেদিকে যায়নি, হঠাৎ তার গলার আওয়াজ শুনে দেখতে পেলাম। চোখাচোখি হওয়াতেই মেয়েটি আবার বলে উঠলো, "চোক্ স্‌চক, চোক্ স্‌চক" (ভীষণ গরম, ভীষণ গরম)।

"ইয়েভেৎ, চোক্ স্‌চক"।

"এফান্নাম, চোক্ সুচক"।

এবার বাকী যাত্রীরা মাথা নেড়ে সায় দেয় 'হ্যাঁ, ভীষণ গরম'। এক মিনিটের মধ্যে কামরার ভিতরের আবহাওয়াটা সহজ হয়ে ওঠে আর বুড়ীর পাশে বসা একটি যুবক আমার হাত ধরে টেনে নিজের জায়গার অর্ধেক ছেড়ে দিলো। 'তশক্কুর আদারাম' (আপনাকে ধন্যবাদ) বলে বসলাম। খানিকক্ষণ আবার সবাই চুপচাপ। ট্রেনের গতিও কমে আসে আর বুড়ী হাসিমুখে পরের স্টেশনে নামবার জন্যে তৈরি হয়। গাড়ি স্টেশনে এসে দাঁড়ালো আর বুড়ী নিজের আপেলের থলিটা বুকে জড়িয়ে নেমে গেল। জানলা দিয়ে দেখতে লাগলাম, বুড়ী প্ল্যাটফর্মের এদিক ওদিক দেখছে। হঠাৎ কোথা থেকে ছ'ফুট লম্বা একটা ছেলে এসে বুড়ীকে প্রায় কোলে তুলে নিলো। বুড়ী একবার ছেলের চেহারার দিকে দেখে আর একবার তার গালে হাত বোলায়। অনেকক্ষণ ধরে মা-ছেলের পুনর্মিলনের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। বুড়ীর হঠাৎ কি মনে পড়ায় থলির ভেতর থেকে দুটো আপেল ছেলের হাতে গুঁজে দিলো আর থলিটার মুখ ফাঁক করে বাকি আপেলগুলো ছেলেটাকে দেখাতে লাগল। আবার বুড়ীর যেন কিছু মনে পড়লো আর কামরার জানলায় আমার দিকে তার নজর গেল। খানিকক্ষণ ছেলেকে হাত পা নেড়ে কেঁদে চেঁচিয়ে কি বোঝালো। আর থলি থেকে আরো দুটো আপেল ছেলের হাতে তুলে দিলো।

ছেলেটা এবার আপেল দুটো নিয়ে আমার কামরার জানলার কাছে দাঁড়ালো। দূর থেকে বুড়ী ইশারা করে আমায় দেখালো আর ছেলেটা আপেল দুটো আমার হাতের কাছে ধরলো। যতই না বলি ততই ছেলেটা তর্ক করে আর বুড়ী দূর থেকে মাথা নেড়ে নেড়ে আমায় নিতে বলে। হঠাৎ হুস্ করে ট্রেনটা ছেড়ে দেয় আর ছেলেটা কি করবে বুঝতে না পেরে আপেল দুটো ছুঁড়ে কামরার মধ্যে ফেলে দেয়। ছেলের কাণ্ড দেখে বুড়ীর সে কি হাসি। ছোট্ট শিশুর মতো হাততালি দিচ্ছে আর হেসে গড়িয়ে পড়ছে। ট্রেন চলতে শুরু করেছে, আপেলটা তুলে নিয়ে জানলা দিয়ে হাত বার করে বুড়ীকে বিদায় জানাচ্ছি, হঠাৎ কি খেয়াল হলো জানলার বাইরে মুখটা বার করে বুড়ীকে দেখিয়ে আপেলে এক কামড়

বসালাম। বুড়ী ঝাঁকি দিয়ে নিজের ছেলেকে সজাগ করে আমার দিকে দেখালো আর মা-ছেলে থলি থেকে আরো ছুটো আপেল বের করে আমায় দেখিয়ে তাতে কামড় বসালো।

এবার কামরার লোকের হাসবার পালা। কখন দেখি বাঁ পাশের সীটে বসা তরুণীটিও আমার পাশে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে মুখ বার করে হাসছে। তার রেশমী চুল আমার মুখের উপর এসে পড়াতে হাত দিয়ে সরাতেই মেয়েটি লজ্জা পেয়ে গেল। মুখখানি একটু লাল হয়ে উঠলো—অনেকটা আপেলটারই রঙের মতো। অন্য আপেলটা ওর হাতেই তুলে দিলাম। 'তশক্কুর আদারাম' বলে আমার পাশে এসে মেয়েটি এবার বসলো। 'চোক্ সুচক, চোক্ সুচক'—আমার অদ্ভুত তুর্কী উচ্চারণ দিয়ে 'বরফ ভাঙার' চেষ্টা করতেই আমরা দু'জনেই হো হো করে হেসে উঠলাম। হাসির কিছুটা থাকলো কামরার মধ্যে আর বাকিটা মিলিয়ে গেল চাকার আওয়াজে—ঘট্ ঘট্ ঘটাং—ঘট্ ঘট্ ঘটাং।

কামরার ভিড় যে কখন কমে গিয়েছে টেরও পাইনি। ছ'জনের বসার জায়গায় ছ'জনই আমরা বসেছি আর তার মধ্যে দু'তিনজন নতুন যাত্রীও রয়েছেন। যাত্রী হলে কি হবে সহযাত্রী মোটেই নন। তাঁদের সঙ্গে যাত্রা করে আমার বা তাঁদের কারুরই লাভ হবে না কারণ মধ্যে ভাষার বিরাট উঁচু পাঁচিল আর সে পাঁচিল টপকাবার সামর্থ্য আমার বা অন্যান্য যাত্রীদের কারুরই নেই। তুর্কী ভাষায় আমার জ্ঞান কুড়ি-পঁচিশটা শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ আর বাকি পাঁচজনের ইংরিজীর বিদ্যা গোটা দুই তিন কথার পরই ইতি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর পাশের তরুণীটি এবার কথা শুরু করলো। হাবভাবে আর 'হাউ' 'হোয়ার' ইংরিজী শব্দ প্রয়োগ করে এই বোঝালো যে, সে জানতে চায় আমি যাবো কোথায়। যথাসম্ভব চেষ্টা করে বোঝালাম, আমি যাচ্ছি দামাস্কাসে।

হঠাৎ যেন আকাশ থেকে পড়লো মেয়েটি "মা মা মিয়াঁ—শাম্?" শাম্ মানে দামাস্কাস। এবার প্রশ্ন হয় "হাউ"। বুঝিয়ে বলি, এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কি আছে। টার্কী থেকে বাই রোড যাচ্ছি শাম্-এ। ঘণ্টা চারেক পরে ইস্কন্দরুন নেমে বাস ধরে সোজা শাম্-এ পৌঁছে যাবো কাল সকালের মধ্যে।

খিল খিল করে মেয়েটা এবার হেসে উঠলো আর তার সঙ্গে যোগ দিলো কামরার বাকি যাত্রীরাও। সেই এক কথা "মা মা মিয়াঁ—শাম্? হাউ?" মাগো, দামাস্কাস? কি করে?

নিজে একটু বোকা বনে গেলেও এদের বুদ্ধিরও ঠিক তারিফ করতে পারছিলাম না। তুর্কী ভাষার সমস্ত জ্ঞান উজাড় করে বললাম, "আকসাম্ (সন্ধ্যেবেলা) ইস্কন্দরু। চেঞ্জ, টেক দোলমুস (ট্যাক্সি), গো শাম্ ইয়ারান সুবহ (কাল সকালে)।"

আমার অজ্ঞানতার পরিচয় পেয়ে মেয়েটা এবার সহানুভূতি দেখিয়ে আমায় বোঝাতে চেষ্টা করে যে, আমি যা জেনেছি তা সবই ভুল। সুরিন্দর্ চোপরা, বে নিয়াজী আর ইমরান বে আমাকে একেবারে সঠিক ভুল রাস্তা বাতলে দিয়েছেন। যে ট্রেনে আমি চড়েছি তাতে করে আমি আজকে আকসাম্ তো দূরে থাক, ইয়ারান আকসাম্ও না ইয়ারান রাত দশটার আগে দামাস্কাস পৌঁছবার স্বপ্নও যেন না দেখি।

বলে কি? আমার মাথায় তো বজ্রাঘাত। তবু মনে সাহস সঞ্চয় করে বলি, "নো, নো, ইউ আর রঙ।"

"ইয়োক ইয়োক। মি রাইট",—না না আমি ঠিক—মেয়েটি প্রতিবাদ জানায়।

আমাদের তর্কের চেঁচামেচিতে ততক্ষণে পাশের কামরা থেকে করিডর বেয়ে আরো কয়েকজন যাত্রী এসে দরজায় ভিড় জমিয়েছে। মেয়েটিকে আমার যথাসাধ্য ইংরিজী আর তুর্কীর সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা আর মেয়েটির তুর্কীতে আমায় বোঝাবার ব্যর্থ প্রয়াস ক্রমেই একটা অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তুললো। কামরার বাকি যাত্রীরা অসহায়, কারণ তাঁরা কেউই ইংরিজী জানেন না। জীবনে শুধু একবারই মনে হয়েছিল—হায় ভগবান, যদি বছরের পর বছর ইংরিজী না শিখে তুর্কী শিখতাম তাহলে কত কাজেই না আসতো!

কামরার দরজার সামনের কৌতূহলী ভিড় ঠেলে এবার ঢুকলো আরেকটি তরুণী। পরিষ্কার ইংরিজীতে বললো, "শী ইজ কারেক্ট অ্যাণ্ড ইউ আর রঙলী ইনফরম্‌ড্।"

হাতে স্বর্গ পেয়েছি মনে হলো। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে অভ্যর্থনা

করে তাকে কামরার ভিতরে নিয়ে এসে সব বোঝাতে সে বললো যে, আমি রাত তিনটেয় পৌঁছবো ইস্কন্দরু স্টেশনে আর সেখানে গাড়ি বদল করে চড়তে হবে আরেকটা ট্রেনে। সেই ট্রেন পরের দিন বেলা আটটায় আমায় পৌঁছে দেবে ছোট্ট একটা স্টেশনে যার নাম টোপরাকালে। টোপরাকালেতে পাবো ট্যাক্সি আর ট্যাক্সি আমায় নিয়ে যাবে বর্ডার টাউন আস্তাকিয়াতে। আস্তাকিয়া থেকে অন্য ট্যাক্সিতে করে যেতে হবে সিরিয়ার হালেপ্ এ্যালেপ্পো শহরে। আবার হালেপ্ থেকে অন্য ট্যাক্সি করে যেতে হবে শাম্-এ (দামাস্কাস)। আমার অবস্থাটা ভেবে দেখবার মতো। কোথায় ভাবছি, কাল সকালে পৌঁছে যাবো দামাস্কাসে তা না এখন ইস্কন্দরু আর টোপরাকালেই দূর অস্ত্।

"দেয়ার ইজ নথিং টু ওরী" তরুণীটি জানায়। তার কামরায় কয়েকজন লোক আছে যারা যাবে টোপরাকালে পর্যন্ত। তারা সানন্দে আমায় সাহায্য করবে। আরো আশ্বাস দিলো, তার সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই ইংরিজী জানে। "ইউ সীম টু বি হাংরী। কাম, আই উইল গিভ্ ইউ সাম স্যাণ্ডউইচেস্"—নিমন্ত্রণ জানালো আমার ত্রাণকর্ত্রী। এতক্ষণ ক্ষিদের কথা মনে ছিল না। হাঁটি হাঁটি পা পা করে তাঁর সঙ্গে পাশের কামরায় গিয়ে পৌঁছলাম।

কামরায় গিয়ে দেখি, হৈ হৈ ব্যাপার আর হৈ হৈটা করছে অলিভ-গ্রীন ইউনিফর্ম পরা গোটা চারেক সেপাই। বিয়ারের বোতল, স্যাণ্ডউইচ, তাস, বাঁশি, ব্যাঞ্জো, গীটার আর মাউথ অর্গান মিলে একেবারে এলাহি কারবার। একটু অবাক হয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছি। বুঝতে আমার হলো না, কারণ ইংরিজী জানা তরুণীটিই সব ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার করে দিলো। আমরা সবাই 'সেলিব্রেট' করছি, সে বললো।

কিসের সেলিব্রেশন ?

"এই চারজন ছোকরাকে দেখছেন, তারা দু' বছর পর বাড়ি ফিরছে।"

"সেপাই মানুষ দু' বছর পর বাড়ি ফিরছে তাতে সেলিব্রেশনের কি আছে ?"

"আছে। দে আর কামিং ব্যাক ফ্রম্ দি কোরিয়ান ওয়ার।"

কোরিয়ান ওয়ার? ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুকটা। জেনারেল ম্যাকআর্থার, সিগম্যান রী, ইয়ালু রিভার, থার্টি এইট প্যারালেল, পান-মুন-জুন সব চোখের সামনে এক নিমেষে ভেসে ওঠে। ইউনাইটেড নেশন ফোর্সের হয়ে কোরিয়ান ওয়ারে গিয়েছিল তুর্কীর যুবকেরা। অনেকে ফিরেছে, অনেকে ফেরেনি। এই চারজন চলেছে ফিরে। বুকে আঁটা অনেক তকমা আর রিবন। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছে তাই এত উৎসব।

ইন্ট্রোডাকশন হলো সবাই-এর সঙ্গে। প্যাকেটের পর প্যাকেট চিউইং গাম্ আমার সামনে পেশ হয়। তরুণীটি বুঝিয়ে বললো যে, এরা সবাই যাবে টোপরাকালে, সুতরাং আমার আর কোনো চিন্তা নেই। ছোকরারা হৈ হৈ করে আমার লাগেজ পাশের কামরা থেকে উঠিয়ে আনলো। পকেটে হাত ঢোকাবার আগেই চারজন চার প্যাকেট সিগারেট আমার সামনে তুলে ধরে। আমার 'সেভিয়ার' তরুণীটি মনে মনে খুব খুশি আমার সাহায্য করতে পেরেছে বলে। নিজের লাগেজ এবার সে গোছগাছ করতে লাগল—আডানা স্টেশনে সে নামবে।

দু'জনেই করিডরে বেরিয়ে এলাম।

আমতা আমতা করে তাকে অনেক 'তশক্কুর আদারাম' জানালাম। "নট অ্যাট অল, ডোণ্ট মেনশন প্লিজ", বলে সে বিনয় দেখালো। "ইট ইজ এ প্লেজার", হেসে বলে।

"হোয়াট ইজ এ প্লেজার?" জিজ্ঞাসা করি।

"টু হেল্‌প ইউ", আবার হাসি।

করিডরের জানলা দিয়ে ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা হাওয়া ভিতরে এসে পড়ছে। দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ। স্তব্ধতা ভঙ্গ আমিই করলাম। জানতে চাইলাম তার নাম, ধাম, পেশা। খিল খিল করে হেসে তরুণীটি জবাব দেয়, "আশ্চর্য ব্যাপার, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদের পরিচয়ের পর্বটাই শেষ করিনি।"

কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী মিস্ মেসেরেৎ। ছুটীতে চলেছে বাড়ি আডানাতে। হেসে নিমন্ত্রণ জানায় আডানাতে আসবার জন্যে। আবার দু'জনেই চুপচাপ। "দি টার্কীশ চিলড্রেন আর ওয়াণ্ডারফুল"। মেসেরেৎ এবার 'টেন্‌শন্'টা কাটে।

"চিলড্রেন ছাট হ্যাভ সাচ এ ওয়াণ্ডারফুল টিচার মাস্ট বি ওয়াণ্ডারফুল ইনডীড" বলি।

"মের্সি। তশক্কুর। থ্যাংকস্ এ লট্।"

ট্রেনের ঘট্ ঘট্ ঘটাং কখন থেমে গিয়েছে জানতেই পারিনি। অন্ধকারে দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছি। জানলার কাছে ফেরিওয়ালার চিৎকারে সম্বিত ফিরে আসে। ইস্কেসির্ স্টেশন। পরের স্টেশনে নেমে যাবে মেসেরেৎ আর ফুরিয়ে যাবে কয়েক ঘন্টার এই মিষ্টি আলাপের মেয়াদ। মেসেরেৎ ফিরে যাবে তার বাড়ির শান্ত, নির্মল পরিবেশে আর তার ওয়াণ্ডারফুল 'চিলড্রেন'দের মাঝে। আর আমি? আমি আবার একা শুরু করবো আমার যাত্রা মরুপ্রান্তরের বুকে। ভিসা, পাসপোর্ট, কাস্টমস আর চেক-পোস্টের ভিড়ে হয়তো আর খুঁজে পাবো না মেসেরেৎকে।

হাতির দাঁতের একটা টাই-পিন ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিনে মেসেরেৎ আমার কাছে ফিরে এল। "ফর রিমেমব্রান্স—এ স্মল মেমেনটো ফ্রম ইয়োর টারকিশ ফ্রেণ্ড, মেসেরেৎ", টাই-এর কোণটা ধরে মেসেরেৎ লাগিয়ে দিলো পিনটা। একটা বক উড়ে যাচ্ছে, সাদা ডানা দুটো আমার নীল টাইটার উপর ছেয়ে রয়েছে। 'তশক্কুর মেসেরেৎ'—ছোট একটা ধন্যবাদ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলাম না। ট্রেনের ঘট্-ঘট্-ঘটাং-এর মধ্যে মেসেরেৎ হয়তো আমার 'তশক্কুর' শুনতেও পায়নি।

"কতদূর আর আডানা?"

"ঐ তো" শহরের নিয়ন-লাইটস-এর দিকে আঙুল দিয়ে দেখায় মেসেরেৎ।

এতো তাড়াতাড়ি এসে গেল আডানা। মেসেরেৎ চলে যাবে। বুকের মধ্যে একটু মোচড় দিয়ে উঠলো। কতটুকুই বা জানি ওকে আর ওই বা আমাকে কতটুকু জানে, কিন্তু কেন এই বিদায় বেদনা? প্রেম? ভালোবাসা? মন-দেওয়া-নেওয়ার লুকোচুরি? নারীকে পাবার পুরুষের চিরন্তন স্পৃহা? না কোনোটাই না। আজ পর্যন্ত এর কোনো উত্তর খুঁজে পাইনি। হাতির দাঁতের, ডানা মেলা বকের টাই-পিনটা আজ আর আমার কাছে নেই। সেকথা পরে, কিন্তু মেসেরেৎ আমায় ভোলেনি। আমিও হয়তো তাকে ভুলিনি।

জোরে হাতটা চেপে ধরলাম মেসেরেৎ-এর। ওর নীল চোখের কোণে একটু জল চিক্ চিক্ করে উঠলো। "গুড্ বাই, গড স্পীড অ্যাণ্ড হ্যাপি জার্নি" বলে নেমে গেল মেসেরেৎ আমার উত্তর দেবার আগেই।

কামরায় কখন ফিরে গিয়েছি আর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনেও নেই। ঘুম ভাঙলো যখন, ইস্কন্দরু স্টেশন এসে গিয়েছে। সঙ্গের অলিভ-গ্রীন ইউনিফর্ম পরা সেপাই-এর দল নিজেদের ল্যাগেজের সঙ্গে আমার লাগেজও কাঁধে নিয়ে আমাকে প্রায় টেনে হিঁচড়েই নামিয়ে নিয়ে চললো।

'কানেক্টিং' ট্রেন দাঁড়ায় খুব কম সময়ের জন্য আর টোপরাকালের গাড়িতে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিলো। ভোরের আলো স্বল্প পরিসর কামরাটার মধ্যে এসে পড়েছে। ছোকরা চারটের উৎসাহের আর সীমা নেই। দু' বছর পর তারা ফিরে যাচ্ছে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব আর পরিচিতদের মধ্যে। ফিরে যাচ্ছে স্নেহময়ী মা'র কোলে।

সকাল ৯টায় গাড়ি পৌঁছে গেল টোপরাকালে স্টেশনে। বুকের উপর আঁটা তকমা আর রিবন সাজিয়ে, নিজেদের টুপি একটু তেরচা করে বসিয়ে এবার কোরিয়ান-ওয়ার-ফেরতা সেপাইরা হুড়মুড় করে নামলো প্ল্যাটফর্মে। ছোট স্টেশন টোপরাকালে আর আরো ছোট তার প্ল্যাটফর্ম, লোকে লোকারণ্য। বীর ছেলেরা ফিরে আসছে। অভ্যর্থনা জানাতে সারা শহর উজাড় হয়ে এসেছে। চেঁচামেচি, ব্যাণ্ডের বাজনা, ফল, মিষ্টি আর ফুলের তোড়ায় স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ভরে গিয়েছে। নিমেষের মধ্যে ছেলে চারটেকে সেই জনতা কাঁধে তুলে নিলো। এ কাঁধ থেকে ও কাঁধ, ওরা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। ভাইয়ের আলিঙ্গন, বাপের আশীর্বাদ আর দৌড়ে এসে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার সেই দৃশ্য আমি জীবনে কখনো ভুলবো না। তার বর্ণনা আমি দিতে পারবো না কারণ হঠাৎ সেই জনতার উল্লাস আর জয়ধ্বনি থেমে গেল আরেক মায়ের বুক-ফাটা কান্নার চিৎকারে। কোথা থেকে কি হয়ে গেল! হাসি, উৎসব আর পুনর্মিলনের আনন্দে সমস্ত প্ল্যাটফর্ম মুখর ছিল, হঠাৎ ভিড় ছিঁড়ে দৌড়ে এল এক বৃদ্ধা আর ডুকরে

কেঁদে উঠলো। সব চুপচাপ। সেই নিস্তব্ধতার বুক চিরে শুধু ভেসে আসতে লাগল বৃদ্ধার চিৎকার।

পাঁচজন যুবককে কোরিয়ার যুদ্ধে পাঠিয়েছিল টার্কীর ছোট শহর টোপরাকালে। চারজন ফিরেছে, একজন ফেরেনি। যুদ্ধের সেই সনাতন রীতি। পৃথিবীর অনেক জায়গায় অনেকবারই এরকম অনেক ঘটনাই ঘটেছে। শুনেছি অনেক দেখিনি কখনো। ধীরে ধীরে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম। দূরে দাঁড়ানো ট্যাক্সির সঙ্গে দরদস্তুর করে চললাম আন্তাকিয়ার পথে। আন্তাকিয়ায় খানিক থেমে আবার চড়লাম অন্য ট্যাক্সিতে আলেপ্পো যাবার জন্যে। আলেপ্পো থেকে আরেকটা ট্যাক্সি করে হয়তো সোজাই পৌঁছে যেতাম সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসে—ওয়ার্লডস মোস্ট এনশিয়েণ্ট সিটি। কিন্তু তাহলে তো আর আমায় আজো হাঁটুর ব্যথার যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে চিৎকার করতে হতো না আর সুরিন্দর চোপরা আর বে নিয়াজীর 'বাই রোড' যাবার পথের হিসাবের জন্যে তাদের দায়ীও মাঝে মাঝে করতে পারতাম না।

মেসেরেৎ বিদায় নেবার সময় বলেছিল, 'গড্ স্পীড্'। আল্লার নামেই স্পীড্ ছেড়ে দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল ট্যাক্সির ড্রাইভার। তীরবেগে ছুটে চলেছে নতুন গাড়িটা দামাস্কাসের দিকে। আঁকা বাঁকা পিচ-ঢালা পথের মাইলের পর মাইল পার হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল। সব কিছু মনে নেই। রাস্তার একটা বাইফার্কেশন, আরেকটা মোটর, একটা গাছ, একটা ঝাঁকুনি আর কয়েকটা ভয়ার্ত চিৎকার ছাড়া আজ আর কিছুই মনে পড়ে না সেই অ্যাক্সিডেন্টের।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার কাছ থেকে ফিরে আসার কার কি অভিজ্ঞতা আছে আমি জানি না, কিন্তু সেদিন আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সারা জীবন তা ভুলতে পারবো না। 'কাশ্মীর প্রিন্সেস' প্লেনের কো-পাইলট আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন মহেশ দীক্ষিতও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। আমিও দাঁড়িয়েছিলাম। তফাত শুধু এই যে, তার জ্বলন্ত প্লেন যখন সমুদ্রের মধ্যে পড়ছে, মহেশ হেসে কম্যাণ্ডার ক্যাপ্টেন জাটারকে বলেছিল, "গুড লাক অ্যাণ্ড

গুড বাই ক্যাপ্টেন", আর আমার ট্যাক্সি যখন নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বরে ছুটে চলেছে, আমার মুখ দিয়ে শুধু "মা মাগো" এই কথাটাই বেরিয়েছিল।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বোধহয় সবকিছু হয়ে গিয়েছিল। সেই কয়েক সেকেণ্ডের কথা মাঝে মাঝে স্মৃতির কোণে ভেসে ওঠে। কি হয়েছিল ঠিক জানি না, শুধু মনে হয়েছিল আমি যেন অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছি। আবার মনে হয়েছিল, আমি ছুটেছি মরুভূমির তপ্ত বালুর উপর দিয়ে। পায়ে দগদগে ফোস্কা পড়েছে। আমার পিছনে একটা বিরাট দানব ছুটেছে। তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। ঐ তো সামনে মরুদ্যান। ছুটছি তো ছুটছি। কোথায় জল? শুধু মরীচিকা। ঐ তো সামনে দৌড়চ্ছে মেসেরেৎ, অলিভ গ্রীন ইউনিফর্ম-পরা সেপাইরা, আপেল বুকে বুড়ী, গুল্‌শন্ বহেন, ইরশাদ...।

তারপরে যখন জ্ঞান হলো আমি দামাস্কাসের হাসপাতালে সাদা বিছানায় শুয়ে।

কি করে যে হাসপাতালে পৌঁছেছি বা কে যে আমাকে নিয়ে এসেছিল কিছুই মনে করতে পারছিলাম না। ড্রাইভারটার কি হলো? আর বাকি যাত্রীরা, তারা কোথায়? সব রকম চিন্তা মাথার মধ্যে এসে ভিড় করতে লাগল। সব থেকে আশ্চর্য লাগছিল এই ভেবে যে, আমি কি করে বেঁচে আছি। সারা শরীরের উপর হাত বুলিয়ে দেখলাম। হাড়-টাড় সব গুঁড়িয়ে পাউডার হয়ে যায়নি তো? না, সব ঠিকই তো আছে মনে হচ্ছে। কিন্তু হাঁটুটা এমন ব্যথা করে ওঠে কেন?

হাসপাতাল থেকে যেদিন ছাড়া পেলাম, সেদিন সব কিছু জানতে পারলাম ডাক্তারের কাছে। বললেন, আমার যে কিছু হয়নি তা স্রেফ 'মিরাক্যল্'। ট্যাক্সির ড্রাইভার আল্লাহ্‌র নামে গাড়ি চালিয়ে সোজা আল্লাহ্‌র কাছেই পৌঁছে গিয়েছে আর বাকি দু'জন যাত্রী—'প্রিকারিয়স' অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছে। দুর্ঘটনার সময় দরজা খুলে যাওয়াতে আমি নাকি ছিটকে পড়ি অনেক দূরে আর জ্ঞান হারিয়ে হাঁটুতে চোট খেয়ে গোঙাচ্ছিলাম।

বরাত জোর সেই সময় মোটরে করে সিরিয়ান ফ্রন্টিয়ার পুলিসের এক অফিসার রাস্তা দিয়ে দামাস্কাস যাচ্ছিলেন আর তিনিই আমাদের পৌঁছে দিয়ে যান হাসপাতালে।

ডাক্তারটি হেসে বললেন যে, মিরাক্যল্ ছাড়া আমার বাঁচার কোনো কারণই তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। তিন দিন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম হাসপাতালে। প্রথমে তিনি ভাবেন আমার বুঝি ব্রেন কন্‌কাশন্ হয়েছে কিন্তু ভাগ্যের জোরে এক হাঁটুর জখম ছাড়া আমার কিছুই হয়নি—"বাট্ ইয়োর নী উইল গিভ্ ইউ ট্রাবল"। ট্রাবল? এখনও মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতে হয়।

হাসপাতালের আপিসে গিয়ে দেখি টাইপরাইটারের অবস্থা শোচনীয়! স্যুটকেসটাও একটু টোল খেয়েছে। আর…?

"আর কিছু হারিয়েছে?" ডাক্তার ব্যগ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন।

"আমি একটা নীল টাই পরে ছিলাম, তাতে…"

সঙ্গে সঙ্গে আমার কোটটা আর নীল টাইটা এনে হাজির করেন ডাক্তার পাশের ঘর থেকে। "ইজ দ্যাট অল্?"

"ইয়েস, বাট বাট হোয়ার ইজ দি আইভরি টাই-পিন?" প্রায় চিৎকার করে উঠি। মেসেরেৎ-এর দেওয়া এস্কেশির স্টেশনের "ফর রিমেমব্রান্স অ্যাণ্ড এ মেমেনটো ফ্রম ইয়োর টার্কীশ ফ্রেণ্ড মেসেরেৎ" টাই-পিনটা আর নেই। সাদা দুটো ডানা মেলে আছে একটা বক। হাঁটুর ব্যথা ভুলে গেলাম। ব্যথাটা অনুভব করলাম হৃদয়ের নিভৃত এক কোণে।

"ওয়াজ ইট এ ভেরি কস্ট্‌লী থিং?"

"ইয়েস ডক্টর ইট ওয়াজ। ইট ওয়াজ ইনভ্যালুয়েবল।"

"ইউ মে ট্রাই অ্যাণ্ড বাই ইট হিয়ার", ডাক্তারের কথায় সমবেদনার সুর।

বিড় বিড় করে উত্তর দি "নো ডক্টর, ইট কুড নট বি হ্যাড্ ফর মানী।"

ডাক্তার এবার নিজের খুশিমতো একটা মানে করে নিয়ে আশ্বাস দেন "আই অ্যাম শিওর শী উইল গিভ ইউ আনাদার ওয়ান"। আমার কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে ডাক্তার

প্রশ্ন করেন আমি আমার কোনো আত্মীয়-স্বজনকে খবর দিতে চাই কি না? হাসপাতালের খরচায় তা পাঠানো যেতে পারে। ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, না তার দরকার নেই। একটু আমতা আমতা করে ডাক্তার আমায় স্মরণ করিয়ে দেন যে, অজ্ঞান অবস্থায় আমি কয়েকটা নাম করে চিৎকার করেছি আর তিনি তাই মনে করেছিলেন যে, তারা আমার 'নিয়ার অ্যাণ্ড ডিয়ার ওয়ানস্'। নামগুলো ডাক্তারের মনে নেই, কিন্তু আমায় জিজ্ঞাসা করলে আমি ঠিক বলতে পারতাম, আমি ডেকেছি গুল্‌শন্ বহেনকে, ইরশাদ ভাইকে, হঠাৎ-পাওয়া মেসেরেৎকে, ইস্তানবুলের রিয়াকে, জন থমাসকে, আর মা-মা—মাগো বলে কেঁদেছি।

কি ভাষায় ডাক্তারকে আর তার স্টাফকে ধন্যবাদ জানাবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। শুধু সজোরে তার হাত দুটো চেপে ধরেছিলাম। হাসপাতাল থেকে বের হবো, হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় আবার ফিরে যাই ডাক্তারের কাছে। জিজ্ঞাসা করলাম সিরিয়ান ফ্রন্টিয়ার পুলিসের অফিসারটি কে, যিনি আমায় হাসপাতালে পৌঁছে দেন আর সামান্য একটা ধন্যবাদের অবকাশ আমায় না দিয়েই চলে যান? ডাক্তার বলতে পারলেন না। অনেক খোঁজ পরে করেছি, কিন্তু খোঁজ পাইনি। সিরিয়া ছাড়বার সময় শুধু পুলিসের বড় সাহেবকে তাঁর এক নাম-না-জানা কর্মচারীর সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসি।

সেই দিন সন্ধ্যেবেলা চলে যাই খাব্বাজ সাহেবের 'ক্যাসিয়ান হোটেলে'। প্রাতরাশ সেরে লাউঞ্জে আসতেই টোনীকে জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের দেশের কনসুলেটটা কোথায়। ঠিকানা নিয়ে পৌঁছলাম কনসুলেটে আর আধ ঘণ্টাটেক অপেক্ষা করার পর ডাক পড়লো শার্জ-দ-আফায়ার সাহেবের খাস কামরায়। সময় না নষ্ট করে তাঁকে জানালাম আমার অবস্থাটা। বললাম যে, আমার কাছে সাত দিনের ট্রান্সিট ভিসা ছিল এবং তার তিন দিন হাসপাতালেই কেটে গিয়েছে। আমার ট্রাভেলার্স চেক সিরিয়ার জন্য 'ভ্যালিড' (Valid) নয়। আর যা কিছু সিরিয়ান কারেন্সী আমার কাছে ছিল তা হারিয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমায় কিছু নগদ

সিরিয়ান কারেন্সী ধার দিতে হবে, আর আজই। কারণ তিন দিন পরে আমি 'বাই রোড' বাগদাদে ফিরে যাবো আর সময়মতো না ফিরতে পারলে বসরায় জাহাজ ধরা আমার মুশকিল হবে। অবশ্য একটা অপ্রিয় কথা তাঁকে আর বললাম না। সেটা হচ্ছে হাসপাতাল থেকে ক্রমাগত তিন দিন ফোন করা হয়েছিল আমাদের কনসুলেটে, কিন্তু সেখান থেকে কোনো সাহায্য তো দূরে থাক, কোনো উত্তরই হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ পাননি। এই লজ্জার আর অকর্মণ্যতার কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিলে আমার কাজ হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

অনেকক্ষণ চিন্তা করে আর গোটা দুয়েক সিগারেট ধ্বংস করে শার্জ-দ-আফায়ারস গম্ভীরভাবে জানালেন যে, তাঁর পক্ষে এটা করা সম্ভব না।

পাসপোর্টে লেখা প্রেসিডেন্ট অব্ ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকের আদেশ,—

"These are to request and require in the name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need".

নিজের অধিকার সম্বন্ধে এবার সচেতন হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন না?"

"দেখুন, অসুবিধাটা হচ্ছে আমি একজন শার্জ-দ-আফায়ারস, অর্থ সাহায্য করার ক্ষমতা আমার সব ক্ষেত্রে নেই।"

"সব ক্ষেত্রে না থাকুক, আমার ক্ষেত্রে অন্তত করুন।"

"একটু মুশকিল হবে।"

ঠিক আছে, আমি এখানে বিনা ভিসায় পড়ে থাকবো, কারণ আমার ভিসা ফুরিয়ে যাবে। সিরিয়ান কারেন্সী আমার কাছে নেই, সুতরাং হোটেলের বিল বা বাগদাদ যাবার মোটরের ভাড়াও আমার নেই। এই সব মিলে একটা গোলমালের সৃষ্টি হলে কি ভালো হবে?

আফায়ারস মশাই এবার আমার কথা শুনে একটু ভড়কে

গেলেন। "আপনি দু'মিনিট অপেক্ষা করুন" বলে আপিসের ভিতরে চলে গেলেন অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে। মোটা একটা বই হাতে খানিক পরে প্রায় 'ইউরেকা, ইউরেকা' মনোভাব নিয়ে শার্জ-দ-আফায়ারস সাহেব বেরিয়ে এসেই ঘোষণা করলেন, পেয়েছি। "দি ডিফিকাল্টি ইজ সলভড্।"

যে 'ডিফিকাল্টি' এতক্ষণ সলভ্ হয়নি তা হঠাৎ কিভাবে সলভড হয়ে গেল ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কি করে হলো তা দিয়ে আমার দরকার কি? আমার কাজ হলেই আমি খুশি।

"আপনাকে আমরা ডেস্টিটিউট ডিক্লেয়ার করে ভারতবর্ষে রিপ্যাট্রিয়েট করে দেবো—" আফায়ারস মশাই বেশ খানিকটা উৎসাহের সঙ্গে জানালেন।

"অ্যাঁ? ডেস্টিটিউট?"—আকাশ থেকে পড়লাম।

"দেখুন স্যার, প্রথম কথা আমি ডেস্টিটিউট মোটেই না। আমার ট্র্যাভেলারস চেকে এখনও বেশ কিছু টাকা আছে আর 'রিপ্যাট্রিয়েট' হয়ে দেশে ফেরত যাবার অর্থ আমি খুব ভালোভাবেই জানি। দ্বিতীয়তঃ আমার এখনো আরো বেশ কিছুদিন ঘোরা বাকি আছে।" রাগে আমার গা জ্বালা করতে লাগল।

"তাহলে আমরা আর কি করতে পারি বলুন?" স্যার বিনয় দেখান।

"আপনারা অনেক কিছু করতে পারেন। আমায় আপনারা কিছু টাকা ধার দিন। আমি বাগদাদে পৌঁছে আমার চেক ক্যাশ করে বাগদাদে এম্ব্যাসীতে জমা করে দেবো।"

আবার পরামর্শ।

ব্যাপারটা বেশ একটু ঘোরালো হয়ে উঠছিল আর অপ্রিয়ও। তাই দেখে স্টাফের একজন বললেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমায় টাকা ধার দিতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে আর সরকারী-ভাবে যেভাবেই হোক আমার টাকা নিয়ে কথা! আমি রাজী। কিন্তু এবার আফায়ারস সাহেবের আত্মসম্মানে একটু আঘাত লাগল আর তিনি হেসে ঘোষণা করলেন যে, তাঁর বিশেষ অধিকারের প্রয়োগ করে টাকা তিনি আমায় দেবেন, কিন্তু টাকা যেন আমি বাগদাদে গিয়েই জমা করে দিই।

টাকা পেলাম। গোটা ছয়েক সই করলাম আমার যা কিছু আছে সব প্রায় বন্ধক রেখে, অন্তত কাগজে। ব্যাপারটা হয়তো এখানেই শেষ হতো, কিন্তু তা হলে আমাদের 'ফরেন আফায়ারস' দপ্তরের কর্মক্ষমতার পরিচয় তো পেতাম না।

টাকা জমা করে দিয়েছিলাম বাগদাদে পৌঁছেই। তার মাস দুয়েক পরে যখন দেশে ফিরেছি একদিন মধ্যপ্রদেশ গভর্নমেণ্টের আণ্ডার-সেক্রেটারী কৃষ্ণণ সাহেব আমায় ডেকে পাঠান। তিনি জানালেন যে, আমি ধার-করা টাকা না ফেরত দেওয়াতে একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠলো। কৃষ্ণণ সাহেবকে বললাম টাকা আমি ফেরত দিয়েছি আর তার রসিদ আমার কাছে আছে। পরে হিসাব করে দেখতে এই পাওয়া গেল যে, কারেন্সী এক্সচেঞ্জের দৌলতে আমি প্রায় টাকা দশেক বেশিই দিয়েছি।

আমার রিটার্ন জার্নির সময় আমি সিরিয়ায় এসেছিলাম। প্ল্যান ছিল, না থেমে সোজা সিরিয়ান মরুভূমি পাড়ি দিয়ে আবার যাবো বাগদাদে আর সেখান থেকে আবার শুরু করবো আমার বাকি যাত্রাটুকু। হাঁটু আমার জখম হয়েছে ক্ষতি নেই। হাঁটুর ব্যথা যখন মাঝে মাঝে ওঠে দামাস্কাসের স্মরণীয় তিন দিনের কথাও আমার মনে হয়। আরো মনে হয় টোনীকে, নোর্মাকে, ক্যারীকে, খাব্বাজ সাহেব আর তাঁর 'সুইট হার্ট ইভেন অ্যাট ফিফটি ফোর', স্যালীকে আর 'ফ্রাঁসে মশেঁয়' পোর্টার আবদুলকে। দামাস্কাসে আমি জীবনের যৎসামান্য রমণীয় মুহূর্তের মধ্যে কিছু মুহূর্ত কাটিয়েছি। অনুর্বর, তপ্ত, শুষ্ক মরুপ্রান্তরের বুকে দামাস্কাস আমার ভালো লেগেছিল আর ভালো লেগেছিল সিরিয়ার আরবদের, তাদের ইতিহাসকে, তাদের ঐতিহ্য, শিল্প আর সভ্যতাকে। মরুপ্রান্তরের বালুরাশি ঠেলে উঠছে নূতন সিরিয়া—নূতন সিরিয়া, যেখানে আরবরা বুক ফুলিয়ে গাইবে সিরিয়ার জয়গান। ফ্রেঞ্চ বেয়নটের সামনে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আর 'লা মারসাইয়ে' শুনতে হবে না দামাস্কাসের রাজপথে। নতুন সিরিয়ার বুকে আবার উঠছে নতুন দামাস্কাস—'দি ওয়ার্লডস মোস্ট অ্যানশিয়েন্ট সিটি।'

মিডিল ইস্টের অন্যান্য দেশের মতো সিরিয়ার ইতিহাসও রক্তে রঞ্জিত। একের পর এক আক্রমণকারীরা সিরিয়ার উপর অভিযান চালিয়েছে—ইউরোপের ক্রুসেডারস, আলেকজাণ্ডার, তৈমুরলঙ, অটোমান সুলতান, রোমান সৈন্য, আরো অনেকে। তারপর ১৯২০ সালে এসেছে ফরাসীরা আর রাজত্ব করেছে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর। ছাব্বিশ বছরের সেই সময়কে সিরিয়ানরা 'কালো ইতিহাস' বলে। জেনারেল বেয়নতের দামাস্কাসের উপর বোমা বর্ষণ সিরিয়ানরা আজও মনে রেখেছে। পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতির সঙ্গে সিরিয়ার রাজনীতিও জড়ানো আর তাই বাকি আরব দেশের মতোই সিরিয়াতেও শান্তি এসেছে রক্তের বন্যার মধ্যে দিয়ে। গভর্নমেণ্টের পর গভর্নমেণ্ট বদলেছে আর তাদের সঙ্গে এসেছে নতুন নতুন আইনকানুন, খেয়াল আর নিয়ম। সিরিয়ান জনতা কখনো সহ্য করেছে কখনো করেনি। যখন সহ্য করবার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে ক্রুদ্ধ জনতার রোষে গভর্নমেণ্টের পর গভর্নমেণ্ট বদলে গিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে মিডিল ইস্টেও পরিবর্তন হচ্ছে আর তার সঙ্গে বদলাচ্ছে সিরিয়া। 'মোস্ট অ্যানশিয়েণ্ট' সিটি দামাস্কাস সেই সব পরিবর্তনের মধ্যে আজও দাঁড়িয়ে আছে। সিটি অব পামস্, বাইবেলের টাডমোর আজও দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসস্তূপের মাঝে পামিরা গ্রামের কিছু দূরেই। আলেপ্পোর সিটাডেল, নিউ টেস্টামেণ্টের স্ট্রেট স্ট্রীট, স্বর্ণ-নদী বরোদা, ওমরাদের মসজিদ, যা অতীতকালে হাদাদ আর জুপীটারের মন্দির ছিল, সেণ্ট পলের গবাক্ষ, বুর্জ আর নুনের পাহাড় আজো মনে করিয়ে দেয় অতীতের সিরিয়াকে। আজকের দামাস্কাস আর আলেপ্পো তার ঝকমকে রাস্তা, কাফে, নাইট ক্লাব, উঁচু-উঁচু অট্টালিকা, স্ট্রিমলাইণ্ড মোটর, পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়াচ-লাগা নরনারী—সব মিলিয়ে চিরপুরাতনের মাঝে দাঁড়ানো নতুন সিরিয়াকে ভালো লাগে।

সাতষট্টি বছরের বৃদ্ধ সিরিয়ান প্রেসিডেণ্ট শুকরী-অল্-কোয়াটলী আজ আরব জাগৃতীর প্রতীক। জীবনের বহু বছর তিনি কাটিয়েছেন কারাগৃহে আর দু'বার তাঁর হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড।

ইস্তানবুলে যখন তিনি পড়তেন পুলিসের খাতায় তাঁর নাম ছিল 'ডেঞ্জারাস অ্যাজিটেটর'। সিরিয়ার রাজনীতিতে বিপর্যয় অনেকবার এসেছে আর প্রতিবারই শুকরী-অল্-কোয়াটলীর ডাক পড়েছে সিরিয়াকে বাঁচাবার জন্যে। কর্নেল হুসনী জয়িমের Coup. d'etat-এর পর কোয়াটলীকে পালাতে হয় দেশ ছেড়ে। আবার কিছুদিন পরে কর্নেল হিনায়ি আর তাঁর দলের হাতে মৃত্যু হয় জয়িমের। কিন্তু হিনায়িও থাকলেন না বেশি দিন, এলেন কর্নেল শিশক্‌লী। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত তিনবার গভর্নমেণ্ট বদলে গেল আর শেষে জনতা তাদের প্রিয় নেতা শুকরী-অল্-কোয়াটলীকে আবার ফিরে পেলো দেশের কর্ণধাররূপে। কোয়াটলী সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট না হলে সিরিয়া যে আজ কোন্ শিবিরে যোগ দিতো তা বলা কঠিন।

আমি যখন সিরিয়ায় তখন সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট কর্নেল শিশক্‌লী। সেদিন সকালে বসে যখন টোনীর সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল, বেশ অনুভব করছিলাম টোনী বলতে চায় অনেক কিছু, কিন্তু বলতে পারছে না কিছুই। কিসের একটা ভয় ওকে চেপে ধরেছে। ইতিহাসের ছাত্র টোনী, নিজেকে বলে সোস্থালিস্ট। স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে, কিন্তু সে ব্যথা পায় যখন ভাবে স্বাধীনভাবে সব কিছু বলতে গেলে বিপদকে ডেকে আনবে। টোনী কিন্তু জানতো শিশক্‌লী বেশিদিন টিকবেন না। ও ঠিকই জানতো আর টোনীর মতোই আরো অনেক সিরিয়ানরাই তাই ভাবতো।

সিরিয়ান গভর্নমেণ্টের এক মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানাতে একজন সরকারী কর্মচারী বললেন যে, দু'দিন পরে দেখা হতে পারে। "দু'দিন? একটু দেরি হয়ে যাবে না?" তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম।

"হোয়াই? ডু ইউ কিয়ার হি ওণ্ট বি ইন পাওয়ার টিল দেন?" বলে কর্মচারিটি হেসে ওঠেন। টোনী ঠিকই ভেবেছিল। শিশক্‌লীর সিংহাসন কিছুদিন পরেই ওল্টায়। টোনী হয়তো সেদিন প্রাণ খুলে কথা বলেছিল।

টোনীর সঙ্গে অনেক কথাই হলো। নতুন বিয়ে করেছে টোনী, তাই রঙীন স্বপ্নে বিভোর। যতবারই ওর স্ত্রী আমাদের সামনে দিয়ে যায়, টোনী আমায় জিজ্ঞাসা করে, "ইজন্ট শী বিউটিফুল?" টোনীদের ক্যাসিয়ান হোটেলটাও একটু অন্য ধরনের। মিঃ খাব্বাজ বৃদ্ধ বয়েসে কিছু একটা করতে হবে তাই হোটেল খুলে বসেছেন। এমন কিছু বেশি লোকও থাকে না আর খাব্বাজ সাহেবের তার জন্য কোনো চিন্তাও নেই। বেশি ভিড় তিনি অপছন্দ করেন। টোনী বললো, "আমরা তো থাকিই। কিছু ঘর খালি পড়ে আছে তাই কখনও কখনও টুরিস্টরা আসে।" একটু মস্করা করে টোনী—"আওয়ারস ইজন্ট দি ইউস্যুয়াল টুরিস্ট হোটেল।"

"হাউ?" ওকে জিজ্ঞাসা করি।

"উই আর নট দি লেগ্‌স-পেগ্‌স অ্যাণ্ড এগ্‌স টাইপ।"

"নট ইভেন পেগ্‌স অ্যাণ্ড এগস্‌?"

"এগস্‌ উই উইল গিভ ইউ অ্যাণ্ড পেগস্‌ ইউ ক্যান হ্যাভ উইথ মি।"

বেশ লেগেছিল টোনীকে, ক্যারীকে আর নোর্মাকে। ওদের সঙ্গে তিনদিন কেটে গিয়েছিল তিন মিনিটের মতো। যেদিন চলে যাবো সেদিন কেবলই মনে হয়েছে আরও কিছদিন থাকলে ভালো হতো। 'হিন্দিস্তান' সম্পর্কে অফুরন্ত প্রশ্নের ঝুলি 'সুইটহার্ট ইভেন অ্যাট ফিফটি-ফোর' মিসেস স্যালী খাব্বাজের কাছে। আমাদের শহরের বড় রাস্তার উপর দিয়ে রাতদিন বাঘ যাতায়াত করে কিনা, মাথার বালিশের নিচে সাপ নিয়ে আমি শুই কি না, যাদু দিয়ে মেয়েদের বশ করা হয় কি না, এই রকম এন্তার মার্কিনী প্রশ্নের উত্তর আমায় তাঁকে দিতে হয়েছে। একদিন সকালে এসে জানালেন যে, তিনি আজ আমায় 'টিপিক্যাল' আরব 'ডীশ' খাওয়াবেন। জিজ্ঞাসা করলাম ডীশটি কী? জবাব পেলাম 'সাওয়ার মিল্ক'। খাওয়ার সময় দেখি ওমা, এতো দই! সুখ্যাতি করে বললাম, আমরাও দই খাই। শুনে তো মিসেস খাব্বাজ অবাক। সবাইকে ডেকে জানান, "হিন্দিস্তানে এরাও সাওয়ার মিল্ক খায়।" আগে মিসেস খাব্বাজ আমায় একটু কমই আমল

দিতেন, কিন্তু সাওয়ার মিল্কের দৌলতে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশ বেড়ে উঠলো আর সকাল সন্ধ্যা সাওয়ার মিল্ক খেতে খেতে আমার প্রাণান্ত।

আর টোনী। ইতিহাসের ছাত্র, এবার পড়বে আইন। এতদিন হয়তো টোনী আইন পড়ে দামাস্কাসের কোর্টে কোর্টে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্রীফ নিয়ে। টোনীর আইন পড়ার শখ, তাই উকিলদের সম্বন্ধে একটা অতি পুরনো রসিকতা ওকে শুনিয়েছিলাম। শুনে ওর বোন নোর্মা খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। সন্ধ্যেবেলা সেদিন সবাই আমরা হোটেলের লাউঞ্জে বসেছিলাম। বৃদ্ধ খাব্বাজ সাহেব ছিলেন খুশ মেজাজে। স্থান কাল পাত্র ভুলে গিয়ে নিজের জীবনের অনেক কথাই শোনাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে স্যালী উঠছিল ক্ষেপে আর লজ্জায় ক্যারী আর নোর্মা পোর্ট-এর গ্লাশের মধ্যে মুখ লুকোচ্ছিল।

খাব্বাজ সাহেব আমায় জিজ্ঞাসা করলেন টোনীর আইনজীবী হবার ইচ্ছা সম্বন্ধে আমার কি মত? টোনী আমায় আগেই বলেছিল খাব্বাজ সাহেব চান সে আর্মিতে যোগ দেয়। কি উত্তর দেবো ভাবছি, এমন সময় টোনী বলে উঠলো যে, আইনজীবীর কাজ অনেক সহজ।

একটা 'মোকা' পেয়ে বললাম—"হ্যাঁ, সত্যি। আইনজীবীর কাজ অনেক সহজ। ইফ্ ইউ হ্যাভ ল অন ইওর সাইড হ্যামার ইট ইনটু দি ব্রেন অব দি জাজ। ইফ ফ্যাক্টস আর্ উইথ ইউ হ্যামার ইট ইনটু দি ব্রেন অব দি আদার কাউন্সেল।"

"বাট সাপোজ ইউ ডোণ্ট হ্যাভ আইদার", খাব্বাজ সাহেব হেসে জিজ্ঞাসা করেন।

"দেন, হ্যামার দি টেবল।"

খিলখিল করে হেসে উঠলো নোর্মা "মঁ দিউ, মঁ দিউ। টোনী, ইফ ইট ইজি অ্যাজ ইজি অ্যাজ অল দ্যাট্, ইউ শুড্ ডু ইট্।"

"লেট আস্ হ্যাভ এ ড্যান্স্" ব্যাপারটাকে ঘোরাবার জন্য প্রস্তাব করে ক্যারী আর টোনী রেডিওগ্রামটা খুলে দিয়ে।

ধীরে ধীরে ওয়ালটজ্ বেজে ওঠে। নোর্মাকে ড্যান্স প্রপোজ

করাতে সে একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "ডু ইউ রিয়েলী ড্যান্স্ ইন ইণ্ডিয়া" ? আমি আর নোর্মা, টোনী আর ক্যারী, খাব্বাজ আর স্যালী। হোটেলের বড় হলের মোসেক ফ্লোরের উপর আমরা ছোট ছোট পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছি। নোর্মার মুখের উপর এসে পড়েছে নিয়নের সবুজ আলোটা, আরো সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। আলগোছভাবে বাঁ হাতটা রেখেছে আমার কাঁধের উপর, ডান হাতের আঙুলগুলো ছুঁয়ে রয়েছে আমার বাঁ হাতের কয়েকটা আঙুলে। "ইউ ড্যান্স্ সো ওয়েল" নোর্মা আস্তে আস্তে বলে। ধন্যবাদ জানিয়ে গতিটা একটু বাড়িয়ে দি। টোনী আর ক্যারী এক কোণে 'ক্লোজ' ড্যান্স্ করছে আর হলের মধ্যে বৃদ্ধ খাব্বাজ আর 'সুইটহার্ট ইভেন অ্যাট ফিফ্‌টি-ফোর' স্যালী স্টেপ গুণে গুণে মন্থর গতিতে চলেছেন...ওয়ান টু, ওয়ান টু, ওয়ান...।

রেকর্ড বদলায়। শুরু হয় ট্যাঙ্গো..."দেয়ার ওয়ার স্টারস ইন ইওর আইজ, স্টারস ছাট প্লেড দি ফ্লেমিঙ্গো"।

টোনী আর ক্যারী আরো ক্লোজ। "আই লুকড্ ফর ইয়োর চার্মস বাট ইউ টুক মী ইন ইওর আর্মস।" টোনী আর ক্যারী আরো কোণে সরে যায় আর ক্যারী টোনীর আর্মসের মধ্যে চলে আসে। একদৃষ্টে নোর্মা দেখছিল ওদের। হঠাৎ আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই গালটা লাল হয়ে পড়ে। আলগোছা বাঁ হাতটা আমার কাঁধের উপর আরেকটু নিবিড় হয়ে আসে, আমার বাঁ হাতে ছোঁয়া ওর ডান হাতের আঙুলগুলো আরেকটু চেপে বসে।

দ্রুত চলেছে সঙ্গীত আর আরো দ্রুত নেচে চলেছি আমরা। হঠাৎ হাঁটুটা চাড়া দিয়ে উঠলো। বেশ বুঝতে পারলাম আমার স্টেপ ভুল হচ্ছে। হাঁটুর যন্ত্রণায় আমার কপালে ঘাম দেখা দিলো। "এক্সকিউজ মি" বলে ঝটকা মেরে নোর্মাকে ছেড়ে অদূরেই রাখা একটা সোফায় গা এলিয়ে দিলাম। নোর্মা দাঁড়িয়ে আছে ফ্লোরের মধ্যে একা, কোণে টোনী আর ক্যারী। খাব্বাজ আর স্যালী পাশের ঘরে চলে গিয়েছেন। নোর্মা দৌড়ে এল জলের একটা গ্লাশ নিয়ে। রেকর্ডের গানটা তখনও কানে আসছে আবছা, আবছা, হাল্কা সুরে :—

"হোয়াই শুড আই গো হোম
হোয়েন ইউ আর নট প্রিপেয়ার্ড টু কিস্
মি গুড-বাই,
সো ডোণ্ট মাইণ্ড মাই হ্যাঙ্গিং অ্যারাউণ্ড
ইফ আই ডোণ্ট গো হোম…"

পরের দিন সকালে উঠে বেশ একটু লজ্জা পেলাম। মিসেস খাব্বাজ এসে শুধালেন শরীর কেমন আর জানিয়ে গেলেন যে, নোর্মা রাতে অনেকক্ষণ আমার জন্যে জেগে বসেছিল। হাসিমুখ নোর্মা এসে জানালো "বঁ জুর"। পোর্টার আবদেল জানায় ট্যাক্সি তৈরি। সিরিয়া আজ আমায় ছেড়ে যেতে হবে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল নোর্মা, টোনী আর ক্যারী। বিদায় জানালো সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে। আবদেলকে বলি "অরভয়র আবদেল?" হেসে গড়িয়ে আবার বত্রিশ পাটি দাঁতের এগজিবিশন দেখিয়ে আবদেল হাততালি দেয় "মর্শেয় ফ্রাঁশে"।

টোনী হ্যাণ্ডব্যাগে গুঁজে দেয় এক বোতল বিয়ার "আই টোল্ড ইউ পেগস অন মি"।

"গুডবাই টোনী, গুডবাই নোর্মা, গুডবাই ক্যারী" আবেগের সঙ্গে ওদের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে পড়ি ট্যাক্সিতে। সজল চোখে দাঁড়িয়ে আছে ওরা তিনজন। ট্যাক্সি চললো নৈরান ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর ডিপোতে। তিন দিনের চেনা দামাস্কাস, ক্যাসিয়ান হোটেল, নোর্মা, টোনী, ক্যারী, স্যালী, খাব্বাজ আর আবদেল সব পড়ে রইলো পিছনে। আমি চললাম মরুপ্রান্তরের বুকের উপর দিয়ে দামাস্কাস থেকে বাগদাদ।

তেরো

সিরিয়ান মরুভূমির বুক চিরে গোঙাতে গোঙাতে চলেছে নৈরান ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর ওভারল্যাণ্ড ডেজার্ট মেল। মাইলের পর মাইল শুধু বালি আর বালি। মাঝে মাঝে অতিকায় দানবের

মতো বালির এক একটা স্তম্ভ ঘূর্ণি হয়ে আকাশে ওঠে আর বাসের সামনে আছড়ে পড়ে। সামনে, পাশে, পিছনে যেদিকে তাকাও শুধু বালি আর বালি। ক্রুদ্ধ আক্রোশে গোঁ গোঁ করে কাঁচের জানলার উপর ধাক্কা মারে আগুনে-বাতাস। সিগারেটের টুকরো ফেলবার জন্যে জানলার শার্সি খুলতেই হাজার হাজার তপ্ত লৌহশলাকা চোখে এসে বেঁধে আর বাকি যাত্রীরা হৈ হৈ করে ওঠে। চক্রবালের কোল ঘেঁষে দেখতে পাই, রূপোর মতো চিক্ চিক্ করছে ঝিল্। বাস এগোয় আর দূরে বহুদূরে চলে যায় রূপোর ঝিল্। মরুভূমির বুকে মরীচিকার লুকোচুরির খেলা চলে সমানে। 'বাগদাদ হনুজ দূর অস্ত।' বাগদাদ এখনো অনেক দূরে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মেজর নৈরান অনেক ঘোরাফেরা করেন সিরিয়া আর ইরাকের আশে পাশে। চারশ' মাইল বিস্তৃত সিরিয়ান মরুভূমি দিয়ে যখনই মিলিটারী কনভয় নিয়ে তিনি গিয়েছেন, কেবলই মনে হয়েছে, অল্-শাম্ (দামাস্কাস্) আর বাগদাদের মধ্যে ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস-এর সম্ভাবনার কথা। বছরের পর বছর কাটিয়েছেন সার্ভেতে আর যুদ্ধের পর মিলিটারী থেকে অবকাশ নিয়ে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করলেন—'নৈরান ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী লিমিটেড ওভারল্যাণ্ড ডেজার্ট মেল।' এয়ার-কণ্ডিশন পুলম্যান, সেকেণ্ড ক্লাশ এক্সপ্রেস, আর টুরিস্ট ক্লাশ সার্ভিস চলে মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে। স্পেশ্যাল ডিজাইনের বাস, প্রায় ছোটোখাটো একটা ট্রেনের মতোই। দামাস্কাস থেকে চড়ো বাসে দুপুর ১১টায়, পরের দিন প্রায় দুপুর বারোটায় পৌঁছে যাবে বাগদাদ। লাঞ্চ আর ডিনারের বন্দোবস্ত বাসেই। ছোট ছোট কাগজের বাক্সে রাখা আছে ড্রাই লাঞ্চ আর ডিনার। বাসের সঙ্গে লাগানো ট্যাঙ্ক থেকে যাত্রীদের জন্য জল সাপ্লাই-এর বন্দোবস্ত আছে। বালির বুক ভেঙে চলে বাস। রাস্তা ঘাটের বালাই নেই, অভ্যাসের উপর নির্ভর করে গাড়ি চালায় সাহসী ড্রাইভার। রাস্তা থাকবে কোথা থেকে? বাস চলার দরুন যদি বা তৈরি হয় বালির ঝড়ে দু'মিনিটের মধ্যেই তা চাপা পড়ে বালির স্তূপের নিচে। কোথাও রাখা একটা কালো

ড্রাম বা পোঁতা একটা পোল—রাস্তা চিনে নেবার পক্ষে ড্রাইভারদের জন্যে এই যথেষ্ট।

দামাস্কাস ছেড়ে অনেকদূর চলে এসেছি কিন্তু সঙ্গে নিয়ে চলেছি অনেক স্মৃতি। শেষ 'চেক পোস্টে' পাসপোর্ট দেখা হয়ে গেল। ধীরে ধীরে চলেছিল বাগদাদের দিকে—হারুন-অল-রশীদ আর আরেবিয়ান নাইটস্-এর বাগদাদ। আলাউদ্দিনের চিরাগ আর বোতলের ভূত (জিন)-এর বাগদাদ। হলিউডের চিত্র নির্মাতাদের কাহিনীর অফুরন্ত ভাণ্ডার—বাগদাদ। রাজা হিরাক্লিউস (Heraclius) যখন আরবদের আক্রমণে সিরিয়া ছেড়ে পালান, সীমান্তের কাছে এসে একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখেন ছেড়ে-আসা অল্ শাম্-এর দিকে আর বলেন, "ফেয়ারওয়েল সিরিয়া। হোয়াট অ্যান এক্সেলেন্ট কান্ট্রি দিস্ ইজ ফর দি এনেমী।"

আমি মনে মনে শুধু বললাম, "ফেয়ারওয়েল সিরিয়া। সী ইউ এগেন।"

চল্লিশজন যাত্রী আমরা বাসে, বেশির ভাগই আরব। আমার পাশে বসে এক পাদ্রী—ফাদার জোনাথান। দামাস্কাস থেকে চলেছেন বাগদাদে মিশনারী কাজে। জীবনের অর্ধেকের বেশি কাটিয়েছেন মিডল-ইস্টে। সুন্দর আরবী বলেন। বাসের বেশির ভাগ যাত্রীই দেখলাম তাঁকে চেনে আর বেশ খাতিরও করে। মাথার উপর সূর্যদেব উঠেছেন আর বাসের ভিতরটাকে মনে হচ্ছে আগুনের বয়লার। সব যাত্রীরা যখন গরমে ত্রাহি ত্রাহি করছে আর গেলাশের পর গেলাশ জল খাচ্ছে ফাদার জোনাথান নির্বিকারভাবে বসে আছেন। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকান আর মৃদু হেসে পকেট থেকে বাইবেল বের করে পড়তে শুরু করেন। বেলা প্রায় দেড়টার সময় ফাদার জোনাথান তাঁর লাঞ্চ প্যাকেটটা নিয়ে কোলের উপর রাখলেন। তাঁর দেখাদেখি আমিও শুরু করলাম লাঞ্চ। খেতে খেতেই আলাপ হলো ফাদার জোনাথানের সঙ্গে। "ইউ স্পীক ইংলিশ ছাট ইজ ভেরী ফাইন।" কথায় কথায় আলাপ হয় গভীরতর। বেশ ভালো লাগল ফাদারকে। নিজের ধর্মের, লর্ড আর জিসাস্ ক্রাইস্ট-এর কথা অনবরতই বলেন

অন্যান্য যে কোনো মিশনারীর মতো। কিন্তু তফাত, ফাদার জোনাথান অন্য ধর্মের উপর আঘাত করেন না।

স্যাণ্ডউইচে কামড় দিতে দিতে ফাদার জোনাথান প্রশ্ন করেন ভারতবর্ষের নানা সমস্যা সম্বন্ধে। অস্পৃশ্যতা, গান্ধী, নেহরু, নন-ভায়েলেন্স, কম্যুনিজম, মাইনরিটি ইত্যাদি, ইত্যাদি।

“টেল মি, ডু ইউ নো এনিথিং আবাউট দিস্ আগা খান?” হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন ফাদার জোনাথান।

যৎসামান্য যা কিছু জানতাম বললাম, কিন্তু জোনাথান সন্তুষ্ট হন না। একটা প্রশ্ন শেষ না হতেই আরেকটা প্রশ্ন তৈরি। যতই বুঝিয়ে বলি আমি আগা খাঁ বা তাঁর ছেলে আলী খাঁ’র অনুযাত্রী নই, ফাদার জোনাথান ততই জিজ্ঞাসা করেন, “বাট হাউ ডু দে ওয়ারশিপ হিম অ্যাজ এ গড্?”

“ইট ইজ অল এ ম্যাটার অব ফেথ ফাদার” জবাব দিই।

“বাট হি গ্যাম্বলস, ম্যারিজ এনি নাম্বার অব টাইমস অ্যাণ্ড রানস রেস হর্সেস।”

ফাদার জোনাথানকে এবার একটা পুরানো ঘটনার কথা বলি। অনেক দিন আগে এক ফরাসী সাংবাদিকের সঙ্গে আগা খাঁ’র প্রাইভেট সেক্রেটারীর এই ব্যাপার নিয়ে অনেকক্ষণ তর্কাতর্কি হয়। শেষে জার্নালিস্ট মহোদয় ফাদার জোনাথানের মতো তাঁর শেষ অস্ত্র ছাড়েন “গ্যাম্বলিং, টু মেনী ম্যারেজেস অ্যাণ্ড হর্স রেসিং।”

কিন্তু সে অস্ত্রও বৃথাই গেল। প্রাইভেট সেক্রেটারী ছাড়লেন অ্যাটম বোমা—

“But if God wants to gamble, marry and go horse-racing, why shouldn’t he and why should you object ?”

“দ্যাট ইজ এ ফাইন ওয়ান, বাট ইট ডাজন্ট কনভিন্স মি” ফাদার জোনাথান মাথা নাড়েন।

ফাদারকে বললাম যে, এর পরে এক স্বয়ং আগা খাঁই তাকে ‘কনভিন্স’ করতে পারেন।

জন মাস্টার্স-এর ‘ভওয়ানী জংশন’ পড়েছেন ফাদার জোনাথান আর যদিও তাঁর মতে “ইট ইজ ইমমর‍্যাল অ্যাণ্ড

ভাল্লার", তবুও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে অশেষ কৌতূহল। জানালাম যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের অনেক দিন আগে এক নেতা বলেছিলেন, "দে আর লিভিং মনুমেণ্ট অব ব্রিটিশ ডিবচরী ইন ইণ্ডিয়া।"

"দ্যাট ইজ এ লাই" ফাদার জোনাথান এবার রেগে উঠলেন। তাঁর ধমনীতে যে আভিজাতিক ইংরেজ রক্ত প্রবহমান, তা প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু পরক্ষণেই আবার মিশনারী মন চাড়া দিয়ে ওঠে। কথার মোড়টা ঘুরিয়ে ফাদারকে বললাম যে, জন মাস্টার্স আর যা কিছু লিখুন না লিখুন, অন্তত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের রেলের চাকরিতে আধিপত্য সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা সত্যিই।

"এখনো কি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা রেলে চাকরি করে?" ফাদার আবার প্রশ্ন করেন। তাঁকে জানাতে হলো যে, অনেক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানই চলে গিয়েছে। যারা আছে, ধীরে ধীরে তারা বাকি ভারতীয়দের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, এককালে রেলের চাকরিতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের আধিপত্য ছিল। জুনিয়র কেম্‌ব্রিজ পাশ হলেই রেলের চাকরি বাঁধা। এক ইউরোপীয়ান প্রিন্সিপাল রসিকতা করতেন, "ওহ্, দি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানস্? ফাস্ট ফর্ম, সেকেণ্ড ফর্ম, থার্ড ফর্ম অ্যাণ্ড দেন প্ল্যাটফর্ম।" হো-হো করে হেসে ওঠেন ফাদার জোনাথান।

ফাদার জোনাথানের সঙ্গে গল্প-গুজবে আর যাত্রীদের কলহে ধীরে ধীরে দিনটা কেটে যায়। মরুভূমির উপর নেমে আসে সন্ধ্যা। দিগন্তে আগুনের ভাঁটার মতো সূর্য অস্ত গেল, আর আমাদের ওভারল্যাণ্ড ডেজার্ট মেল থামে। গাড়ির ব্রেক টানতে না টানতে যাত্রীর দল হুড়মুড় করে নামে বালির উপর। কেউ পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে, আর কেউ মুঠো মুঠো বালি ওড়ায় আকাশের দিকে। যে বালুরাশি এতক্ষণ তেতে যাত্রীদের ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িয়ে তবে রেহাই দিয়েছিল, সেই বিস্তৃত বালুরাশিই এবার তার শীতল কোলে আশ্রয় দেয় ক্লান্ত-শ্রান্ত যাত্রীদের। আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে রইলাম

অনেকক্ষণ। মাঝে মাঝে সেই শান্ত পরিবেশ ভঙ্গ করে কানে আসে রাইফেলের গুলীর আওয়াজ অনেক দূর থেকে, আর বেদুইনদের দু'-একটা উটের কাফিলা চলে যায় পাশ দিয়ে। খানিকদূর গিয়ে থামবে ওদের কাফিলা, আবার চলবে ভোর হবার আগেই। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে আমাদের বাসের যাত্রীদল। অবোধ্য আরবী ভাষায় তাদের প্রেমালাপ, কলহ আর তর্কাতর্কির ঐকতানের মধ্যে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানতেই পারিনি। ঘুম ভাঙলো ফাদার জোনাথানের ডাকে। আবার শুরু হয় যাত্রা। ফাদার নিজের ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে দেন গরম চা।

বেলা এগারোটায় বাস থামে। এবার ইরাকের বর্ডার পোস্ট রুতবাতে। পাসপোর্ট, ভিসা, কাস্টমস ক্লিয়ার করে আবার যাত্রা শুরু। আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পৌঁছাই বাগদাদে। হারুন-অল-রশীদের বাগদাদ, আরেবিয়ান নাইটস আর থাউজাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়ান নাইটসের শহর বাগদাদ। "ওয়েল বেস্ট অব লাক"—ফাদার জোনাথান বাড়িয়ে দিলেন তাঁর হাত।

"থ্যাঙ্ক ইউ ফাদার।"

"গড ব্লেস ইউ মাই সন", গভীর আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন ফাদার জোনাথান আর উঠলেন অপেক্ষমান মিশনের গাড়িতে। আমি এদিক-ওদিক দেখছি জন থমাস এসেছে কি না, হঠাৎ "আহ্‌লীনওয়া স্যাহ্‌লীন, আহ্‌লীনওয়া স্যাহ্‌লীন" চিৎকার করতে করতে দু'হাত তুলে জন এগিয়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলো।

জন থমাস বসরার বিরাট ব্রিটিশ ফার্ম-এ চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল 'টরাস এক্সপ্রেস'-এ যখন আমি বাগদাদ থেকে যাচ্ছিলাম ইস্তানবুলে। টার্কীতে সব সময় আমার সঙ্গেই ছিল জন। টার্কী থেকে ও ফিরে আসে ইরাকে আর আমি চলে যাই ইউরোপ। ফেরার পথে আবার এসেছি আমি ইরাকে আর জন ছুটি নিয়ে বাগদাদে এসেছে অভ্যর্থনা জানাতে।

চার দিন ওর সঙ্গে সারা বাগদাদ শহর চষে ফেলেছি। সকাল

থেকে আমাদের শুরু হতো টো-টো কোম্পানী আর যখন বাড়ি ফিরতাম তখন বাগদাদ গভীর নিদ্রার কোলে। জন বলতো, "লেট আস্ বীট্ আপ দি টাউন"। অফুরন্ত ওর শক্তি, ঘুরছে তো ঘুরছেই। হেঁটে, বাসে, ট্যাক্সিতে আমায় বাগদাদ শহরের অলি-গলি দেখিয়ে তবে দম নেবে। বলে, তোমার সঙ্গে আমিও বাগদাদকে আবার দেখছি।

হাজার হাজার বছর আগের Cradle of Civilisation আর Garden of Eden-এর দেশ প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে আজকের ইরাকের অনেক তফাত। দু'হাজার বছর আগের হারুন-অল-রশীদের বাগদাদের সঙ্গেও আজকের রাজা ফৈজালের রাজধানী বাগদাদের অনেক তফাত। মেসোপটেমিয়ার বুকে রাজত্ব করছে একের পর এক সুমেরিয়ান, ব্যাবিলনিয়ান, আসেরিয়ান আর বৈজান্টাইন সম্রাটরা। সুমেরিয়ানরা দিয়েছে হস্তলিপি, সময় নির্ধারণের ১২ প্রহর আর জ্যোতিষ বিজ্ঞান, ব্যাবিলনিয়ানরা দিয়েছে সপ্তাশ্চর্যের এক আশ্চর্য ঝোলানো বাগান আর সত্যি মিথ্যে জড়ানো অনেক কাহিনী। আসেরিয়ানরা দিয়েছে পৃথিবীর প্রথম নগরী নিনেভ (Nineveh) শাতীল আরবের তীরে। নিনেভ ধ্বংস হয়েছে আবার গড়ে উঠেছে নেবুচাদনেজরের হাতে (Nebuchadnazar)। ইস্তার (Ishtar)-এর ফটকের অদূরে মাড্রুক (Madruk)-এর মন্দির সাগিলার (E-Sagila) কাছের টাওয়ার অব ব্যাবেল আজ হয়েছে নির্বাক। মেডিস (Medes) নৃপতি সাইরাস রয়েছে বাইবেলের পাতায় আর সিকন্দর শাহ্ (Alexandar the great) রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। দামাস্কাস থেকে রাজধানী উঠিয়ে নিয়ে এসেছিলেন বাগদাদে খলিফ মনসুর। তারপরে হারুন-অল-রশীদের কালে গড়ে উঠেছে বাগদাদ ঐশ্বর্যে, বৈভবে আর ঐতিহ্যে। হারুন-অল-রশীদের রাজপ্রাসাদে ঘোরাফেরা করেছে ৮০ হাজার ভৃত্য আর প্রকাণ্ড দরবারে স্বর্ণবৃক্ষের ডালের ওপর বসেছে মণি-মুক্তাখচিত স্বর্ণপক্ষী। ছদ্মবেশে রাতের পর রাত হারুন-অল-রশীদ ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রজাদের সুখ-দুঃখের সংবাদ জানতে।

তারপর হারুন-অল-রশীদও গিয়েছেন আর তুর্কীরা রাজত্ব

করেছে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত। ইরাক হয়েছে স্বাধীন। Changeless East-এ অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আজ ইরাকে এসেছে বাগদাদ প্যাক্ট, এসেছে মাইলের পর মাইল তেলের পাইপ, আরো অনেক কিছু, কিন্তু তবুও বাগদাদের অলি-গলিতে আর টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস-এর বালুতীরে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া উঁকি মারে। সামারার স্বর্ণ মসজিদ, কুর্ণার কাছে এজরার নীল গম্বুজের Tomb, হারুন-অল-রশীদের প্রিয়তমা জুবেদার সমাধি, Ctesiphon-এর arch স্মরণ করিয়ে দেয় পুরানো ইরাককে। নেনেভের কোলে রয়েছে আলীর সমাধি আর এখনো হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ শিয়া মুসলমান কারবালায় গিয়ে 'হাসান-হুসেন' বলে ছাতি চাপড়ায় হুসেনের হত্যার দুঃখে। প্রাচীন আর নতুনের মাঝে সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইরাক আর তার রাজধানী বাগদাদ।

টাইগ্রীস নদীর উপর রয়েছে দুটো ব্রীজ—নতুন আর পুরানো বাগদাদের মাঝে সেতুর মতো। এপারে ধ্বংসপ্রায় পুরানো বাগদাদ, আর ওপারে সিমেণ্ট, অ্যাসফল্ট আর কনক্রীটের তৈরি নতুন বাগদাদ। কিছু দূরেই রয়েছে বিরাট ফটক আর রাজা ফৈজালের প্রাসাদ—রাস্তার নাম 'নতুন রাস্তা' (New Street)। পুরানো বাগদাদে হারুন-অল-রশীদের সময় নাকি একটা লম্বা রাস্তা রূপো দিয়ে মোড়া ছিল। আরো আগে গিয়ে পড়তে হবে বাগদাদের বাজারে। খোলা হাওয়ায় সাজানো কফির অঢেল দোকান। মাঝে মাঝে বাজারের দিন দূর দূর গাঁ থেকে এখনো উটের পিঠে বা গাধায় চড়ে সওদাগররা আসে বাগদাদের বাজারে ব্যবসা করতে। এছাড়া ভিখারী, হাতুড়ে ডাক্তার, জ্যোতিষী, আর letter writer-দের ভিড় তো আছেই।

ইংরেজ লেখক ই. এস. ফারগুসন বাগদাদের বাজারের হাতুড়ে ডাক্তারদের নিয়ে বেশ একটা মজার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একদিন বাজারে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক হাতুড়ের দোকানের সামনে ভিড় দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েন। হাতুড়েকে দেখে তাঁর মনে হয়, কোথাও না কোথাও একে তিনি দেখেছেন। হঠাৎ

খেয়াল হলো কিছুদিন আগে এই লোকটাই তাঁর বাড়িতে চাকর ছিল। হাতুড়ের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, একের পর এক রোগী দেখে যায় আর একটা বই খুলে এ-পাতা ও-পাতা নেড়ে আলমারি থেকে ওষুধ বের করে। ফারগুসন সাহেব বইটার দিকে ভালো করে নজর দিয়ে আবিষ্কার করেন যে, সেটা একটা ইংরিজী নভেল, যা তাঁর লাইব্রেরীতে কিছুদিন আগে ছিল।

ইরাকে ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট শুরু হয় ১৯২০ সালে আর শেষ হয় ১৯৩২ সালে। অন্যান্য আরব দেশের তুলনায় ইরাকে বিদেশী রাজত্ব কম দিনই ছিল, কিন্তু যত ইংরেজ-বিদ্বেষ ইরাকে পুঞ্জীভূত হয়েছিল, অন্য জায়গায় তা হয়নি। ১৯৪১ সালের রশীদ আলীর Pro-axis coup, আর হাব্বানায় ব্রিটিশ এয়ার-বেস দখল ইংরেজ-বিদ্বেষেরই প্রতিক্রিয়া। বাগদাদে ব্রিটিশবিরোধী হাঙ্গামা আর ১৯৪৮ সালে পোর্টসমাথ্ চুক্তি সই করার পর সালেহ্-জবার গভর্নমেণ্টের 'ব্যাটল অব ব্রিজ'-এ পতনও সেই একই কারণের নিদর্শন দেয়। রশীদ আলী আর তাঁর 'Golden Square' দলের পতনও শীঘ্রই হয়, কিন্তু ইরাকে শান্তি তো দূরে থাক, স্থায়ী কোনো গভর্নমেণ্টেরও পাত্তা ছিল না। দু'বছর পর যখন জেনারেল নূরী-এ-সইদ প্রধান মন্ত্রী হন, তিনি কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনেন। ১৯২২ থেকে ১৯৪৯—এই ২৭ বছরে ইরাকে ৩৫টা গভর্নমেণ্টের পতন হয়েছে।

শিয়া, সুন্নী, কুর্দীশ, অতাসিরিয়ানদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, টাইগ্রীসের বন্যা, ধনী শেখদের অত্যাচার আর নানা-প্রকার রাজনৈতিক কুচক্রে পড়ে ইরাকের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও সঙ্গীন ছিল অনেকদিন। এখনো যে খুব ভালো আছে, তা বলা যায় না, তবু আগের চেয়ে অনেক ভালো। বাইশ বছরের যুবক রাজা ফৈজাল দ্বিতীয়, নয়া জমানার লোক, বিদেশে শিক্ষিত আর জনপ্রিয়। পয়গম্বর মহম্মদের বংশধর বলে দাবি করে ইরাকের হাশেমী রাজবংশ আর তাই রাজবংশের প্রতিপত্তি অগাধ।

মিডিল ইস্টের রাজনীতিতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ইরাকের প্রধান মন্ত্রী নূরীপাশার প্রভাব কম হয়নি। আজ

প্রায় ৩০ বছর হতে চললো নূরীপাশা ইরাকের রাজনীতিকে পরিচালনা করছেন প্রায় নিজের ইচ্ছামতো। মাঝে মাঝে হয়তো তাঁকে কিছু দিনের জন্যে রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে হয়েছে—কিন্তু যখনই আবার ফিরে এসেছেন তাঁর শক্তি বেড়েই গিয়েছে। আজকের ইরাকে ডেমোক্রেসীর পাত্তা পাওয়া যাবে না কারণ নূরীপাশা রাজ্য চালনা করেন 'আয়রন হ্যাণ্ডে'। কিন্তু মিশর, সিরিয়া আর অন্যান্য দেশে যা হয়েছে বা হচ্ছে বেশি দিন হয়তো ইরাক সেই প্রবাহ থেকে দূরে থাকতে পারবে না।*

জন থমাস রাজনীতির ধার ধারে না। খায়-দায় আপিস যায়, মেয়েদের 'ডেট' (Date) করে, নাইট ক্লাব আর 'বার' ঘুরে বেড়ায় আর মাঝে মাঝে গর্ব করে নিজেকে আরব বলে। দুই ছেলের নাম রেখেছে গালীব আর জাফর। গালীব উচ্চারণ করে 'ঘালিব'। যখন ওকে জানাই যে, গালীব আর জাফর হিন্দুস্তানের দুই বিখ্যাত কবি, ও ভীষণ খুশি। ওর স্ত্রী টার্কীর মেয়ে, লুইসা।

সেদিন জনের সঙ্গে গেলাম মিসেস মিলারের বাড়ি। অ্যান মিলারের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল 'টরাস এক্সপ্রেসে'। রাত দুটোয় আমার কম্পার্টমেণ্টে এসেছিলেন সিল্কের নাইট-গাউন পরে, "for a game of bridge and a round of drinks"। জন প্রথম থেকেই মিসেস মিলারকে দেখতে পারে না। কেন জানি না ভীষণ রাগ ওর উপর। মিসেস মিলারের নাইট-গাউন পরা ফিগার দেখে যখন বলেছিলাম, "শী লুকস্ কিউট উইথ দ্যাট ড্রেস" জন জবাব দিয়েছিল, "শী উইল লুক কিউটার উইদাউট ওয়ান।"

বাগদাদে ব্রিটিশ এম্ব্যাসীর এক বড় কর্তার স্ত্রী মিসেস মিলার। আমাকে আর জনকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ডিনারে। একে ইংরেজ তায় এম্ব্যাসীর বড়কর্তার স্ত্রী। আমি আর জন ডিনার জ্যাকেট পরে সভ্য হয়ে তাঁর বাড়িতে গেলাম। খবর

* নূরীপাশা কিছুদিন আগে পদত্যাগ করেছেন। নূতন প্রধানমন্ত্রী এসেছেন ইরাকে। শোনা যাচ্ছে নূরীপাশা আবার শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী হবেন।

পাঠাতে চাকর এসে অপেক্ষা করতে বললো। প্রায় ১৫ মিনিট অপেক্ষা করছি মিসেস মিলারের পাত্তা নেই। জনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপার কি হে ?"

গম্ভীরভাবে জন জবাব দিলো "শী মাস্ট বি স্ট্রিপিং ফর ডিনার" (She must be stripping for dinner)। অনায়াসে কথাটা বলে জন তার ব্যাখ্যা শুরু করলো "আজকালকার দিনে ডিনারের সময় পুরুষরা এন্তার কাপড়জামা পরে আর মেয়েরা করে মিতব্যয়িতা। তাই "মেন ড্রেস ফর ডিনার অ্যাণ্ড উইমেন স্ট্রিপ ফর ডিনার।"

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন মিসেস মিলার। "কাম, লেট আস হ্যাভ এ গেম অব ব্রীজ অ্যাণ্ড এ রাউণ্ড অব ড্রিঙ্কস্।"

"আই উইল স্কীপ ওভার দী ব্রীজ অ্যাণ্ড হ্যাভ দী ড্রিঙ্ক ইনস্টেড" জন নির্বিকারভাবে বলে।

হাসিখুশিতে সেদিন রাত বারোটা পর্যন্ত মিসেস মিলারের ডিনারে সময়টা কেটে গিয়েছিল। বাগদাদে আমার সেই শেষ রাত। পরদিন সকালে শুরু করবো আবার যাত্রা। জন কেবলই উঠি-উঠি করছে কিন্তু মিসেস মিলারের আগ্রহে 'অ্যানাদার রাউণ্ড' করতে করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাগদাদের 'নাইট-লাইফ' দেখাবার লোভ দেখাচ্ছে জন—"ওহ্ ওয়াণ্ডারফুল মিউজিক্, ওয়াণ্ডারফুল গার্লস অ্যাণ্ড ওয়াণ্ডারফুল ড্যান্সেস।" কিন্তু মিসেস মিলার আর গুড-নাইট করতে দিচ্ছেন না।

জন আর শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে উঠে পড়লো। "অল রাইট, হ্যাভ ওয়ান ফর দি রোড" আবার আগ্রহ জানান মিসেস মিলার।

"নো থ্যাঙ্কস্। দিস টাইম ইট উইল বি ওয়ান ফর দি ডীচ" আমাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এল জন। বাগদাদ ছাড়ার আগে বাগদাদের 'নাইট-লাইফ' দেখাবে আমায়। "ওয়াণ্ডারফুল মিউজিক, ওয়াণ্ডারফুল গার্লস আর ওয়াণ্ডারফুল ড্যান্সেস" দেখতে ঢুকলাম নাইট ক্লাবে। থাউজাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়ান নাইটস্-এর বাগদাদে আমার ফোর্থ অ্যাণ্ড লাস্ট নাইট।

চৌদ্দ

১০৯, খৈবান্ কাখ্ স্ট্রীট।

তেহ্‌রানের 'অ্যারিস্টোক্রেটিক' পাড়ার দু'পাশে গাছের সারি দেওয়া রাস্তার এক প্রান্তে দোতলা একটা বিরাট বাড়ি। সামনে সবুজ রং-এর লোহার 'গ্রিল' ফটক। ফটকের ডানদিকে ছোট্ট একটা নেম-প্লেট—'ডক্টর মহম্মদ মোসাদেক'। কিছুদূরেই 'গুলিস্তান'—হিজ ইম্পিরিয়াল ম্যাজেস্টি মহম্মদ রেজা শাহ পহ্লভীর প্রাসাদ।

অনেকবার কাখ্ স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছি। ১০৯ নম্বরের সামনে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়েছি। দোতলার ডানদিকের একটা স্বল্পপরিসর ঘরের জানলার পাতলা সবুজ পর্দার মধ্যে দিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আলোর প্রকাশও দেখতে পেয়েছি।

একদিন সে কামরায় ঢোকবার আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল। ছোট্ট কামরা বারো বাই চৌদ্দ। দেয়াল ঘেঁষে তিনটে আলমারি। অদূরে জানলার কাছে লোহার স্প্রিং-এর একটা খাট। খাটের ডানদিকে কাঁচ দেওয়া কালো টেবিলের উপর ৪টা টেলিফোন, তিনটে ওষুধের শিশি আর প্লেটের উপর রাখা কিছু বাদাম। খাটের উপর নীল চাদর দিয়ে ঢাকা পাতলা তোশক। বাদামী রং-এর নাইট পাজামা আর স্পোর্টস-জ্যাকেট পরে আধা-শোওয়া আধা-বসা অবস্থায় ডাঃ মহম্মদ মোসাদেক। কোলের কাছে নতুন ফুলের মতো তিন বছরের নাতনী মাসোমা। মৃদু হেসে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। সঙ্গের একদল মার্কিনী আর ইংরেজ খবরের কাগজওয়ালারা নিজেদের মধ্যে চোখ টেপাটেপি করে ফিস্ ফিস্ করে বললো 'ঢং'।

১০৯, খৈবান্ কাখ্ স্ট্রীটের দোতলা বাড়ির আজ অস্তিত্ব

নেই বললেই চলে। ইম্পিরিয়াল বডি গার্ডস-এর কর্নেল নাসিরী জীপ দিয়ে ধাক্কা মেরে ফটকের থাম ভেঙে দিয়েছেন। 'ডাঃ মহম্মদ মোসাদেক' লেখা ছোট্ট নেম-প্লেটটা জীপের টায়ারের তলায় গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। দোতলার ডানদিকের স্বল্পপরিসর ঘরের জানলার পাতলা সবুজ পর্দার ভিতর দিয়ে আর আলোর প্রকাশ রাস্তায় এসে পড়ে না। বিরাশী বছরের বৃদ্ধ মোসাদেক আজ তেহ্‌রান থেকে অনেক দূরে আরেকটা ছোট্ট বাড়িতে বসে পিছনে ফেলে আসা কর্মবহুল জীবনের কথা ভাবেন। মাঝে মাঝে যেতে চান সুইজারল্যাণ্ডে কিন্তু আবার দেশ ছেড়ে যাবার কথা ভেবে কেঁদে দু'চোখ ভাসিয়ে দেন। এর আগে দীর্ঘ তিন বছরের উপর কেটে গিয়েছে তেহ্‌রানের এক অভেদ্য দুর্গে।

পনেরো মিনিট পরে খবরের কাগজের রিপোর্টারদের দল ফিরে এসেছে। মাসোমার সোনালী চুল নিয়ে খেলা করতে করতে বৃদ্ধ মোসাদেক কখনও কখনও চেঁচিয়ে উঠেছেন উত্তেজনায়—"হাউ মেনী টাইমস উইল ইউ আসক্ দি সেম কোশ্চেন। দেয়ার ইজ নো গোয়িং ব্যাক অন দি কোশ্চেন অব ন্যাশনালাইজেশন"—ইংরেজ সাংবাদিককে ভর্ৎসনা করে ওঠেন।

"বাট্ মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, রিসেণ্টলী ইন দি হাউস অব কমন্স..."

"আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড ইন হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ইওর হাউস অব কমন্স।"

কালো টেবিলের কাঁচের উপর শীর্ণ হাতটা চাপড়ান মোসাদেক—"ইরান উইল গো ডাউন ফাইটিং ইফ নীড বী"। ছেলে ডাঃ গুলাম মোসাদেক এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমাদের বাইরে যেতে বলেন। গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে আসে সবাই। পিছনে ফিরে একবার তাকালাম। মৃদু হাসলেন বৃদ্ধ, "ইউ ডিড নট আসক্ মী এনি কোশ্চেন?"

"আই হ্যাভ গট মাই রিপ্লাইজ অল দি সেম"।

ছোটো শিশুর মতো হেসে উঠলেন বৃদ্ধ। সেই হাসি

এখনও মাঝে মাঝে কানের কাছে ভাসে। প্রথম আর বোধহয় শেষবারের মতো ডাঃ মোসাদেকের সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকার আমার স্মৃতিপটে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

খবরের কাগজের হেডিং-এ প্রায়ই থাকে 'হেল লেট লুজ' (Hell let loose)। কিছুদিন পরে তেহ্‌রানে 'হেল লেট লুজ' হয়েছিল। একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয় সে ক'দিন। তিনদিনের মধ্যে দু'কোটি লোকের ভাগ্য নির্ণয় যে এমনি-ভাবে হয়ে যাবে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। ঝানু ব্রিটিশ আর আমেরিকান সাংবাদিকরা মাথা চুলকোয়। প্যাট্ আমাকে বললো যে, সে আশাও করেনি এমনটা হতে পারে। আমেরিকার বিখ্যাত সংবাদপত্রের প্রতিনিধি প্যাট্। অনেক কিছুই দেখেছে আর শুনেছে। কিন্তু হঠাৎ এমন ব্যাপার হবে—"নো! নো! আই কাণ্ট থিংক অব ইট"। প্যাট্ কমিউনিস্ট না, জোসেফ মাকার্থীও আন-আমেরিকান কমিটিতে বসে প্যাট্‌কে এই সার্টিফিকেট দিতে পারতেন। কিন্তু আমার মতো প্যাট্‌ও মোসাদেককে ভালোবেসেছিল। ইরানের অনেক লোকের মতো প্যাট্‌ও ডাঃ মোসাদেককে পিদ্দার-ই-মিল্লাৎ (জাতির জনক) বলে ডাকতো।

"আই টেল ইউ ওল্ড্ বয় ইফ্ সামথিং হ্যাপেন্স টু দি পিদ্দার-ই-মিল্লাৎ, ওয়েল নেমেসিস অ্যাণ্ড ডিল্যুজ উইল ডিসেণ্ড অন দিস ল্যাণ্ড অব খৈয়াম অ্যাণ্ড সাদী।"

(I tell you old boy if something happens to the Pidder-i-Mallat, well nemesis and deluge will descend on this land of Khayyam and Saddi).

পার্ক হোটেলের লাউঞ্জে হুইস্কি সিপ্ করতে করতে প্যাট্ সেদিন আমায় বলেছিল। প্যাটের কথা এখনও ফলেনি। অর্থাৎ ইরানে ডিল্যুজ আর নেমেসিস্ আসেনি। কিন্তু পিদ্দার-ই-মিল্লাৎকে ফাঁসি কাঠে চড়াতেও হিজ ইম্পিরিয়াল ম্যাজেস্টি মহম্মদ রেজা শাহ পহ্লভীর সাহস হয়নি।

গভীর রাতে সেদিন সেই গোলমালের মধ্যে প্যাট্ আমাকে বর্ডারে পৌঁছে দিয়ে এসেছে মোটরে করে। তেহ্‌রানের রাস্তায়

রাস্তায় তাণ্ডব নৃত্য হচ্ছিল। পচা একরাশ মৃতদেহের পাশ কাটিয়ে আসবার সময় স্টীয়ারিং হুইল ছেড়ে প্যাট্ নাক ঢেকেছিল রুমাল দিয়ে। আমাকে পৌঁছনোর দায়িত্ব ছিল প্যাটের উপর। আমাকে নিয়েও এসেছিল প্যাট্। সব কিছু আজ খুলে বলতে পারবো না, কারণ তাতে ব্যাপারটা একটু ঘুলিয়ে উঠবে। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমার ভিসার গোলমাল ছিল আর তা থেকে আমায় উদ্ধার করে প্যাট্। হয়তো তেহ্রানে বিপদের মধ্যে পড়তাম কিন্তু তেহ্রানের বুকে যখন 'হেল লেট লুজ' হলো তখন কার মাথাব্যথা ছিল যে, কোন্ লোকের ভিসা আছে বা নেই। যাক সেসব কথা। দু'দিন পরেই আমি রোমে।

তেহ্রানের রাস্তায় রাস্তায় সে রাতে আগুন জ্বলেছিল। শাহেনশাহ্ মহম্মদ রেজা শাহর পিতা রিজা শাহর কবর খুঁড়ে উপড়ে ফেলেছিল জনতা। শাহেনশাহর বিরাট ব্রোঞ্জ স্ট্যাচু গড়াচ্ছিল তেহ্রানের রাজপথে ধুলোর উপর। জেনারেল ফতেমীর সঙ্গে ক্রুদ্ধ জনতা তখনও চেঁচাচ্ছিল 'টু দি গ্যালোজ উইথ দি ইয়ং শাহ' (শাহকে ফাঁসি দাও)। পরের দিন সকালে শাহেনশাহ মহম্মদ রেজা শাহ পহ্লভী, মালকা-য়ে-আলম রাণী সোরায়াকে নিয়ে নিজের প্লেনে পালালেন বাগদাদ আর বাগদাদ থেকে রোম। মাঝ রাস্তায় রাণী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন—"আমার লাল গোলাপ ?"

"লক্ষ্মীটি কেঁদো না, তোমার গোলাপ তোমায় আমি এনে দেবো", সান্ত্বনা দিলেন শাহ।

"শোল ওয়া শোমা—শান্তিময় হও তুমি—" জেনারেল ফজলোল্লা জহেদীর গ্রানাইট পাথরের মতো মুখের এক কোণে একটু হাসির ঝিলিক খেলে গেল। "ইউ সি দি টেবলস আর টার্নড"।

বহুকাল পরে মুখোমুখি হলেন সেদিন ডাঃ মহম্মদ মোসাদেক আর জহেদী। শ্লথ পদে, ক্লান্ত, শ্রান্ত মোসাদেক এগিয়ে এলেন। মুহূর্তের জন্য দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় হলো। দু'পাশে সঙ্গীন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিলিটারীর লোকেরা। তেহ্রান অফিসারস্ ক্লাবের বিরাট আপিস কামরায় মোসাদেকের অস্পষ্ট কথাগুলো

শোনা গেল না। জহেদী ইশারা করলেন আর পরক্ষণেই সশস্ত্র সৈনিকরা মোসাদেককে নিয়ে গেল তেহ্‌রান থেকে অনেক দূরে এক অভেদ্য দুর্গে—বন্দী হলেন পিদ্দার-ই-মিল্লাৎ দেশদ্রোহিতার অভিযোগে।

মাত্র সাতদিনের মধ্যে ইরানের ইতিহাসের গতি ঘুরে গেল। ইতিহাসের গতি ইরানে আগেও অনেকবার ঘুরেছে কিন্তু এমন নাটকীয় পরিস্থিতির সামনে ইতিহাসকে আগে আর দাঁড়াতে হয়নি।

মোসাদেক আর শাহর সংঘর্ষ শুরু হয় অনেক আগেই যখন মোসাদেক শক্তিশালী অ্যাংলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানীর আবাদান রিফাইনারীর জাতীয়করণ ঘোষণা করেন। ছোটো-খাটো বিরোধ থেকে ব্যাপারটা দাঁড়ায় ঘোরালো হয়ে। শাহ হঠাৎ একদিন চাল চাললেন যে, তিনি শরীর সারাতে ইউরোপ যাবেন। ইরানের মজলিসের স্পীকার মুল্লা আতাউল্লা কাশানী ভাবলেন, এই সুযোগ। মোসাদেককে না জানিয়ে মজলিসের গুপ্ত সভায় পাশ করালেন প্রস্তাব “আমাদের প্রিয় নৃপতি যেন এই সময় রাজ্য ছেড়ে না যান”। এর পরে পাঠালেন ক্রুদ্ধ জনতাকে শাহর প্রাসাদে। জনতা ‘মোসাদেক মুর্দাবাদ’ চিৎকার করতে করতে দাঁড়ালো ফটকের সামনে। মহম্মদ রেজা শাহ এলেন ব্যালকনীতে। জনতাকে বললেন, তারা যদি না চায় তিনি রাজধানী ছেড়ে যাবেন না। এবার জনতা ছুটলো মোসাদেকের বাড়ির দিকে। মোসাদেক পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিলেন মজলিসে আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাবী জানালেন তাঁর প্রতি আস্থার প্রস্তাব। কাশানীকে বরখাস্ত করে মজলিস ভেঙে দিয়ে চাইলেন শাহর হস্তাক্ষর। শাহ বললেন, “না”। “বহুৎ আচ্ছা। জনতা স্বাক্ষর করবে” বলে মোসাদেক বেরিয়ে গেলেন। হুকুম দিলেন প্লেবিসাইটের। ফল ঘোষণা হলো—মোসাদেকের পক্ষে ১৭ লাখ আর তাঁর বিরুদ্ধে ৯০০ ভোট। সে রাতে ইম্পিরিয়াল গার্ডসের কমাণ্ডেন্ট কর্নেল নাসিরী আক্রমণ করলেন ১০৯ নম্বর খৈবান্ কাখ্ স্ট্রীট। জীপের ধাক্কায় ভেঙে দিলেন লোহার গেট। মোসাদেকের

অনুরক্ত সৈন্যেরা পরাজিত করলো নাসিরীকে। পরের দিন সকালে শাহ পালালেন রোমে। পালাবার আগে পদচ্যুত করলেন মোসাদেককে আর ফার্মান জারী করে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন জেনারেল ফজলোল্লা জহেদী। এবার জহেদী নিজে আক্রমণ করলেন ১০৯, খৈবান কাখ্ স্ট্রীট। Coup সার্থক হলো। মোসাদেক আবার পালালেন পিছনের দরজা দিয়ে। চারদিন পরে অনিদ্রায় অনাহারে ক্লান্ত মোসাদেক তেহ্‌রান অফিসার্স ক্লাবে আত্মসমর্পণ করলেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু জহেদীর কাছে। হেসে জহেদী বললেন, "শোল ওয়া শোমা"। দু'দিন পরে ২০ জন জার্নালিস্ট সঙ্গে নিয়ে শাহ ফিরে এলেন তেহ্‌রানে। এরোড্রমে জেনারেল জহেদী তাঁর অনুরক্তি দেখালেন মাটিতে লুটিয়ে শাহ'র পদচুম্বন করে। ১৪ই আগস্ট ১৯৫৩ থেকে ২১শে আগস্ট ১৯৫৩। ৭ দিনের মধ্যে ২ কোটি লোকের ভাগ্যের লেখা অন্যরকম হয়ে গেল।

ইরানের এই সাতদিনের ওলট-পালটকে আমি নাটক বলি। নাটকের মতোই এতে রয়েছে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, সাসপেন্স, ব্যাকড্রপ, নাটকীয় পরিস্থিতি আর মুহূর্ত। এই নাটকের 'ড্রামাটিস পারসনে' অনেকে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রধান তাঁরা হচ্ছেন—ডাঃ মোসাদেক, হিজ ইম্পিরিয়াল ম্যাজেস্টি মহম্মদ রেজা শাহ পহ্লভী, হার ইম্পিরিয়াল ম্যাজেস্টি রাণী সোরায়া পহ্লভী, জেনারেল ফজলোল্লা জহেদী, মুল্লা আতাউল্লা কাশানী, জেনারেল হুসেন ফতেমী আর শাহেনশাহর অনুজা আশরফ। কিছু বিদেশী রাজদূতাবাসেরও দান আছে এই নাটকে, কিন্তু তা নেপথ্যে।

ফ্রান্সে কানুন পড়তে গিয়েছিলেন যুবক মোসাদেক কিন্তু ফিরে এলেন সুইস ইউনিভার্সিটি থেকে রাজনীতিতে ডক্টরেট নিয়ে। চাকরি পেলেন ইরানের অর্থনীতি বিভাগে আর তারপর মজলিসের ইকনমিক এক্সপার্ট কমিটির মেম্বার হলেন। ফারাসের গভর্নর থাকার পর মোসাদেক হলেন ইরানের বিদেশী মন্ত্রী কিন্তু কিছুদিন পরেই ইস্তফা দিলেন। রেজা শাহর হুকুমে তাঁকে বন্দী করা হলো। ছাড়া পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ১২ বছরের জন্য

নির্বাসিত হলেন। রেজা শাহকে যখন 'ডিপোজ' করা হয় মোসাদেক ফিরে এলেন তেহ্‌রানে। তখন থেকেই শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস আর নতুন শাহর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ। শাহর নামে মজলিসে শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। "জনতার নামে আমি শপথ গ্রহণ করবো" বললেন মোসাদেক। রাশিয়াকে যখন প্রধানমন্ত্রী গোভাম সুলতানাহ্‌ 'অয়েল কনশেসন' দেন মোসাদেক ইরানী মজলিসকে 'ডেন অব ক্রুকস' (Den of Crooks) বলে অভিহিত করলেন।

ইরানের উপর বিপদ ঘনিয়ে এল ১৯৫১ সালে। সেদিন শুক্রবার। তেহরানের শাহী মসজিদে নমাজের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী জেনারেল আলী রাজমারার অপেক্ষায় সবাই বসে রয়েছে। রাজমারার মোটর থামলো মসজিদের সামনে। দেরী হয়ে গিয়েছে ভেবে জেনারেল তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। জনতার ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা লোক সামনে এসে দাঁড়ালো। রাজমারা হাত বাড়িয়ে দিলেন অভিবাদনের অভিপ্রায়ে।

গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম—

প্রার্থনা গৃহের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে পিস্তলের তিনটে আওয়াজ—জেনারেল আলী রাজমারা লুটিয়ে পড়লেন। শাহী মসজিদের শুভ্র মার্বেলের সিঁড়ির উপর গড়িয়ে পড়লো লাল রক্ত। মুল্লা আতাউল্লা কাশানীর প্রেরণায় গড়া 'ফাদাইল-ইসলাম' দলের সদস্য কামলিল্‌ তানাসভেবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ক্রুদ্ধ জনতা। পুলিস এসে বাঁচালো হত্যাকারীকে। পরে মজলিস তাকে ছেড়ে দিলো আর রাস্তায় রাস্তায় কাশানীর ভক্তেরা অভ্যর্থনা জানালো কামলিল্‌কে। (পরে ১৯৫৬ সালের ১৮ই জানুয়ারী কামলিলের মৃত্যু হয় তেহ্‌রানের ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে।) হোসেন আলী হলেন নতুন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর উপরেও হত্যার প্রচেষ্টা হলো। বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা ছেয়ে গেল ইরানে। এমন সময় জনতার দাবী উঠলো ডাঃ মোসাদেককে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করার জন্যে।

শাহ ভয় পেলেন। তিনি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

একজন ব্রিটিশ সাংবাদিককে বললেন, "মোসাদেক ? হি ইজ এ লুনাটিক"। তেহ্‌রানের রাজপথে আবার শুরু হলো জনতার বিক্ষোভ। শাহ হার মানলেন আর মোসাদেক হলেন প্রধানমন্ত্রী—২৯শে এপ্রিল, ১৯৫১।

কিছুদিন পরেই পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে মোসাদেক আবাদানের অ্যাংলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানীর অবসান ঘটালেন। অর্ধ শতাব্দী আগে উইলিয়াম নক্স্ ড'আর্চি (William Knox D'Arcy) পেয়েছিলেন আবাদান রিফাইনারীর মনোপলী, 'জাস্ট ফর এ সঙ্গ'। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পায়া টলতে লাগল। শাহ আবার ভয় পেলেন। মজলিসের ১৩৬ জন সভ্যের মধ্যে মোসাদেকের সমর্থনকারীদের সংখ্যা মোটে সাতজন কিন্তু মজলিসে মোসাদেকের জয় হলো। কম্পিত হস্তে শাহ দস্তখত করলেন 'এ. আই. ও. সি'র ডেথ ওয়ারেন্ট। তেহ্‌রানের রাস্তায় রাস্তায় জনতার জয়ধ্বনি উঠলো। মজলিসে শাহ্‌র স্বাক্ষরিত ডিক্রি নিয়ে ঢুকলেন মোসাদেক। ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন ডিক্রি। চোখের জলে ভেসে গেল ডিক্রির লেখা। আনন্দের আতিশয্যে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন মোসাদেক। প্রেস গ্যালারী থেকে বিদেশী সাংবাদিকরা মন্তব্য করলো, "এ ট্রিক অব ওল্ড মসি টু এক্সাইট দি পিপ্‌ল্"।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট জানালেন, আপোস-মীমাংসার প্রস্তাব। 'নো' মোসাদেক বললেন। আন্তর্জাতিক কোর্টে ছুটলেন ব্রিটিশ সরকার কিন্তু লাভ কিছুই হলো না। আবাদান থেকে ইংরেজ পরিবারদের সরানো হলো। পারস্য উপসাগরে এবার ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট পাঠালেন যুদ্ধ জাহাজ, সাইপ্রাসে নামলো অসংখ্য প্যারাট্রুপারস।

১০৯ খৈবান কাখ্ স্ট্রীটের দোতলার ছোট্ট ঘরে মোসাদেক ডাকলেন সাংবাদিকদের "if a single bullet is fired from the British Rifle the third war will start." হ্যারী ট্রুম্যানের প্রিয়পাত্র অভারেল হ্যারীমান লণ্ডন থেকে লর্ড প্রিভীসীল সার রিচার্ড স্টোকসকে নিয়ে ছুটলেন তেহ্‌রানে। "Accept nationalisation and then I will talk"

বললেন মোসাদেক। আবার ১০৯ খৈবান কাখ্ স্ট্রীটে বৈঠক বসলো।

'এ. আই. ও. সি'র অন্তত ম্যানেজিং এজেন্সী থাক'—স্টোকস্ দাবী জানালেন।

"না"—মোসাদেক টেবিল চাপড়ালেন।

"অন্ততপক্ষে ব্রিটিশ জেনারেল ম্যানেজার"—স্টোকস্ মিনতি করলেন।

"না"—মোসাদেকের দৃঢ়স্বর ছোট্ট দোতলার ঘরে গর্জে উঠলো। "অল্ ব্রিটিশ টেকনিশিয়ান্স মাস্ট কুইট উইদইন ফোর ডেজ।" (All British technicians must quit within four days).

হতাশ হয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ছুটলেন ইউ. এন. ও-তে। বৃদ্ধ মোসাদেক চললেন নিজের দেশের পক্ষ সমর্থন করতে। স্তম্ভিত হয়ে সারা পৃথিবী শুনলো মোসাদেকের সেই তিন ঘণ্টার অপূর্ব ভাবণ।

দেশে ফিরে মোসাদেক এশিয়ার সমস্ত দেশকে আবেদন জানালেন ইরানের তেল নেবার জন্যে। শুরু হলো বিদেশী রাজদূতাবাসগুলিতে চক্রান্ত। সবাই জানালো, তেল নিতে তো রাজী আছি কিন্তু ট্যাঙ্কার কোথায়। আবাদানে লক্ষ লক্ষ টন তেল পড়ে রইলো। হাজার হাজার ইরানী কর্মচারী হলো বেকার। ট্রেড ব্যালান্স-এর অবস্থা শোচনীয়। এক কোটি কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানির আয় আর চার কোটি পাউণ্ড আমদানীর ব্যয়। ধীরে ধীরে নিশ্চিত দেউলিয়া হবার অভিমুখে চললো ইরান।

মোসাদেকের তখন নেশা ধরেছে, ইরানকে রিপাবলিক করবেনই। রাতে স্বপ্ন দেখেন শাহ্'র রাজত্বের অবসান, খবর নেন মিশরে জেনারেল নগীব কি করছেন। শাহকে বললেন, যুদ্ধ-মন্ত্রী নিযুক্ত করার ক্ষমতা থাকবে "আমার আর মজলিসের"। শাহ বললেন, "না"। মোসাদেক করলেন পদত্যাগ আর ফিরে এলেন আবার তিনদিন পরে। সেই তিনদিন আবার তেহ্রানের বুকে 'হেল ল্লেট লুজ' হয়েছিল। 'শাহ মুর্দাবাদ' আর 'মোসাদেক

জিন্দাবাদ' শ্লোগানে মুখরিত হলো সারা রাজধানী। জনতার ভিড় ছুটলো মোসাদেকের বাড়ি "পিদ্দার-ই-মিল্লাৎকে আমরা ফিরে পেতে চাই"।

নাতনী মাসোমাকে বুকে চেপে মোসাদ্দেক আবার শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। চোখের জলে ভেসে গেল তাঁর বাদামী রং-এর স্পোর্টস জ্যাকেট্।

'গুলিস্তান' রাজপ্রাসাদে শুরু হলো মন্ত্রণা—শাহ, আতাউল্লা কাশানী, জেনারেল ফজলোল্লা জহেদী, কর্নেল নাসিরী, শাহ'র অনুজা আশরফ আর রাজমাতা। মোসাদেক শাহকে বললেন, দেশ থেকে তাড়াতে হবে আশরফকে আর রাজমাতাকে। তারপরের ইতিহাস সুবিদিত—শাহ'র ইউরোপ যাবার ঘোষণা, কাশানীর মজলিসের গুপ্তসভার বৈঠক, মোসাদেকের প্লেবিসাইট, কর্নেল নাসিরীর Coup-এর প্রচেষ্টা, শাহ আর সোরায়ার পলায়ন, জেনারেল জহেদীর Coup, মোসাদেকের পলায়ন, তিনদিন পরে তেহ্‌রান অফিসার্স ক্লাবে জহেদীর সামনে আত্মসমর্পণ, শাহ'র প্রত্যাবর্তন, মোসাদেকের ট্রায়াল আর তিন বছরের কারাবাস।

মিলিটারী কোর্টের সামনে চিৎকার করে উঠলেন মোসাদেক, "দয়া আমি চাই না। দয়া আমি চাইনি। কোনো অন্যায় আমি করিনি। আমি দয়া চাই না, আমি ন্যায় চাই।"

গভর্নমেণ্ট প্রসিকিউটার দাবী জানালেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক 'দেশদ্রোহী মোসাদেককে'। কারণ ইরানের বিধানে দেশদ্রোহিতার জন্য আর কোনো শাস্তি নেই। একমাত্র শাহ ক্ষমা করতে পারেন তাঁকে।

"আমি ডাঃ মহম্মদ মোসাদ্দেককে ক্ষমা করলাম, প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম বছর তিনি যে দেশসেবা করেছেন তার বদলে। তাঁকে খুব কড়া শাস্তি যেন না দেওয়া হয়"—শাহ লিখে পাঠালেন কোর্টকে। "আমি চাই না দয়া।" মোসাদেক প্রতিবাদ করেন অযাচিত এই অনুকম্পায়।

পরের দিন সকালে ঘোষণা করা হবে বিচারের ফলাফল। গ্রে ফ্ল্যানেলের পাজামা, স্পোর্টস্ জ্যাকেট্ আর ড্রেসিং গাউন চড়িয়ে মোসাদেক এলেন বিচারকক্ষে। ড্রেসিং গাউনের 'কর্ড'

নিয়ে খেলা করতে করতে ওষুধ খেতে লাগলেন। কোর্টের সভাপতি পড়ছিলেন দীর্ঘ রায়। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই মোসাদেকের। এক ঘণ্টা পরে সভাপতি কম্পিত গলায় ঘোষণা করলেন, "রাজদ্রোহিতার ঘৃণ্য অপরাধের জন্য আমরা ডাঃ মোসাদেককে, শাহ'র ক্ষমার কথা মনে করিয়ে দিয়ে মাত্র তিন বছরের কারাবাসের হুকুম দিলাম"।

সারা কোর্টরুম স্তব্ধ। প্রায় ৫০ জন বিদেশী সাংবাদিক ছুটে বেরিয়ে গেল তাদের 'স্টোরী' ফাইল করতে। মোসাদেক একবার মুখ তুলে চাইলেন। তাঁর শরীরটা একটু কেঁপে উঠলো। একটা অবলম্বন পাবার জন্য তিনি রেলিংটা চেপে ধরলেন। চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়িয়ে পড়লো—"আমি, আমি তিন দিনের মধ্যেই মরে যাবো"। অজ্ঞান হয়ে পড়লেন তিনি কোর্টের মধ্যে।

'আনাদার চার্লি চ্যাপলীন্', প্রসিকিউটার টিপ্পনী কাটলেন। কোর্টের ভিড়ের গুঞ্জনের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠলো, 'মাশাআল্লাহ্'। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ২০ তারিখ।

১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসের ৪ তারিখ। সকাল। তেহ্‌রান থেকে খানিক দূরে মিলিটারী কোর্টের গেটের সামনে দাঁড়ালো একটা কালো রং-এর মোটর গাড়ি। বাদামী রং-এর স্পোর্টস জ্যাকেট, নাইট পাজামা আর ড্রেসিং গাউন পরে ফটক থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন ৮২ বছরের বৃদ্ধ ডাঃ মহম্মদ মোসাদেক। দীর্ঘ দু'বছর আট মাস পনেরো দিন কারাবাসের পর মুক্তি পেলেন তিনি। লাঠি ঠুকঠুক করে এগিয়ে এলেন। টাক পড়া মাথার চুলগুলোও সব সাদা হয়ে গিয়েছে—চোখের নিচে রয়েছে অনিদ্রার গভীর কালো ছাপ। গাড়ি থেকে নামলো ছেলে ডাঃ গুলাম মোসাদেক, পুত্রবধূ আর নাতনী মাসোমা। মাসোমা কত বড় হয়েছে! সেই দেখেছিলেন চার বছরের ছোট্ট একটা টুকটুকে মেয়েকে। এখন মাসোমার বয়েস সাত বছর। ছুটে গিয়ে বৃদ্ধ কোলে তুলে নিলেন মাসোমাকে। দু'চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। একজন মিলিটারী অফিসার এসে হাতে নতুন অর্ডার দেয়,

"তিনি যেন তেহ্‌রান শহরে না থাকেন আর রাজনীতিতে যোগ না দেন।" গাড়ি করে চলে গেলেন মোসাদেক তেহ্‌রান থেকে অনেক দূরে।

বাড়ি গিয়ে আরেকবার কেঁদে উঠেছিলেন মোসাদেক যখন জানতে পারেন যে, কর্নেল নাসের সুয়েজ ক্যানাল ন্যাশনালাইজ করেছেন। 'সাবাস নাসের' হয়তো বলেছিলেন। খবরের কাগজের রিপোর্টে ছিল যে, যখন মোসাদেক জানতে পারেন, সুয়েজ ন্যাশনালাইজেশনের কথা, তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। 'মাশাআল্লাহ'—বিড়বিড় করে বলেন। নগীব তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল, স্বপ্ন দেখেছিলেন ইরানকে 'রিপাবলিক' করার। কিন্তু নাসের তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করলো সুয়েজকে ন্যাশানালাইজ করে। কারাগৃহ থেকে মুক্তি পেয়ে এর চেয়ে বড় সুখবর মোসাদেক কল্পনাও করতে পারেননি।

প্যাট্ আমাকে বলেছিল, "মোসাদেক—হি ওয়ার্কস লাইক এ হর্স অ্যাণ্ড লিভস লাইক এ সেন্ট" (He works like a horse and lives like a Saint)। সেদিন রাতে তার সঙ্গে মোটরে যেতে যেতে মোসাদেক সম্বন্ধে অনেক কথাই প্যাট্ আমাকে বলেছিল। সেসব প্রায় রূপকথার কাহিনীর মতো। "মোসাদেক ইরানের ধনীদের মধ্যে একজন" প্যাট্ বলেছিল, "তাঁর নিজের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় রয়েছে পয়েন্ট-ফোর অ্যাডমিনিসট্রেশনের আপিস। মোসাদেকের প্রধান মন্ত্রিত্বের ২০০০ টাকা মাইনে আর বাড়ি ভাড়া সব তিনি দান করতেন যক্ষ্মা হাসপাতালে। তাঁর সম্পত্তির বেশির ভাগই তিনি দান করে দিয়েছিলেন এখানে ওখানে।"

"লোকে বলে" প্যাট্ হাসতে হাসতে জানায়, "মোসাদেকের কাছে মোটে একটা স্যুট ছিল। তিনি ওভারকোট দেখলেই চটে উঠতেন, কিন্তু দুটো ওভারকোট তাঁর কাছে ছিল। শীতের সময় তার মধ্যে থেকে একটা তিনি পরতেন, আর একটা পরতো তাঁর ড্রাইভার। মাঝে মাঝে আবার ওভারকোট দুটো বদলাবদলি হয়ে যেতো।" "সিগারেট মদ তিনি ছুঁতেন না

আর খেতেন বাদাম আর ফল। শুক্রবার নিতেন বিশ্রাম আর খেলা করতেন নাতনী মাসোমার সঙ্গে।"

রঙীন চশমা পরে ইরানকে আর মোসাদেককে দেখেনি প্যাট্ তাই তার সঙ্গে বিদেশী সাংবাদিকদের অনেক তফাত ছিল। আমেরিকান রাজদূত লয় হেণ্ডারসনও খুব প্রীত ছিলেন না প্যাটের উপর। আমেরিকানরা মোসাদেককে বলতো 'ওল্ড মসী'। ইরানের টুডে পার্টি তাঁর নাম দিয়েছিল :

"Aspirin tablet which removes the pain but not the disease" !

সুয়েজের পারে মিশরীরা বলতো "ব্রিটিশ টেরর"। মুল্লা কাশানী শাপ দিতেন "enemy of the constitution who deserves only death punishment"। আর ব্রিটিশ সাংবাদিকরা নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা করতো :

"A cunning fox who can be charming to the point of captivation, what with all his simplicity, idiosyncracies and occasional spells of fainting !"

প্যাট্ বলতো "Greatest wonder of 20th century politics."

"আচ্ছা প্যাট্, মোসাদেক কি কমিউনিস্ট? তোমার কি মনে হয়।" জিজ্ঞাসা করলাম প্যাট্কে।

"ইফ হি ইজ, দেন পোপ পায়াস টুয়েলভ ইজ অলসো এ কমিউনিস্ট" প্যাট্ জবাব দেয়। মোসাদেককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন,

"I have'nt selected any name for my particular philosophy".

বর্ডারের কাছে এসে প্যাটের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি। প্যাটের বন্ধু, বর্ডার পুলিসের অফিসার মৃদু হেসে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন আর আগে যাবার যাত্রার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।

ভোরের আধো আলো, আধো ছায়ায় স্টীয়ারিং হুইলে বসা প্যাটের চেহারাটা এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সুয়েজ

ক্যানেল ন্যাশনালাইজেশন আর মোসাদেকের মুক্তির পর একটা চিঠির উত্তরে আমেরিকা থেকে প্যাট্ লিখেছিল :

"Dear Taroon—Is'nt it a strange coincidence of the 20th Century Middle East politics that the Suez Nationalisation by Nasser and the release of Dr. Mossadeq should come about at almost the same time."

সত্যি আশ্চর্য সংযোগ।

পনেরো

রোমের 'এক্সসেলশিয়ার' হোটেলের ডাইনিং হল্। কোণের দিকে টেবিলে বসে হিজ ইম্পিরিয়াল ম্যাজেস্টি মহম্মদ রেজা শাহ পহ্লভী আর হার ইম্পিরিয়াল ম্যাজেস্টি সোরায়া পহ্লভী। শাহনশাহ'র চোখের কোণে জল, চেহারা মলিন, গালে চারদিনের দাড়ি। ধীরে ধীরে কফির পেয়ালাটা তুলে ধরলেন মুখের কাছে।

"মোসাদেক হ্যাজ বিন্ ওভারথ্রোন ইয়োর ম্যাজেস্টি" ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলো অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের করেস্পণ্ডেন্ট্ রিচার্ড এরম্যান।

শাহনশাহ'র হাতটা একটু কেঁপে ওঠে। কফির পেয়ালাটা মাঝপথে থেমে যায়। কম্পিত হস্তে তিনি সোনার কেস থেকে সিগারেট বের করে ধরাবার বৃথা চেষ্টা করেন। এরম্যান এসে লাইটার এগিয়ে দেয়। শাহ উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছেন। সোরায়া তার হাতটা রাখে শাহ'র হাতের উপর।

"ক্যান ইট বি ট্রু? ক্যান ইট বি"—শাহ'র মুখ থেকে শুধু এই কথাটাই শোনা যায়। 'হাউ একসাইটিং' শিশুর সরলতায় সোরায়া বলে ওঠে। এরম্যানকে গভীর আলিঙ্গন করেন শাহ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে শাহ'র লোকেরা ছুটলো কে. এল. এম. বিমান কোম্পানীর দপ্তরে 'প্লেন সিডিউল' খুঁজতে।

চারদিনের নির্বাসনের অবসান হলো। শাহ্ ফিরে চললেন তেহ্রানে, সঙ্গে ২০ জন বিদেশী সাংবাদিক। ফারুকের ভবিষ্যৎ-বাণী ভুল হলো। রেজা শাহ পহ্লভী যখন তেহ্রান ছেড়ে পালালেন, ফারুক তখন কাপ্রীতে নাইট ক্লাবে বসে। তাঁকে যখন শাহ্র নির্বাসনের খবর দেওয়া হয়, ফারুক নাকি বিকট জোরে হেসে বলেছিলেন—"I tell you ultimately only five Kings will remain in this world—King of Heart, King of Clubs, King of Diamonds, King of Spades and the King of England."

(ইংল্যাণ্ডের কিং কিন্তু 'ট্রাম্প' হয়ে গিয়েছেন, রয়েছেন 'কুইন অব ইংল্যাণ্ড'।)

রাণী সোরায়াকে শাহ রেখে গেলেন রোমে আর বলে গেলেন, "তোমাকে আমি রোজ ১০০টা গোলাপ পাঠাবো।" তেহ্রানে পৌঁছে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন। কে. এল. এম. কোম্পানীর চার্টার্ড প্লেনে রাণী সোরায়ার জন্তে রোজ আসতো গোলাপ তেহ্রান থেকে রোম।

নিজের সঙ্গী-সাথী আর খবরের কাগজের করেস্পণ্ডেণ্টদের নিয়ে শাহ গেলেন রোম এয়ারপোর্টে। কে. এল. এম. কোম্পানী জানালো যে, বিনা ভিসায় তারা খবরের কাগজের লোকদের নিয়ে যেতে নারাজ। রিচার্ড এরম্যানকে ছেঁকে ধরলো সাংবাদিকদের দল—"কিছু একটা করতেই হবে"। খানিক পরে শাহ্'র এ. ডি.সি. কোম্পানীর ম্যানেজারকে ডেকে শুধু বললেন—

"Keep on like this—and you may find your airline into Teheran shut down."

বানিয়া ডাচ্ কোম্পানী। অল রাইট, জার্নালিস্টস ক্যান গো অন দেয়ার ওন রেস্পন্সিবিলিটি—ঘোষণা হলো কোম্পানী থেকে।

"দে গো অন মাই রেস্পন্সিবিলিটি। দে আর মাই গেস্ট"—শাহ্'র গম্ভীর জবাব শোনা যায় এবার।

বাগদাদে পৌঁছে শাহ চললেন নিজের প্লেনে, সঙ্গে ইরানিয়ান এয়ার ফোর্সের ২০টা ফাইটার বিমান। তেহ্রান এয়ার পোর্টে

জেনারেল ফজলোল্লাহ জহেদী আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অভ্যর্থনা জানালেন শাহকে। বাছা বাছা এক হাজার লোক এয়ারপোর্টে উপস্থিত। তারা এবার কাঁদতে শুরু করলো। 'শাহনশাহ, শাহনশাহ' রবে এয়ারপোর্ট মুখরিত। গার্ড অব অনার নিরীক্ষণ করে জহেদীর পাশে বসে শাহ চললেন শহরে। রাস্তার দু'পাশে অগুনতি সশস্ত্র সৈনিক। রাজপথের অলিগলিতে তখনও পচছে অনেক মৃতদেহ। শাহর আগমনের জন্য উৎসব হলো আর হাজার হাজার ভেড়ার কুরবানী করা হলো। "দি রেভলিউশন, হ্যাজ বিন ক্রাশড্" মৃদু হেসে জহেদী শাহকে বললেন, আর শাহ উত্তর দিলেন—"I must admit that I haven't had a very important part in the revolution."

খবরের কাগজের রিপোর্টাররা 'ভার্বাটিম' টুকে নেয় কথাগুলো, আর ডজনখানেক ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলে ক্লিক ক্লিক। ইরানের নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের উপর যবনিকা পতন হলো আর রিজা শাহ পহ্লভীর স্থাপিত পহ্লভী বংশের ধারা থাকলো অব্যাহত।

পার্শিয়ান কসাক্ ব্রিগেডের সাধারণ এক সৈনিক ছিলেন শাহ'র পিতা রিজা শাহ। সাধারণ সৈনিক থাকলে কি হবে, রিজা শাহ'র ক্ষমতা ছিল প্রচুর, আর তার চেয়ে বেশি ছিল আকাঙ্ক্ষা আর উচ্চাশা। শাহ আহমদের গদী উল্টে দিয়ে পার্শিয়ার ময়ুর-সিংহাসনে আরোহণ করেন তিনি। লৌহহস্তে ১৬ বছর রাজত্ব করেছেন পার্শিয়ায়। যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের প্ররোচনায় তাঁকে ডিপোজ করা হয় শত্রুপক্ষকে সাহায্য করার অভিযোগে আর গদীতে বসেন পঁচিশ বছরের যুবক মহম্মদ রেজা শাহ পহ্লভী

রিজা শাহ ছিলেন দুর্ধর্ষ নৃপতি। অবাধ্য মন্ত্রীদের তিনি শাস্তি দিতেন জানলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। তার ঘুমের ব্যাঘাত হবে বলে রাস্তার সব কুকুর গুলী করে মারা হতো। রিজা শাহ'র দুঃখ ছিল তাঁর পুত্র মহম্মদ রেজা শাহ তাঁর মতো তৈরি হয়নি, বড় কোমল হৃদয় ছিল পুত্রের। তাই মাঝে মাঝে সভাসদদের ডেকে বলতেন, "হায়, আশরফ যদি ছেলে হতো,

আমি কি সুখীই না হতাম।" আশরফ আর মহম্মদ রেজা শাহ, যমজ ভাই-বোন। আশরফ দু'মিনিটের বড়। ভাইয়ের উপর প্রতিপত্তি এত বেশি যে, ডাঃ মোসাদেক চেয়েছিলেন আশরফকে ইরান থেকে তাড়াতে। রাজপ্রাসাদের উদ্যানে বসে একদিন বালক মহম্মদ রেজা শাহ ভাবছিলেন ভবিষ্যতের কথা। পিতা যে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তার খেয়ালই নেই।

"কি হচ্ছে এখানে বসে বসে?" পিতা জিজ্ঞাসা করলেন।

"কিছু না, এই একটু ভাবছি", বালক উত্তর দেয়।

"কি? ভাবছো?" গালের উপর এক চড় বসিয়ে দিলেন পিতা।

কাঁদতে কাঁদতে উঠে গেল বালক। "এদিকে শোনো," পিতা মাঝপথে ডাকেন—"আমি চাই না, আমার ছেলে ভেবে ভেবে সময় নষ্ট করে। না ভেবে, কিছু কাজ করো।"

অগাধ ঐশ্বর্যের মধ্যে হারেমে বাড়তে লাগলেন মহম্মদ রেজা শাহ। পাঠানো হলো সুইজারল্যাণ্ডে—"হোয়ার হি প্লেড উইথ ফাস্ট কারস, ফাস্ট প্লেনস, অ্যাণ্ড ফাস্ট উইমেন"। যখন একবার এপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন হয়, পিতা নাকি দুঃখ করে বলেছিলেন, "নাউ হি হ্যাজ নো গাটস্ অ্যাট অল"। কিন্তু শাহনশাহ রিজা শাহও একটু ভুল করেছিলেন। কারণ পরে ময়ূরসিংহাসনে উঠে মহম্মদ রেজা শাহ অনেক 'গাটস্' দেখিয়েছেন।

জাঁকজমক করে, ধুমধামের মধ্যে বিয়ে হলো ফারুকের বোন ফোজিয়ার সঙ্গে। দু'বছর পরেই একদিন সকালে উঠে মহম্মদ রেজা শাহ জানতে পারলেন তিনি হয়েছেন ইরানের শাহনশাহ। এদিকে রাজপ্রাসাদে বোন আশরফ কেবলই বলতে লাগলেন ফোজিয়াকে ডাইভোর্স করো, কারণ তার কোন পুত্রসন্তান নেই। আর পুত্র না থাকলে পহলভী বংশ যে লোপ পাবে। শাহ'র মা জানালেন তাঁরও সম্মতি আছে এই বিবাহ-বিচ্ছেদে। ডাইভোর্স হয়ে গেল। কন্যা শাহনাজ রয়ে গেল রাজপ্রাসাদে। (শাহনাজের সম্প্রতি বিবাহ হয়েছে ফজলোল্লা জহেদীর পুত্র আর্দেশীর জহেদীর সঙ্গে)। খোঁজ শুরু হলো নতুন মেয়ের। সারা ইউরোপ তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। হাজার হাজার ফটো

জমা হলো। একদিন সকালে আশরফ সোরায়া ইস্ফান্দ্রীর ফটো দেখালো শাহকে। "যদি সে এতই সুন্দরী আমি ওকে বিয়ে করবো।" কিছুদিন পরে প্যারিসে দেখা হলো শাহ'র সঙ্গে সোরায়া ইস্ফান্দ্রীর। শক্তিশালী বখতিয়ারী জাতের নেতা ডাঃ ইস্ফান্দ্রীর কন্যা সোরায়া। মা জার্মান আর ছোটবেলায় কাটিয়েছেন জার্মানীতে। (ডাঃ ইস্ফান্দ্রী অনেকদিন জার্মানীতে ইরানের রাজদূত ছিলেন।) আবার ধুমধাম আর জাঁকজমক করে শাহ'র সঙ্গে বিয়ে হলো সোরায়ার। বিলিতী খবরের কাগজের রিপোর্টারা লিখলো—"the world's most beautiful Queen." "One of the most gorgeous marriages ever held in the annals of monarchy for its sheer lavishness, pomp and grandeur."

সোরায়ার প্রতি শাহ'র প্রেম অগাধ। শাহ'র প্রত্যেক কাজে সোরায়া সাহায্য করেন। সাঁতার, স্কী, টেনিস, সবেতেই শাহর পার্টনার। কিন্তু ইরানের মোল্লারা আবার গোলমাল শুরু করে দিয়েছে, কারণ সোরায়াও নিঃসন্তান। পহ্লভী বংশ রক্ষা কি করে হবে, তাঁদের ভাবনা। বিদেশী সাংবাদিকরা তাই সোরায়াকে বলে—স্যাড সোরায়া—দুঃখিনী সোরায়া।

'দুঃখিনী' সোরায়াকে নিয়ে শাহ পালালেন তেহ্রান ছেড়ে মোসাদেকের ভয়ে। সঙ্গে চললো শাহ'র চারটে টেনিস র‍্যাকেট, সোরায়ার দুটো হ্যাণ্ড ব্যাগ আর ১২টা ফ্রক। শাহ'র কাছে মোটে একটা স্যুট, পাশে বসে তাঁর নিজস্ব পাইলট মেজর মহম্মদ খাটামী। প্লেনের সীটে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন সোরায়া। বললেন, "আমার গোলাপ ?"

"লক্ষ্মীটি কেঁদো না। তোমার গোলাপ আমি পাঠিয়ে দেবো।" শাহ সান্ত্বনা দেন সোরায়াকে।

রোমের দৈনিক ৫০ পাউণ্ড ভাড়ার 'এক্সেলশিয়র' হোটেলের 'সুইট'-এ গিয়ে উঠলেন শাহ আর সোরায়া। সারারাত দু'জনে বারান্দায় পায়চারি করেন, কারুর চোখে ঘুম নেই। পরের দিন সকালে মেজর খাটামী শাহকে বললেন, "আমি আপনার বোঝা হয়ে আর থাকতে চাই না। আমায় আপনি ছুটি দিন।"

কান্নায় ভেঙে পড়লেন শাহ, "খাটামী, তুমিও যদি আমাকে ছেড়ে যাও, আমার সঙ্গে টেনিস কে খেলবে ?"

যেদিন থেকে শাহ আর সোরায়া রোমে এসেছিলেন, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এর রিচার্ড এরম্যান অনবরত ঘোরাফেরা করেছে হোটেলের আশেপাশে। শাহ'র সম্বন্ধে অনেক খবর 'স্কুপ' করে খবরের কাগজের দুনিয়ায় দু'দিনের মধ্যে এরম্যান নাম কিনে ফেললো। শাহ'র সঙ্গে রিচার্ডের এতো ফটো কাগজে বেরিয়েছে যে, অনেকে তাকে শাহ'র দলের লোক ভেবেছে। "মোসাদেক হ্যাজ বিন ওভারথ্রোন ইওর ম্যাজেস্টি" বলে রিচার্ডই প্রথম সুসংবাদ দিয়েছে শাহকে। তাঁর দুঃখের দিনের সাথী বলে রিচার্ড আজ শাহ'র অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে একজন।

নাটকে ভিলেন না থাকলে নাটক নাকি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ইরানের নাটকের 'ভিলেন অব দি পিস্' জেনারেল ফজলোল্লা জহেদীকে এবার একটু দেখা যাক। কে এই জহেদী যিনি বিংশ শতাব্দীতেও 'কাউন্টার রিভলিউশন' করে দেখালেন ? প্যাট্ জহেদী সম্বন্ধে বিস্তর খবরাখবর জানতো। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে জহেদী ব্রিগেডিয়ার হয়েছিলেন। 'আর্থেরাইটিস' রোগে কাতর হলেও ইরানের রাজনৈতিক আকাশে দুষ্টগ্রহের মতো জহেদী সাহেব জ্বল জ্বল করেছেন অনেকদিন। ডাঃ মোসাদেক ছিলেন জহেদীর পুরোনো শত্রু। যতবারই মোসাদেক জহেদীকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছেন, শাহ এগিয়ে এসেছেন তাঁকে বাঁচাতে। গত মহাযুদ্ধের সময় জেনারেল জহেদী ইস্পাহানে পার্শিয়ান ফোর্সের কমাণ্ডার ছিলেন। তাঁর কার্যকলাপে মিত্রপক্ষের সন্দেহ হয় যে, তিনি জার্মানীর সঙ্গে জোট পাকাচ্ছেন। এই সময় জেনারেল জহেদীর জীবনে এক রোমাঞ্চকারী ঘটনা ঘটে।

'ক্লোক অ্যাণ্ড ড্যাগার' এজেন্ট ফিটজরয় ম্যাকলিন জহেদীকে মিত্রপক্ষের হুকুমে 'কিডন্যাপ' করেন। তারপর যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত জহেদী প্যালেস্টাইনে বন্দী ছিলেন। যে জহেদী ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের এত বড় শত্রু ছিলেন, তিনি মোসাদেকের পতনের পর ব্রিটিশদের বন্ধু কি করে যে হয়ে গেলেন, বোঝা মুশকিল। 'কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরলেই পাজী'

কথাটা ইংরেজদের জন্যেই বোধ হয় তৈরি হয়েছিল। যাক সে কথা। এবার জহেদী সাহেবকে একটু দেখা যাক। মোসাদেকের পতনের পর জহেদী যখন ইরানের প্রধান মন্ত্রী হন 'ক্লোক অ্যাণ্ড ড্যাগার' এজেন্ট ফিটজরয় ম্যাকলিন এক বিলিতী খবরের কাগজে, জহেদীকে কিডন্যাপ করার সেই ঘটনাটা বর্ণনা করেন। (ম্যাকলিন অবশ্য আর ক্লোক অ্যাণ্ড ড্যাগার-এর এজেন্ট নেই। তিনি এখন কন্সারভেটিভ এম. পি.)

ম্যাকলিন লেখেন—

"It is just over 10 years since I pressed a pistol into the ribs of the present Prime Minister of Persia and invited him to put his hands up,"

......"I had nothing against him personally. But I had been told to kidnap him. And so I kidnapped him as neatly and as expeditiously as I could......I was told that I could shoot him if it was necessary......"

তারপর ম্যাকলিন সাহেব কি করে জহেদীকে কিডন্যাপ করেন, তার চাঞ্চল্যকর বিবরণ দিয়েছেন। যুদ্ধের সময় প্রত্যেক কাজেরই একটা করে গুপ্ত-নাম থাকে। জহেদীকে কিডন্যাপ করার এই কাজটির নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন পঙ্গো'।

ম্যাকলিনের বর্ণনার শেষে একটা চমকপ্রদ আবিষ্কার আছে। জহেদী গ্রেপ্তার হবার পর তাঁর বেডরুম সার্চ করে অনেক জিনিসই বেরোয়। বিছানার বালিশের তলা থেকে যা যা বেরোয়, তার একটা ফর্দ ম্যাকলিন সাহেব দিয়েছেন:

"A collection of German automatic weapons, some opium, a large supply of silk underwears, letters from German parachutist agents operating in the hills and an illustrated register of the city's prostitutes......"

মোসাদেকের পতনের পর জহেদী পুলিস আর মিলিটারীকে হুকুম দেন, বিদেশী মন্ত্রী জেনারেল ফতেমীকে গ্রেপ্তার করতে। ফতেমী নিখোঁজ আর জহেদী মোসাদেকের চেয়েও ফতেমীকে বেশি ভয় করতেন। মাঝে মাঝে জহেদী রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে জেগে উঠতেন, আর বালিশের নিচে লুকানো তাঁর

জার্মান 'কোল্ট' পিস্তল খুঁজতেন আর বিড় বিড় করে বলতেন—"ফতেমী, ফতেমী। ইয়া আল্লাহ" (পরে ফতেমী ধরা পড়েন বা ধরা দেন আর তাঁকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে প্রাণ দিতে হয়)।

ইরানের নাটকের ড্রামাটিস পারসনের শেষ পাত্র মুল্লা আত্তাউল্লা কাশানী। প্যাট্ ওর নাম দিয়েছিল 'ঈগল-আইড' 'শকুনী-চোখো' কাশানী। কাশানী যখন হাসতেন তখন নাকি ছোট শিশুরা কেঁদে উঠতো। অবশ্য এটা শোনা কথা। আশ্চর্য কিছুই না, কারণ এই রকম হিংস্র কুটিল আর প্রতিহিংসা পরায়ণ, ধর্মান্ধ লোক বিংশ শতাব্দীর রাজনীতিতে খুব কমই দেখতে পাওয়া যাবে। কাশানীর সঙ্গে মোসাদেকের কোনো মিলই ছিল না কিন্তু দু'জনে এক হন শুধু ইংরেজদের তাড়াতে। কারণ, প্রথম মহাযুদ্ধে কাশানীর পিতা নিহত হন ইংরেজদের হাতে আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কাশানীকে বন্দী করে ইংরেজরা। মোসাদেক কাশানীকে মজলিশের স্পীকার করেন, কিন্তু পরে কাশানী কি করে শাহ'র সঙ্গে যোগ দিয়ে মোসাদেকের বিরুদ্ধাচরণ করেন সে কথা আগেই বলেছি।

কিন্তু ওমর খৈয়াম, শেখ সাদী, হাফিজ, নিজামী, ফির্দৌসী, জামী, দিহখুদা, আর আলী হুসেন ইবন সিনার দেশ ইরানে গিয়ে ফিরে এসে শুধু যদি শুষ্ক রাজনীতিই চর্চা করি তাহলে বিদগ্ধ পাঠকেরা আমায় নেহাতই বেরসিক বলে ঠাওরাবেন। পার্শিয়ায় (ইরান নাম হয় ১৯৩৫ সালে) একটা পুরনো প্রবাদ আছে যে, কোনো মানুষ যদি জীবনে সুখী হতে চায় তাহলে তাকে ইয়েজদীরের রুটি খেতে হবে, শিরাজের মদ্য পান করতে হবে, আর ইয়েজদের মেয়ে বিয়ে করতে হবে। আমি কিছুই করিনি। শিরাজে গিয়ে শিরাজী পান করিনি কিন্তু আড়াই হাজার বছর পুরনো 'পের্সীপোলিস'-এর ধ্বংসাবশেষ দেখেছি আর নতমস্তকে দূর থেকে প্রণাম জানিয়েছি অমর কবি হাফিজ আর সাদীকে। শিরাজের বুকে চিরনিদ্রায় ঘুমচ্ছেন এই দুই মহাকবি। বিংশ শতাব্দীর হানাহানি, মারামারি, অত্যাচার

আর হিংসা থেকে বহু দূরে তাঁরা। তেহ্‌রানের কোলাহল, আবাদানের যন্ত্রদানবের নিষ্পেষণ থেকে অনেক দূরে। হাফিজ বোধ হয় বিংশ শতাব্দীর ইরানের কথা চিন্তা করেই লিখেছিলেন :

"ইচেহ্‌ শোরীস্ত কেহ দর দৌরে কমর মী বিনম্‌
হামা আফাক্‌ পুর আজ ফিতনা ব সর মী বিনম্‌"

ঝগড়া আর মারামারিতে জর্জরিত কোলাহলপূর্ণ পৃথিবীর এ কী রূপ আমি দেখছি।

"আবলহাঁ রা হামা সরবৎ যে গুলাব বো কান্দস্ত্‌
কুতে দানা হামা আজ খুনে জীগর মী বীনম"

বোকারা গোলাপ আর মধুর সরবৎ পান করে আনন্দ করছে, আর বুদ্ধিমান জ্ঞানীরা হৃদয়ের রক্ত পান করছে।

কোথায় যেন একটা এই রকম ধারা উর্দু কবিতা পড়েছিলাম—

"পিতে হ্যাঁয় লোগ রোজ শব-মুসরৎ-কে ময়
এক ম্যা হুঁ কি খুনে-জীগর ম্যায়নে পিয়া হ্যায়"…

নৈশাপুরে মহান কবি ওমর খৈয়ামের সমাধি। তেহ্‌রান, ইস্পাহান, আর ক্যাস্পিয়ান কোস্টের জাঁকজমকে নৈশাপুর আজ অবহেলিত। ধু-ধু করছে মাঠ, জনবিরল নৈশাপুর। না আছে সাকী, না আছে সুরা, না আছে কুঞ্জবন আর 'বুক অব ভার্স'।

"আজ্‌ খাক বরাম্‌দেম্‌ ব বরবাদ্‌ শুদেম"। ধুলো থেকে ধুলোয়—ফ্রম ডাস্ট ইনটু ডাস্ট। কোথায় সেই বৃদ্ধ পক্ককেশ অমর কবি? নৈশাপুরের সমাধির তলে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত? না। পৃথিবীর এ-কোণ থেকে অন্য কোণ পর্যন্ত সাহিত্য-অনুরাগী লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে জ্বল জ্বল করছে সেই মহাকবির স্মৃতি।

"গর দস্ত দহদ জে মগজ গন্দুম নানে
বো জে ময় কদুএ যে গোস্ত পন্দে রানে,
বা লালারুখে নসিস্তা দর বিরাণে
এয়সে আস্ত কে নীস্ত হদে হর সুলতানে।"

যদি আমার হাতে থাকতো গমের রুটি, এক পেয়ালা

সুরা, কিছু মাংস আর প্রিয়া সঙ্গ পেতাম নির্জনে! এ সুখ সুলতানের ভাগ্যেও থাকতো না।

নৈশাপুরে ওমর খৈয়ামের সমাধির পাশে তাঁর এক ভক্ত নাকি ছোট একটা গোলাপচারা রোপণ করেছিলেন। কালের ঝড়ে সে গোলাপচারা আজ শুকিয়ে ঝরে পড়েছে। কোন এক ইংরেজ শিল্পী সেই গোলাপের কলম নিয়ে যান বিলেতে আর রোপণ করেন ওমর খৈয়ামের রুবাই অনুবাদকারী এডোয়ার্ড ফিটজারেল্ড-এর সমাধির উপর। সাফোক-এ উডব্রিজের কাছে Boulge চার্চ ইয়ার্ডে ফিটজারেল্ড-এর সমাধির উপর সেই গোলাপচারাকে রক্ষা করেছে ছোট একটা তারের বেড়া। বেড়ার উপর ঝোলানো ফলকে লেখা আছে—

"This rose tree raised in Kew Gardens from seed brought by William Simpson, artist and traveller from the grave of Omar Khayyam at Nashipur, was planted by a few admirers of Edward Fitzgerald in the name of Omar Khayyam Club, 7th October, 1893."

গোলাপ দিয়ে অমর কবির স্মৃতিরক্ষার অপূর্ব চেষ্টা। বাংলায় কার যেন অনুবাদ পড়েছি সেই বিখ্যাত পংক্তির :

"বর চেহারা-এ গুল নাসিম-ই-নওরোজ-খুশ অস্ত
দর জের-এ চমন বু-এ-দিল কারোজ খুশ-অস্ত"

"গোলাপের মুখে বসন্ত সমাগমের বার্তা, মধুরের আগমনীর বাণী। কুঞ্জ ছায়ায় কত মধু, আর কত মধু প্রেয়সীর অধরে।"

আর···"মারা চু বুখ খেশ ম্যায় গুলগুন দহ"। "দাও মদিরা গোলাপ গালের আভায় ভরানো"···।

কিন্তু ইংরেজ বানিয়ার জাত। কোন বেচারী উইলিয়াম সিম্পসন নৈশাপুর থেকে ভক্তি ভরে আনলো গোলাপচারা আর এখন ইংরেজ বেমালুম 'ওমর খৈয়াম রোজ' নাম দিয়ে গোলাপ চারা বিক্রি করছে—

—"Light Pink loosely formed blooms with typical centre petals and strongly scented. A highly interesting rose which was rescued and propagated in 1947 from a very old plant, nearly

dead on the grave of Edward Fitzgerald. New plants have been raised and are now available."
(বার্টরাম পার্ক-এর 'কলিন্স গাইড টু রোজেজ' দ্রষ্টব্য)।

দেশে ফিরে আসবার পর নাগপুরে এক সভায় আমায় 'ইণ্ডো-ইরানিয়ান' কালচার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে বলা হয়। সোসাইটির সেক্রেটারী মশাই, যিনি আমায় আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন, তাঁকে আমি বললাম যে, আজকালকার এগ্রিকালচার আর হর্টিকালচারের যুগে কালচার আর রইলো কোথায়? সেক্রেটারী মশাই আমার কথাটাকে রসিকতার পর্যায়ে ফেলতে রাজী হলেন না। শেষে আমাকে তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হয়। কারণ 'ইণ্ডো-ইরানিয়ান' কালচার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার মতো পাণ্ডিত্যও আমার নেই, আর দুঃসাহসও নেই। তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে, ওসব শক্ত ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই। সেক্রেটারী নাছোড়বান্দা আর তাঁর ধারণা যে, তেহ্‌রান থেকে ঘুরে এলেই 'ইণ্ডো-ইরানিয়ান' কালচার আর ওমর খৈয়াম সম্বন্ধে এক্সপার্ট। তাঁকে বললাম, দেখুন আমি কিছুই জানি না। তবে আপনাকে একটা গল্প বলতে পারি 'ইণ্ডো-ইরানিয়ান' কালচার সম্বন্ধে।

সেক্রেটারী উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "তাতেই হবে।"

"বহুকাল পূর্বে ইরান থেকে এক পর্যটক এসেছিলেন ভারতবর্ষে বেড়াতে। অনেক বছর পরে তিনি যখন নিজের দেশে ফিরে যান ইরানের বাদশা ডাকলেন রাজ দরবারের পাত্র-মিত্র সভাসদদের 'সিন্ধুদেশের' গল্প শোনবার অভিপ্রায়ে। ইরানীরা নাকি 'স' বলতে পারতো না। তাই সিন্ধু নদীর দেশের 'সিন্ধুর' 'সি'কে তারা উচ্চারণ করলো 'হি' আর আমরা হয়ে গেলাম 'হিন্দু'।"

সেক্রেটারী প্রতিবাদ জানান। তিনি আবার একটু ভারতীয় আর হিন্দু কালচার নিয়ে মাথা ঘামান। তাই বললেন, "এটা ভুল। হিন্দু কথাটা আমাদের ধর্মে, ইতিহাসে, হাজার হাজার বছর আগে যখন আমাদের ঋষি মুনিরা ইত্যাদি ইত্যাদি..."

আমি বাধা দিলাম—"আগেই বলেছি আমি ইণ্ডো-ইরানিয়ান কালচার সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আপনি শুনতে চাইলেন গল্প

তাই আপনাকে গল্প শোনাচ্ছি। তবে ওই 'সি' থেকে 'হি' হওয়ার ব্যাপারে আমার 'অথরিটি' ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জি।"

বড়গোছের নামটা শুনে সেক্রেটারী মশাই একটু ঘাবড়ে গেলেন, কিন্তু দমলেন না। বললেন, তিনিও 'অথরিটি' খুঁজেপেতে আমায় পরে জবাব দেবেন। 'ইন দি মিনটাইম' আমার গল্পটা চলুক।

"বাদশাহ ডাকলেন রাজদরবারের পাত্র-মিত্র সভাসদদের। পর্যটক শুরু করলো তার কাহিনী। বর্ণনা করলো হিন্দুস্তানের নদনদী, পাহাড়, পর্বত, শহর, গ্রাম। অসহিষ্ণু বাদশা বললেন, "থামো। আমাকে বলো হিন্দুস্তানের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বস্তু কি?"

"শাহনশাহ, হিন্দুস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু আম।"

"আম?" সভায় সবাই চকিত।

"হ্যাঁ শাহনশাহ, আম। হিন্দুস্তানের অপূর্ব এই ফল। বেহেস্তের ফল এই আম। এর স্বাদের বর্ণনা দুনিয়ার কোনো ভাষাই দিতে পারে না।"

"তবু কেউ যদি তোমায় জিজ্ঞেস করে আমের স্বাদ কি রকম তাহলে তুমি কি বলবে?"

বাদশাহ পর্যটককে সওয়াল করেন।

খানিকক্ষণ ভেবে পর্যটক মশাই রাজাকে বললেন, "শাহনশাহ, আমায় কিছু মধু আনিয়ে দিন"। মধু আনা হলো। দরবারের সবচেয়ে বৃদ্ধ সভাসদকে টেনে এনে রাজার সামনে দাঁড় করালেন পর্যটক। সভার সবাই অবাক। হঠাৎ পাত্র থেকে এক খাবলা মধু তুলে নিয়ে, বৃদ্ধ সভাসদের তুষার-শুভ্র দাড়িতে মাখিয়ে দিলেন পর্যটক। হৈ হৈ পড়ে গেল দরবারে। 'ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ' রব উঠলো।

বাদশাহ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, "তোমায় কোতল করবো আমি। এ কি বেআদবী।"

"গুস্তাকী মাফ হোক শাহনশাহ। আমি আপনাকে আগেই বলেছি, আমের স্বাদ বর্ণনা করা আমার সাধ্যের বাইরে, তবুও আপনি জানতে চাইলেন। যদি আমের স্বাদ আপনি জানতে চান, আপনি ঐ মধু-মাখানো দাড়ি চাটুন। তাহলেই হিন্দুস্তানের

সুস্বাদু, রেশমের সুতার মতো আঁশওয়ালা আমের সত্যি স্বাদ আপনি পাবেন।" মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ বলে উঠলেন বাদশাহ।

"হয়ে গেল আপনার গল্প?" সোসাইটির সেক্রেটারী সাহেব নিরাশ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"দেখুন স্যার, এই গল্পের মধ্যে যদি আপনি ইণ্ডো-ইরানিয়ান কালচার দেখতে না পান দোষ আমার না। কিন্তু একবার বিবেচনা করে দেখুন কালচারের দৌড় কতদূর পর্যন্ত। কোথায় বনারাস কা ল্যাঙড়া আম আর কোথায় সুদূর পারস্যের দাড়ি।"

সেক্রেটারী সাহেব ততক্ষণে বেশ চটে উঠছেন কিন্তু সে ভাব চেপে রেখে আবার জেদাজেদি শুরু করলেন, "না, আপনাকে বলতেই হবে আমাদের সোসাইটির সভায়।"

"তাহলে আরেকটা গল্প শুনুন..."

"আচ্ছা স্যার, আসি তাহলে আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম"—সেক্রেটারী মশাই দ্বিতীয় গল্পের অপেক্ষা না করেই পৌঁছলেন আমার গেটের বাইরে। গল্পটা তাকে শোনানো হলো না বলে দুঃখ থেকে গেল।

ইণ্ডো-ইরানিয়ান কালচার নিয়ে আমি ঘাঁটাঘাঁটি করিনি। ওসব বড় বড় পণ্ডিতদের কাজ। তবে হ্যাঁ, শুনেছি ইরানের শাহনশাহকে ভারত সরকার টেণ্ডুলকারের লেখা মহাত্মা গান্ধীর জীবনী উপহার দিয়েছেন আর ইরানের শাহনশাহ আমাদের পাঠিয়েছেন কিছু কারুকার্যখচিত দোয়াতদানি ইত্যাদি। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব বিদেশে আজকাল হচ্ছে নানা রকম ভাবে। রাজদূত ইত্যাদি তো রয়েছেনই তারপর ঘন ঘন কালচারাল, এগ্রিকালচারাল ডেলিগেশনের রপ্তানি তো আছেই। কিন্তু ভারতবর্ষের হাতির যত চাহিদা তত চাহিদা অন্য কোনো বস্তুরই নেই। তাই পণ্ডিত নেহরু প্রায়ই হাতি পাঠাচ্ছেন বাইরে। মহা ঘটা করে তাদের আবার নামকরণ হচ্ছে। অ্যাটোমিক প্ল্যান্টের নাম যদি 'অপ্সরা' হয় হাতির নামই বা 'ইন্দিরা' বা 'ভারত' হবে না কেন! পণ্ডিত নেহরুর পাঠানো হাতি 'ভারত' ইরানের শাহনশাহ আর মালিকে-মু-আলমের

খুবই প্রিয় পাত্র 'ভারত' যে সে হাতি না—'ইণ্ডো-ইরানিয়ান' কালচারের প্রতীক। তেহ্‌রান স্টেশনে নেমেই ইরানীদের ভারতবর্ষের তরফ থেকে 'স্যালুট' জানায়। ইরানীরা হাতি খুব কমই দেখেছে। এর আগে অনেক বছর হলো রানী ভিক্টোরিয়া এক জোড়া হাতি তখনকার শাহনশাহ নাজীরুদ্দিনকে উপহার দেন।

একমিনিয়ান (Achaemenians), সসানিয়ান (Sasanians) গ্রীক, আরব, তুর্ক, মঙ্গোল, তাতার, সভাভী (Safawi) আর কাজার, সফারিদ, সমানিদ, গজনভী, বুভাহীদ, খোরাজমশাহী আর পহ্লভী বংশের মিলন ক্ষেত্র ইরান। কাব্যে, শিল্পে, সাহিত্যে আর সঙ্গীতের ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ ইরান। জোরাস্টের (Zoraster) হুখত্, হুভারস্ত, আর সুমৎ (ভালো কথা, ভালো কাজ, ভালো চিন্তা); হেরদূত কথিত "to ride, to draw the bow and to speak the truth" আর ন্যায়ের প্রতীক নোশীরওয়ানের ইরান। সাদি, খৈয়াম আর হাফিজের ইরান।

নোশীরওয়ানের রাজপ্রাসাদের সামনে 'স্কোয়ার' তৈরি করার সময় যখন এক গরীব বিধবার জমি কেড়ে নেবার প্রস্তাব ওঠে, নোশীরওয়ান হুকুম দেন "স্কোয়ার তৈরি যেন না হয়"। তাঁর এই ন্যায় প্রীতির কথা শুনে রোমান রাজদূত বলেন: "This irregularity is more beautiful than the most perfect square." আর তাঁর 'হল্ অব জাস্টিস'-এর ধ্বংসস্তূপ দেখে খাকানী বলেন, "What will be the fate of the Hall of Oppression, when this has been the fate of the Hall of Justice."

শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতবর্ষে এসেছে ইরান থেকে শিল্পী, কবি আর আরো অনেক গুণীরা। সৈদা, আমুলি, খুদসী, আর কালিম-এর মোগল দরবারে অভ্যর্থনা হয়েছে রাজোচিত। খৈয়ামের রুবাই, আবু আলী হুসেনের 'তিব্বী-ই-ইউনানী', ফির্দৌসীর 'শাহনামা', রুমীর 'মাথনাওয়ী,' সাদীর 'গুলিস্তান' আমাদের কাছে এসেছে অনেক আগে। ইরানী শিল্পী সৈদাই কল্পনা করেছিল ময়ূর-সিংহাসন যার উপর বসে রাজত্ব করেছে

মোগল বাদশাহরা। মোগল রাজ-দরবারে সম্মান পেয়েছে পারস্যের অপূর্ব ভাষা। সেই ভাষাতেই না সম্রাট শাহজাহান নীল যমুনার দিকে চেয়ে তাঁর প্রিয়তমা মমতাজকে বলেছিলেন, "তোমার আননের স্বর্গীয় আভা দেখতেই না এতদূর চলে এসেছে যমুনা"।

"আর তোমার ভয়েই না যমুনা মাথা খুঁড়ে মরছে প্রাসাদের পাথরের ওপর" জবাব দিয়েছিলেন মমতাজ মহল।

ষোল

আড়াইশ' পাউণ্ডের একটা মাংসপিণ্ডকে যদি সান-গগলস্ আর সুইমিং-ট্রাঙ্ক পরে রোমের আনজিও (Anzio) বীচে, ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা অথবা ক্যাপ্রীর তীরে ডজনখানেক 'বিকিনী' পরিহিতা মেয়ের সঙ্গে বালির উপর গড়াগড়ি করতে দেখা যায়, যে কেউ নিঃসন্দেহে বলে দিতে পারবে মানুষটি কে। কিন্তু কাউকে যদি বলা হয় যে, ঐ কিম্ভূতকিমাকার মেদরাশির স্তূপ মাত্র ২০ বছর আগেও এক সুন্দর যুবা ছিল, তাহলে হয়তো কেউই বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস না করারই কথা কারণ এককালে সত্যিই ফারুক সুপুরুষ ছিলেন। শেলী যখন মিশরের রামেসিস্ আর তাঁর কীর্তির গুণগান করে 'Ozymandias' সনেট লেখেন, তখন তিনি হয়তো কল্পনাও করতে পারেননি যে, বিংশ শতাব্দীতে মিশরে এক ফারুকও জন্মগ্রহণ করবেন। ফারুক আর তাঁর কীর্তি দেখে শেলী কি লিখতেন বলা মুশকিল।

"My name is Ozymandias, King of Kings.
Look on my works, ye Mighty and despair,"
লিখেছিলেন শেলী রামেসিস্ সম্বন্ধে।

প্যারিসে এক কাফেতে বসে আমি আর আমার এক বন্ধু মিলে ফারুক সম্বন্ধে কয়েকটা লাইন লিখি :

"My name is Farouk, King of Kings
I love the world's all good things ;

250-pound of this magnificent heap of ugliness
In my sun-glasses, Swimming trunks minus all shyness ;
As every day passes I become more ugly and fat
And in the dead of night I prowl about girls like a cat ;
My queens Farida and Narriman I have divorced
I was happy and gay till to an exile I was forced ;
With millions I gamble
In wholesale fashion I dabble ;
Who cares if there is a tomorrow
So long as I plough my lonely furrow......"

সারা কন্টিনেন্ট-এ রাজা ফারুকের নাম আর তাঁর কীর্তি বা অপকীর্তির চর্চা। নাইট-ক্লাব, কাবারে আর মন্টিকার্লোর ক্যাসিনোতে তাঁর প্রচুর প্রতিপত্তি। বড় হোটেলের লাউঞ্জে বা ডাইনিং হলে ফারুক ঢুকলে বুড়ী মায়েরা তাদের যুবতী মেয়েদের আড়াল করে রাখে। ডজনের পর ডজন শ্যাম্পেন বোতল অর্ডার দেন ফারুক তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের জন্যে (নিজে নাকি মদ্যপান করেন না)। সঙ্গীসাথীরা যখন শ্যাম্পেনের রঙীন নেশায় ফারুকের সুখ্যাতি শুরু করে, তিনি তখন তাঁর দারিদ্র্যের জন্যে দুঃখ করেন আর অভিশাপ দেন নাসের আর নগীবকে। মিশর থেকে পালাবার সময় তাঁর সঙ্গে মোটে ২০৪টি সুটকেস্ ছিল আর প্যারিসের এক ব্যাঙ্কেই জমা ছিল মোটে ২৫০ মিলিয়ন ডলার। ফারুকের দুঃখ পৃথিবীর অবশিষ্ট পাঁচ নৃপতি—কিং অব ক্লাবস, হার্টস, স্পেড, ডায়মণ্ড আর কিং অব ইংল্যাণ্ডের মধ্যে তাঁর গণনা নেই। অনেক প্রার্থনা, মানত ও মেহনতের ফল শিশু ফুয়াদ আর মিশরের সিংহাসনে বসবে না। কিন্তু ফারুকের সান্ত্বনা তিনিই মিশরের শেষ নৃপতি। তাই মাঝে মাঝে বান্ধবী ইরমাকে (Irma Copece Minutolo) হেসে বলেন—"Whatever he might be Nasser will not be the King of Egypt. I have deprived him of that honour".

কিছুদিন আগে হলিউড ফারুককে ব্যঙ্গ করে একটা ছবি তৈরি করেছিল, 'Abdullah The Great'। ছবির এক

দৃশ্যে আছে আবদুল্লা তাঁর এ. ডি. সি-কে নিয়ে তাস খেলছেন। 'শো' করার সময় এ. ডি. সি. বললো তার কাছে তিনটে টেক্কা (Ace) আর একটা বাদশা (King) আছে। আবদুল্লা বললেন, তাঁর কাছে চারটে বাদশা আছে। এ. ডি. সি. তো অবাক। চারটে বাদশার মধ্যে তার কাছে একটা থাকলে হিজ ম্যাজেস্টির কাছে চারটে থাকে কি করে? "—হাউ ইজ ছাট পসিবল ইয়োর ম্যাজেস্টি?"

"ওয়েল ইউ হ্যাভ দি কিং অব ক্লাবস। আই হ্যাভ উইথ মি দি কিংস অব স্পেড, ডায়মণ্ড, হার্ট—অ্যাণ্ড এ রিয়েল কিং—কিং আবদুল্লা দি গ্রেট।"

আরো অনেক হলিউড ফিল্মের মতো 'আবদুল্লা দি গ্রেট' ছবিটিতেও এশিয়াকে হীন প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু রাজা ফারুকের জীবনের কিছু সত্যি-মিথ্যে জড়ানো তথ্য এই ফিল্মে পাওয়া যায়।

আগেই বলেছি, ফারুক এককালে সুপুরুষ ছিলেন। শুধু সুপুরুষই না, তিনি ছিলেন ধর্মভীরু, দয়ালু আর চরিত্রবান। তাহলে তাঁর এই অবনতির সূত্রপাত কি করে হলো? সে কথা পরে। এখন একটু ফারুকের ফেলে-আসা জীবনের কিছু খোঁজ নেওয়া যাক। মাত্র ১৬ বছর বয়েসে ফারুক মিশরের রাজগদিতে আরোহণ করেন আর পরের বছর তাঁর বিবাহ হয় শশী জুলফিকার (পরে ফরিদা)-এর সঙ্গে। কিন্তু ফরিদার নসীব খারাপ। পুত্র-সন্তানের ভাগ্য থেকে তিনি বঞ্চিত থাকলেন আর মিশরের গদিতে যখন কেউ উত্তরাধিকারীই থাকবে না, তখন তিন কন্যার জননী ফরিদাও থাকতে পারেন না। অগত্যা তাঁকে যেতে হলো। কারো কারো মতে এই বিবাহ-বিচ্ছেদের পর থেকেই ফারুকের অবনতি শুরু হয়। কিন্তু নিন্দুকেরা বলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বেনিটো মুসোলিনী নাকি ফারুকের মাথাটা খারাপ করে দেন। তখন মিশরকে পকেটে রাখবার প্রচেষ্টা চলছিল দুই ক্যাম্পেই। মিডিল-ইস্টের চাবিকাঠি ছিল মিশরে। মিত্রপক্ষ আর অ্যাকসিস্ দু'-তরফই সেই 'ওপেন সিসেমী' জানবার জন্যে ফারুককে 'উ' (Woo)

করছিল। কিন্তু হার মানালেন মুসোলিনী সবাইকে। অন্যরা যখন ফারুককে 'খুশ' রাখার চেষ্টা 'ডিপ্লোমেটিক হাই লেভেলে' করছিল, মুসোলিনী শুধু একটা স্পেশাল প্লেনে ডজন দুয়েক সিনরিটা পাঠালেন ফারুককে আর ওয়াকিবহাল মহলের খবর নজরানা পেয়ে ফারুক বেশ প্রীতই হয়েছিলেন। সেই নেশার আজও শেষ হয়নি। নেশার খোরাক খুঁজতে তিনি সারা কন্টিনেন্ট তোলপাড় করেছেন।

কিন্তু ফারুক যখন রাজগদিতে আরোহণ করেন, তিনি ছিলেন সুপুরুষ যুবক। কোরানে তাঁর ছিল প্রচুর শ্রদ্ধা। যখন তাঁকে বাদশাহী মণিমুক্তাখচিত রাজমুকুট পরতে বলা হয়, তিনি দৃঢ়স্বরে অস্বীকার করে বলেন, "যার দেশ এত গরীব সে রাজমুকুট কি করে পরবে।" একবার মসজিদে এক ভিখারীর পাশে বসে তিনি নমাজ পড়েছিলেন। আর তাঁর প্রতি প্রেম নিদর্শন করতে গিয়ে যখন শ'খানেক লোক ভিড়ের চাপে মারা যায়, প্রত্যেক পরিবারকে ফারুক ৫০০ পাউণ্ড করে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন। সেই মানুষের এত অধঃপতন কি করে হলো সত্যিই ভাবনার কথা। কাইরোর আবিদিন প্যালেসে যখন যুদ্ধের সময় ফারুক বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন, তখন জীবনের প্রথম 'শক' তাঁকে পেতে হয়। 'ভীচি' (Vichy) গভর্নমেন্টের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করায় ফারুক মন্ত্রিমণ্ডল বরখাস্ত করেন, কিন্তু নতুন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করার আগেই তাঁকে 'শক' খেতে হয় দু'দিন পরে। তখনকার খবরের কাগজের রিপোর্ট থেকে কিছু অংশ তুলে দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে :

"......at 9 p.m. on Febauary 4th, 1942, the British tanks with guns trained surrounded Abidin Palace and thousands of troops, fully armed patrolled the neighbourhood. One tank forced the palace gate, and was followed by the British Ambassador (Lord Kilbarn) who had the G.O.C. British Troops in Egypt with him. The royal body guard was overpowered......the palace telephone wires were cut...The Ambassador demanded the appointment of Nahas Pasha as Prime Minister."

বাইশ বছর আগে কাইরোতে তৎকালীন ব্রিটিশ কমাণ্ডার স্যার লি স্ট্যাকের (সর্দার) হত্যার প্রতিশোধ নিলেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট। দশ বছর পরে ১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাই আবিদিন প্যালেসে আবার একদল সশস্ত্র লোক ঢুকেছিল। এবারও ফারুককে হার মানতে হয়েছিল, কিন্তু ব্রিটিশের কাছে না, নাসের-নগীবের কাছে। সে কথা পরে। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের সেই রাতের ঘটনার পরে ফারুকের হঠাৎ মনে হলো তাই তো যুদ্ধ চলেছে।

আরেক দিনের কথা। ফারুক 'শপিং' করে বেড়াচ্ছিলেন কাইরোতে। গিয়ে ঢুকলেন এক গহনার দোকানে। চোখ পড়লো নারীমান সাদেকের উপর। পরের সপ্তাহে নারীমান সাদেক এলেন আবিদিন প্যালেসে। নারীমানের ফিয়াঁসে—সুপুরুষ যুবক সেই ডিপ্লোমাটের কি হলো মিশরের ইতিহাসে তার কোন মূল্য নেই। নারীমানের ভাগ্য ফরিদার মতো এত খারাপ ছিল না। অন্তত ফরিদার তুলনায় 'ডমিনাণ্ট হরমোন' মেল (male) থাকায় জন্ম হলো শিশু-পুত্র ফুয়াদের। কিন্তু ছ' মাস যেতে না যেতেই আবিদিন প্যালেসে এলেন নাসের আর নগীব। রয়াল ইয়াট-এ করে ২০৪টি সুটকেস্, নারীমান আর ফুয়াদকে নিয়ে ফারুক পালালেন দেশ ছেড়ে। কিছুদিন পরে অবশ্য নারীমানকেও ছাড়লেন। আবার শুরু হলো 'dabbling in wholesale fashion'। কর্নেল নাসেরের দলের কিছু লোক চেয়েছিলেন ফারুককে শেষ করতে, কিন্তু নগীব বাধা দেন। ফারুককে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি কাঁধের উপর মাথাটা নিয়ে যাবেন, না সেটা রেখে যাবেন। ফারুক অবশ্য প্রথমটাই বেছে নিলেন। ক্যাপ্রী পৌঁছে শুরু করলেন কান্নাকাটি "আমার সব লুটে নিয়েছে দুর্বৃত্তেরা। আমি আজ নিঃস্ব।" বিশ্বাস কেউই করলো না। কারণ ইউরোপের ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে তাঁর মোটা অঙ্কের টাকার কথা অনেকেই জানতো। শুরু হলো আবার বিলাসিতার বন্যা। বার্লেস্ক (burlesque) 'শো'র সিজন টিকেট কেনেন, সকালে দশটা ডিম দিয়ে ব্রেকফাস্ট করেন আর সন্ধ্যাবেলায় 'বিকিনী' পরা দশটা মেয়ে তাঁর চাই। দিনগুলো এইভাবেই কেটে যাচ্ছে।

সামিয়া গামেল, এইমী বেরিয়ার, ইরমা মেন্থুটোলো, একের পর এক কত এল গেল ফারুকের এই ৩৮ বছরের জীবনে।

আমার প্যারিসের বন্ধু আমায় বলেছিল—

"This most despised top-drawar personality is more a case for Freudian analysis than mere journalistic curiosity.

তাই ফারুককে অ্যানজিও বীচ, ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা, মন্টিকার্লো আর ক্যাপ্রীতেই ছেড়ে এবার একটু 'সিরিয়স বিজিনেস' আলোচনা করা যাক। সিরিয়াস বিজিনেস মানে নাসের আর নগীব।

অজানা, অচেনা এক সৈনিক একদিন পৃথিবীর সব খবরের কাগজে হেড লাইন সৃষ্টি করলো। 'নতুন আতাতুর্ক', 'নতুন আশা', 'জাতির ত্রাণকর্তা' নানা রকম নামে হঠাৎ অভিহিত হলো এই সৈনিক। ১৯৫২ সালের ২৩ জুলাই-এর মাঝ-রাতের সেই ঘটনার আগে কেই বা জানতো জেনারেল মহম্মদ নগীবকে। মিশরের কুখ্যাত আর্মির মুষ্টিমেয় দেশপ্রেমিক অফিসারদের মধ্যে একজন ছিলেন নগীব। নগীবকে বলা হতো 'স্ট্রং ম্যান', কিন্তু তাঁর মতো কোমলহৃদয় নেতা বোধ হয় বিরল। তিনি কোমলহৃদয় না হলে ফারুককে কাঁধের উপর মাথা নিয়ে যেতে হতো না। কাইরোর সাবার্বনে ছোট বাড়িতে স্ত্রী আর তিন ছেলেকে নিয়ে তিনি থাকতেন। যেদিন তিনি মিশরের প্রেসিডেন্ট হন, তখনও তাঁর মোটরের দেনা শোধ হয়নি। কথা বলতেন কম, শুনতেন বেশি। কি করে তাঁর পক্ষে এই রিভলিউশন সম্ভব হলো ভাবলেও অবাক লাগে। ইজরাইলী-আরব যুদ্ধে নেভেগ মরুভূমির লড়াইয়ে মিশরের শোচনীয় পরাজয়, আর্মস স্ক্যাণ্ডেল, ফারুকের শোষণ আর অত্যাচারে সারা দেশ তখন জর্জরিত। সেনাবাহিনীতে তৈরি হলো গুপ্ত এক সমিতি 'ফ্রি অফিসারস'। ধীরে ধীরে, অতি গোপনে চলতে লাগল প্ল্যান—আর সেই প্ল্যান সফল হলো ২৩শে জুলাই মাঝরাতে নগীবের নেতৃত্বে।

সুদানের মাটির দেয়াল-ঘেরা ওয়াদমেদানী গ্রামে জন্ম মহম্মদ নগীবের। মা-বাপের ইচ্ছে ছেলে হয় উকিল, নয় স্কুলের মাস্টার

হোক। গভীর রাতে যুবক মহম্মদ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। শ্রান্ত, ক্লান্ত, মহম্মদ ১০০০ মাইল দূর এসে পৌঁছলো কাইরোর রয়াল মিলিটারী আকাডামীতে। আবেদন জানালো সেনাবাহিনীতে প্রবেশের জন্যে, কিন্তু গোলমাল বাধলো তাঁর উচ্চতা নিয়ে। নগীব পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চ, কিন্তু নিয়ম পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। ফিরে চললো নগীব আর শুরু হলো কঠিন ব্যায়ামের পরিশ্রম, উচ্চতা বাড়াতেই হবে। এক বছর পরে আবার হাজির আকাডামীতে, কিন্তু এবারে আধ ইঞ্চি কম। তার অধ্যাবসায় আর আকাঙ্ক্ষা দেখে কর্তারা খুশি হয়ে নগীবকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। মহম্মদ নগীব মাত্র ১৯ বছর বয়েসে হলেন সেকেণ্ড লেফটেনেন্ট মহম্মদ নগীব। রাজার প্রিয়পাত্রদের হয় প্রমোশন। বন্ধুরা পরামর্শ দেয় প্রাসাদে একটু ঘোরাফেরা করতে, কিন্তু নগীবের এক উত্তর, 'আমার দ্বারা ওসব হবে না'। এর পরে এল প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ। নগীব তখন ব্রিগেডিয়ার। সিনাই মরুভূমির লড়াইয়ে আহত হলেন। প্যালেস্টাইনের যুদ্ধের সে পরাজয়ের কথা নগীব কখনো ভোলেননি আর ভোলেননি তাদের যারা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিল। মিশরের প্রেসিডেন্ট হবার পর একবার যখন তিনি মিলিটারী ব্যারাক নিরীক্ষণ করছিলেন, এক সুদানী সৈনিককে হঠাৎ চিনতে পেরে তাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে ওঠেন, "দিস ইজ ওয়ান অব মাই বয়েজ"।

কিন্তু মিশরের ক্ষণভঙ্গুর রাজনীতিতে নগীবও থাকলেন না বেশি দিন। তাঁকেও যেতে হলো। রঙ্গমঞ্চে উত্তীর্ণ হলেন কর্নেল আবদেল গামেল নাসের। নগীবের মতো নাসেরও ছিলেন এক নাম-না-জানা অচেনা সৈনিক। মিশরের ১৯৫২ সালের জুলাই মাসের 'কুপ'-এ নাসের ছিলেন অগ্রগণ্য। কিন্তু নগীবের সঙ্গে তাঁর বেশি দিন বনিবনা হলো না। নগীব নিজেই তাঁর লেখা 'ইজিপ্টস্ ডেস্টিনি' বইয়ে তাঁদের দু'জনের মধ্যে মতের অমিল সম্বন্ধে লিখেছেন :

"Abdel Nasser believed with all the bravado of a man of 36 that we could afford to alienate every segment of Egyptain public opinion, if necessary, in order to achieve

our goal. I believed with all the prudence of a man of 53 that we would need as much popular suport as we could possibly retain."

নাসের ভাবতেন নগীব ইজ টু শ্লো আর নগীব ভাবতেন নাসের ইজ টু ফাস্ট। নগীব চেয়েছিলেন ব্রিটিশের সঙ্গে মিত্রতা রাখতে, কিন্তু নাসের চেয়েছিলেন "টু গেট টাফ উইথ দি ব্রিটিশ"। পোস্ট আপিসের কেরানীর ছেলে নাসের। জন্ম উত্তর মিশরের বেনীমের গ্রামে। কুড়ি বছর বয়েসে আকাডামী থেকে কমিশন পান। তার পরের ইতিহাস সুবিখ্যাত। কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, "নাসের কি ডিক্টেটর?" উত্তর নাসের নিজেই দেন। "I have asked myself that same question many times and always pray to God that those who call me a dictator may never prove to be correct."

ডাঃ রফিক জাকারিয়া নাম-করা সাংবাদিক। তিনি বলেন,—"Nasser loves his people too much to be ruthless; he is too honest and sincere to be corrupt; he is too God-fearing and religious to be cruel; he is too fond of his wife and five young children to be heartless, he is too simple and austere in his habits to be pompous. He can not therefore be a dictator."

কাইরোর বিখ্যাত 'আখের সা' পত্রিকায় নাসের তিনটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তাঁর জীবনের অনেক খুঁটিনাটি খবরই পাওয়া যায়। সেই প্রবন্ধ এখন 'ফিলসফি অব দি রিভলিউশন' নামে পুস্তকাকারে বেরিয়েছে। নাসেরকে একবার এক সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করে ২৩শে জুলাই মাঝরাতে আপনারা যখন ফারুকের ঘরে প্রবেশ করেন, তখন কী দেখেন। নাসেরের একজন সঙ্গী জবাব দেন, "the most staggering collection of pornography turned up." অতি অশ্লীল সব ফটো ফারুকের ঘর থেকে বেরোয়।

"যদি ভবিষ্যৎ প্রমাণ করে যে, আমি ভুল আর নাসের ঠিক, আর যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে আমিই নাসেরকে অভিনন্দন জানাবো"—কথাটা বলেছিলেন জেনারেল নগীব। ইতিহাস হয়তো নাসেরকেই ঠিক ঠাওরাবে, কিন্তু সেদিন নগীব হয়তো নাসেরকে অভিনন্দন জানাতে বেঁচে থাকবেন না।

প্রত্যেক দেশ আর জাতির জীবনে কয়েকটা তারিখ অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে। সেই তারিখগুলো রচনা করে ইতিহাস। মিশরের ইতিহাসেও কয়েকটা তারিখ মিশরীদের চিরকাল স্মরণ করিয়ে দেবে অনেক হাসি-কান্না বিজড়িত ঘটনা। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় অদ্ভুতভাবে আর মিশরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ১৮৮১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরের এক সন্ধ্যায় সেনাদলের নেতা ওরাবী আক্রমণ করেছিলেন আবিদিন প্যালেস খদীভ তৌফিককে পদচ্যুত করতে। শতাব্দী শেষ হবার আগেই ২৩শে জুলাই ১৯৫২ সালে নগীব আর নাসের মাঝরাতে আবার যান আবিদিন প্যালেসে রাজা ফারুককে তাঁর ঘনিয়ে আসা দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে। ফারুক পালিয়ে যান রস-এল-তীন প্রাসাদে কিন্তু তিন দিন পর মিশর ছেড়ে তাঁকে পালাতে হয়। এক বছর ঘুরতে না ঘুরতে মিশরকে রিপাবলিক ঘোষণা করা হয় ১৯শে জুন, ১৯৫৩ সালে। কালের চাকা ঘুরে আবার থমকে দাঁড়ালো ১৮ই জুন ১৯৫৬ সালে। সেদিন পোর্ট সৈয়দের ফ্লাগস্টাফে উড়লো মিশরের পতাকা। শেষবারের মতো বেজে উঠলো 'গড সেভ দি কুইন' আর শেষ ইংরেজ সৈন্য ছেড়ে চললো মিশর। ফ্লাগস্টাফের কাছে দাঁড়িয়ে কর্নেল নাসের আনন্দের অশ্রুতে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ২৩শে জুলাই মিশরের নতুন 'কনস্টিটিউশন'-এর ঘোষণা হলো আর ২৬শে জুলাই (এইদিন চার বছর আগে ফারুক সিংহাসন ত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন) নাসের হলেন মিশরের প্রথম প্রেসিডেন্ট। সেই রাতে এক স্তম্ভিত পৃথিবী শুনলো প্রায় একশ' বছর আগে তৈরি "কম্পানী ইউনিভার্স ড্য কানাল মারিতিম্ ড্য সুয়েজ" (Compagnie Universelle due Canal Maritime de Suez)-এর জাতীয়করণ। এর পরের ঘটনা

আজ আর সাবস্তারে বলার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ পৃথিবীতে এমন কোনো লোক বোধহয় নেই যে, বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের কলঙ্কময় সেই দিনটার কথা মনে করে কেঁপে ওঠেনি। কাইরো, আলেকজান্দ্রিয়া, পোর্ট সৈয়দ, সুয়েজ বন্দরে আর শহরে সেদিন হাহাকার উঠেছিল। ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটে অ্যান্থনী ইডেন তখন নরউইজান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ডিনার খাচ্ছিলেন। 'ফিশ কোর্স' সার্ভ হবার সময় শুনলেন মিশরের উপর আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে—৩১শে অক্টোবর, ১৯৫৬।

সুয়েজ ক্যানাল ন্যাশনালাইজেশন আর তার পরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে এত লেখা হয়েছে যে, আমি যদি আবার আলোচনা শুরু করি তাহলে নিউ ক্যাসেলে কয়লা নিয়ে যাবার মতো অবস্থা হবে। কাইরো শহরে বোমা বর্ষণের সেই বর্বর আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ যদি কেউ জানতে চান তাঁদের আমি বিখ্যাত সাংবাদিক শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাইরো থেকে লেখা 'দি ফার্স্ট টেস্ট অব বম্বিং ইন কাইরো' পড়তে অনুরোধ করছি। 'ময়দানে তহরীর'-এর অদূরে বসে অল্-কাহিরার বুকের উপর সে রাতে যে তাণ্ডব নৃত্যের বর্ণনা তিনি লিখেছেন তা অপূর্ব। সেদিন ব্রিটিশ আর ফ্রেঞ্চ আক্রমণকারীরা শুধু মিশরের উপরই আক্রমণ করেনি, তারা সেদিন মানবতার হত্যা করেছিল মিশরের শহরে শহরে। আর যাঁরা আরো বেশি জানতে চান তাঁরা যেন সুইডিশ প্রেস-ফটোগ্রাফার পের-লো অ্যাণ্ডারসনের (Per-Olow Anderson) বৃত্তান্ত পড়েন আর তাঁর তোলা ছবিগুলো দেখেন। সুরাবর্দি সাহেবের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশনের' সময় কলকাতার বর্ণনা দিয়ে কে যেন লিখেছিল, "Smashed jaws, burst eyes, fractured limbs, ripped-open stomachs, crippled men, women and children are a kind of political argument that the 20th Century does not expect".

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে সভ্য ইংরেজ আর ফরাসীরা মিশরে এই 'পলিটিক্যাল আর্গুমেন্ট'ই করেছিল 'ইন দি নেম অব্ পীস্'। অ্যাণ্ডারসনের বিবরণ সবটা এখানে দেওয়া সম্ভবপর নয়। কিছু-কিছু লাইন উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না:—

"......My eye witness story would not be a very nice story to tell children of the world. If it can be called a "police action" what the French and British troops have done to the Egyptians, then there is no place for the word humanity in their dictionaries...I found Port Said a burning smoking inferno...I met children in the bombed out-houses and among the ruins searching for their parents. I saw parents, they too were searching with bleeding hands in the wreckages that were left of their homes, to find their killed children. I saw thousands of dead bodies in smaldering smoking ruins, in the backyards of the few hospitals that were still left...two hospitals where 900 patients were blown up. I call it terror and murder... It is a shame for England and a black-spot which can never be cleaned off. I have been a war photographer since the civil war in Spain and it is hard for me to find any comparison to Port-Said, horror and terror against civilians...I had seen the corpses of the civilians, children as well as women with the holes in their backs as they had been shot whilst running away. I counted 270 dead carried away in the two hours I was there...There is not much more to say...it could never be put into words but my pictures of the father over his dead little daughter and the wounded mother holding her dead little daughter are documents that will never be forgotten"...

৩১শে অক্টোবর আর তারপরের ক'টা দিনের কাহিনী আজ পড়তে পেলে সুয়েজ নির্মাতা ফার্দিনান্দ মারী গু লেসেপস (Fardinand Marie de Lesseps) কি করতেন বলা যায় না। মিশরের ওয়ালী মহম্মদ সৈয়দ বা খদীভ ইসমাইল অথবা ডিজরেইলীরও মনের অবস্থা কি হতো এখন তা বলা কঠিন।

১৪ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করে ১৮৬৯ সালে ১৭ই নভেম্বর সুয়েজ ক্যানাল উদ্ঘাটনের উৎসব হয়। গিসেপ ভার্দী (Guiseppe Verdi) সেই উৎসবের জন্য তৈরি করেন তাঁর বিখ্যাত সঙ্গীত 'আইদা' (Aida)। 'আইদা'র সুমধুর সঙ্গীত চাপা পড়েছে

কাইরো, আলেকজান্দ্রিয়া, পোর্ট সৈয়দ আর সুয়েজের ধ্বংসস্তূপে। মৃত্যুর ক্রন্দনরোল উঠেছিল সেদিন ৩১শে অক্টোবর মা-হারা শিশু, শিশু-হারা মা, পুত্র-হারা জননী, স্বামী-হারা স্ত্রী আর ভাই-হারা শত শত বোনের বুক থেকে।

কিন্তু প্যাট্ আবার আমায় আমেরিকা থেকে লিখলো,—

"Dear Taroon—from the ruins of Cairo, Port Said, Alexandria and Suez—on the ashes and dead bodies of the Egyptians—is rising a new Egypt"....

কাইরো, পোর্ট সৈয়দ, আলেকজান্দ্রিয়া, সুয়েজের ধ্বংসস্তূপের উপর আর শত শত মিশরীদের মৃতদেহের উপর নতুন মিশর তৈরি হচ্ছে। ওয়ালী, ফারাও, খদীভ, ক্লিওপেট্রা, টুটেনখামেন, রামেসিস্ আর ফারুকের মিশর না, নাসের নগীব আর লক্ষ লক্ষ 'ফেলাহিন'-এর মিশর। সাহারা আর সিনাই মরুপ্রান্তরের চক্রবালের কোল ঘেঁষে নতুন রক্ত-রাঙা সূর্যের উদয় হচ্ছে। প্যাটের কথাই যদি সত্যি তাহলে বালুরাশীর উপর যে মিশরী রক্তের ধারা ঝরে পড়েছে তা তো বৃথা হবে না।

প্যাট্কে জবাব দিয়েছিলাম—"ডিয়ার প্যাট্—আই প্রে টু গড্, ইফ্ দেয়ার ইজ ওয়ান, দ্যাট্ ইউ প্রুভ ট্রু। দি প্রাইস্ পেড্ উইল বি ওয়ার্থ অল দিস্ ব্লাড্ টিয়ারস্ অ্যাণ্ড টয়েল"।

সতেরো

সাক্কারার অভিশপ্ত পিরামিডের কাহিনী শোনাচ্ছিল কামাল সালেহ।

পাঁচ হাজার বছর আগে ঐশ্বর্যশালী মেমফিস্ নগরী দাঁড়িয়েছিল সাক্কারার পিরামিডের কাছে। একের পর এক দুনিয়ার যত ইজিপ্টোলজিস্ট, আর্কেলজিস্ট এবং আরও অনেক কে [illegible]লী লোক এসেছে এই পিরামিডের রহস্য উদ্ঘাটন করতে,

কিন্তু ফারাও-এর অভিশাপ থেকে কেউ বাঁচতে পারেনি। এই তো কিছুদিন আগে রাজা শেনখেত-এর সমাধি খোঁজা হচ্ছিল সাক্কারার পিরামিডে, হঠাৎ পাথরের স্তূপ ধ্বসে পড়ে জীবন্ত সমাধি হয় অনেকেরই। কেউ এসেছে ঐশ্বর্যের লোভে, কেউ এসেছে নিছক কৌতূহল নিবারণ করতে আর কিছু এসেছে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করতে, কিন্তু কতটুকু রহস্যই বা তারা ভেদ করতে পেরেছে ?

কামাল সালেহ্ শিক্ষিত, ইউনিভার্সিটির ছাত্র, অনেক দেশ ঘুরেছে আর অনেক জিনিসই দেখেছে। তার কাছ থেকে এইরকম একটা দৃষ্টিভঙ্গি আমি ঠিক আশা করিনি, তাই জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু তুমি সত্যিই এ কার্স অব দি ফারাও বিশ্বাস করো।"

"না বিশ্বাস করেও তো উপায় নেই। বিংশ শতাব্দীর যুবক আমি, এইসব কথা অন্ধ বিশ্বাস বলে আমার হেসে উড়িয়ে দেওয়া উচিত, তাই না ? কিন্তু হাজার হাজার বছর পুরনো এই পিরামিড আর স্ফিঙক্স যখন দেখি, তখন কেন জানি না সত্য-মিথ্যা জড়ানো কাহিনীগুলো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।"

"লর্ড কার্নাভন আর হাওয়ার্ড কার্টারের কাহিনী জানো ?" কামাল আমায় জিজ্ঞাসা করে। বললাম, "লর্ড কার্নাভনকে আমি শুধু লুক্সারে 'ভ্যালী অব দি কিংস'-এ যুবক ফারাও টুটেনখামেনের সমাধির আবিষ্কর্তা হিসেবেই জানি।"

"তাহলে তুমি কিছুই জানো না" অম্লান বদনে কামাল জবাব দেয়। "তুমি কি জানো লর্ড কার্নাভন শেষ পর্যন্ত টুটেনখামেনের 'মামি' দেখতে পাননি। তিনি শুধু দেখেছিলেন টুটেনখামেনের সিংহাসন আর অফুরন্ত মণিমুক্তা। সোনার কফিনের গোলাপী-রং-এর গ্রানাইটের সেই ডালা খুলবার অনেক আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।"

"আশ্চর্য।"

"হ্যাঁ সত্যিই আশ্চর্য। তুমি জার্নালিস্ট। সত্য প্রামাণিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সব জিনিসকেই মিথ্যা মনে করো। কিন্তু লর্ড কার্নাভন ফারাওদের অভিশাপ থেকে বাঁচতে পারেননি।

টুটেনখামেনের সমাধিতে লেখা ছিল যারা এই ঘুমন্ত ফারাওদের ঘুম ভাঙাবে নিশ্চিত মৃত্যু তাদের ভাগ্যে। কার্নাভন গিয়েছিলেন ঘুম ভাঙাতে আর তাই মৃত্যু তাঁকে রেহাই দেয়নি।"

"কামাল, তুমি নিজে বিশ্বাস করো এই সব?" আবার প্রশ্ন করি।

"আবার তোমার সেই এক প্রশ্ন। আমার বিশ্বাস করা-না-করাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু ফ্যাক্টস্ আর ফ্যাক্টস্। তাহলে শোনো। লর্ড কার্নাভন তখন টুটেনখামেনের সমাধি নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। একদিন বিষাক্ত একটা মাছি তাঁকে কামড়ায়। সেই তাঁর কাল হলো। সমস্ত মুখ চোখ ফুলে গেল, কথা বন্ধ। কার্নাভনকে নিয়ে যাওয়া হলো কাইরোতে। মৃত্যুর সময় তাঁর বন্ধু হাওয়ার্ড কার্টারকে বললেন,

"The wing of death will overtake all those who disturb the pharaoh's tomb and when the angel of death comes he kills a baby and a tired old man".

"ভ্যালী অব কিংস-এ একটা 'টুমস্টোনে' এই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণী লেখা ছিল। শুধু আমি না লর্ড কার্নাভনও ফারাওদের অভিশাপের কথা বিশ্বাস করতেন। একবারের জন্যেও কার্নাভন টুটেনখামেনের 'মামি' স্পর্শ করতে পারেননি। স্বামীর কফিনে সযত্নে কিছু ফুল রেখেছিলেন রাজমহিষী আঙ্কেসন-আমেন। লর্ড কার্নাভন তাও দেখতে পাননি আর টুটেনখামেনের সেই সোনার 'অ্যামুলেট' দেখার সৌভাগ্যও তাঁর হয়নি।"

"কিন্তু তুমি কি প্রমাণ করতে চাইছো কামাল?"

"আমি কিছুই প্রমাণ করতে চাইছি না। আমার কথা আগে শোনো, তারপর নিজেই চেষ্টা করো বুঝতে। হাওয়ার্ড কার্টার, কার্নাভন মারা যাবার পর টুটেনখামেনের রহস্য ভেদ করেন। কার্টার অভিশাপে মারা যাননি কিন্তু কফিন খোলার সময় তিনি হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যান আর সেই আঘাতের যন্ত্রণায় তাঁকে ভুগতে হয় অনেক দিন।"

"তারপর?"

"তারপর শুনবে? কার্নাভন যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন,

এক্সরে স্পেশালিস্ট ডাঃ রীড যিনি টুটেনখামেনের 'মাম্মি' পরীক্ষা করেছিলেন হঠাৎ লণ্ডনে আগুনে পুড়ে মারা যান। আরো শুনতে চাও? কার্নাভন সাহেবের দলের আরেকজন সদস্য ইভলীন্ হোয়াইট কিছুদিন পরে বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা করেন আর দলের আর্কেলজিস্ট ডাঃ মেস আর লর্ড কার্নাভনের প্রাইভেট সেক্রেটারীও কয়েকদিনের মধ্যে মারা যান। তারপর কার্নাভনের ভাই অরবী হার্বার্ট আর আর্থার উইগল। আরো আছে। বৃদ্ধ লর্ড ওয়েস্টবারী (কার্নাভনের সেক্রেটারীর পিতা) লণ্ডনে হোটেলের জানলার উপর থেকে নিচে কঠিন পাথরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। পাঁচ বছর পরে লেডী কার্নাভনও মারা যান। আশ্চর্য যোগাযোগ, তাঁরও মৃত্যু হয় বিষাক্ত মাছির কামড়ে। আরো জানতে চাও? পঁচিশ বছর পরে আবার সাক্কারার পিরামিডে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না কিন্তু প্রাচীন ফারাওদের অভিশপ্ত সাক্কারার পিরামিডের কাহিনী আমি বিশ্বাস করি আর শুধু আমিই না আমার মতো অনেক শিক্ষিত মিশরীও মনে মনে বিশ্বাস করে।"

কামাল সালেহ্ আমার বিশিষ্ট বন্ধু। তার বিশ্বাস আমি ভাঙতে চাইনি আর তা ভাঙাবার মতো তর্ক বা যুক্তিও আমার কাছে ছিল না। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে অনেক পুরনো কথাই আমরা অলীক বলে উড়িয়ে দিই। কিন্তু কামালের কাহিনী শোনার পর পিরামিডে ঢোকার সাহস আমার হয়নি। অনেকেই আমার এ কথা শুনে হয়তো হাসবেন। না হাসাটাই আশ্চর্য। দলে দলে টুরিস্টরা যায় পিরামিড আর স্ফিঙক্স দেখতে, তাদের তো ভয় হয় না, আমারই বা কেন হলো? কি উত্তর দেবো? সব টুরিস্টদের হয়তো কামাল সালেহর সঙ্গে দেখা হয় না। মিশরে গিয়ে সেই অন্ধকারময় কুঠুরির ভিতরে কেন যে আমি ঢুকিনি তা ভেবে আমার নিজেরই মাঝে মাঝে অবাক লাগে। কেন যাইনি তা বোঝানো আজ কঠিন, কিন্তু শুধু এইটুকু বলতে পারবো গিজের সেই অতিকায় পিরামিডের সামনে দাঁড়িয়ে কেমন যেন একটা অজানা ভয় আর আতঙ্ক আমায় জড়িয়ে ধরেছিল।

"ভিতরে যাবে না?" কামাল জিজ্ঞাসা করেছিল।

"না।"

"তোমার কি ভয় লাগছে?"

"বোধহয়।"

অভিশপ্ত কাহিনী শোনবার পর হেসে কথাটা উড়িয়ে দেবার ছলে কামাল বলে, "আমি তো তোমায় সাক্কারার পিরামিডের কথা বলেছি, গিজের পিরামিডের কথা তো বলিনি।"

"না, এই তো বাইরে থেকেই বেশ লাগছে।"

উত্তর দিয়েছিলাম কামালকে। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম আমার পা দুটো কে যেন চেপে ধরে আছে। এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছি সেই অতিকায় পিরামিডের দিকে। ধীরে ধীরে একলাখ মজুরের মেহনতে কুড়ি বছরে গড়ে ওঠা সেই বিরাট পাথরের স্তূপ যে কতক্ষণ পর্যন্ত দেখেছি খেয়াল ছিল না। সম্বিত ফিরে এল কামালের ডাকে।

দেশে ফিরে এসে সেদিনের কথা মনে করে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি অনেকবার কিন্তু কেন যে সেদিন এইরকম অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম তার সঠিক কারণ আজও খুঁজে পাইনি। 'সুপারস্টিশন' বা অন্ধ বিশ্বাস আমার নেই কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্য আসা এক অদ্ভুত ভয় আমাকে পিরামিড দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে, আর 'টু প্যারিস উইথ ইওর ওয়াইফ?' (স্ত্রীকে নিয়ে প্যারিসে?) বলে অনেকে যেমন অবাক হন, তেমনি আমাকেও বহুবার 'টু ইজিপ্ত অ্যাণ্ড ডিডণ্ট সি পিরামিড?' (মিশরে গেলে আর পিরামিড দেখলে না?) শুনে চুপ করে থাকতে হয়েছে।

মিশরের প্রায় সত্তরটা পিরামিডের সম্বন্ধেই সত্যি-মিথ্যে জড়ানো অনেক কাহিনী শোনা যায়। গ্রীক পর্যটক হেরদুত (Herodotus) মিশর ঘুরে আসার পর অনেক গল্পই পিরামিড আর স্ফিংক্স নিয়ে শোনা গিয়েছে। স্ফিংক্সকে বলা হয়েছে রূপকথার সেই দানব যে লোকদের কঠিন কঠিন ধাঁধা জিজ্ঞাসা করতো আর উত্তর দিতে না পারলে টুঁটি চেপে মেরে ফেলতো।

তারপর খুফুর পিরামিড নিয়ে তো এন্তার কিংবদন্তী প্রচলিত আছেই। ইজিপ্টোলজির বিখ্যাত প্রফেসর ডাঃ সেলিম হুসেন কিছুদিন আগে এইসব কিংবদন্তীর উত্তর দিয়ে হলিউড নির্মিত 'ল্যাণ্ড অব দি ফারাওস' ফিল্মের তীব্র সমালোচনা করেন। কামাল সালেহকে নিয়ে সেই সব কাহিনী শুনতে শুনতে কত যে ঘুরেছি তার ইয়ত্তা নেই। নীল নদের দিকে মুখ করে সজাগ প্রহরীর মতো শান্ত স্ফিঙ্কসও দেখেছি আর আকাশছোঁয়া পিরামিডের সামনেও অভিভূত হয়ে প্রণাম জানিয়েছি তাঁদের, যারা হাজার হাজার বছর আগে বাস্তবে পরিণত করেছেন যা আজও আমাদের কল্পনার বাইরে।

আঠারো

"ও গ্যানদী, হি ওয়াজ অ্যাজ্ গ্রেট্ অ্যাজ্ আতাতুর্ক"— 'দী'র উপর অনাবশ্যক আর অস্বাভাবিক জোর দিয়ে অতি সহজভাবেই আমার প্রশ্নের উত্তর দেয় গুলর। আতাতুর্ক 'গ্রেট' আমি জানি, কিন্তু 'গ্যানদী'কে 'অ্যাজ্ গ্রেট্ অ্যাজ্ আতাতুর্ক' উত্তরটা আমার ঠিক মনঃপূত হয় না। কিন্তু এটাও বেশ জানতাম যে, ইউনিভার্সিটির সাইকোলজির ছাত্রী গুলর যে উত্তরটা আমায় দিলো, টার্কীর আবালবৃদ্ধ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সবাইকার কাছ থেকে আমি এ ছাড়া অন্য কোনো জবাবই পেতাম না। যখন গুলর গান্ধীজিকে 'অ্যাজ্ গ্রেট্ অ্যাজ্ আতাতুর্ক' বলেছে তখন সে একজন তুর্কীর পক্ষে অন্য যে কোনো মহান ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ সম্মানই দিয়েছে, কারণ তার কাছে আতাতুর্ক-এর মহানতা বা 'গ্রেটনেস' 'লাস্ট ওয়ার্ড' বা শেষ কথা। গান্ধীজি যখন আতাতুর্কের মতোই মহান, সুতরাং তিনি জগতের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

'কামাল আতাতুর্ক'—কি অদ্ভুত এক যাদু এই নামটার, সারা

টার্কীতে। হোটেল, রেস্তোরাঁতে, আপিসে, ট্রামে, বাসে যেখানে যাও আতাতুর্কের ছবি। নতুন টার্কীর জন্মদাতা আতাতুর্কের স্মৃতি নিয়েই টার্কী আজ বেঁচে আছে। তা নাহলে কবে ছারখার হয়ে যেতো। অন্ধের মতন পশ্চিমের অনুকরণ করে চলেছে টার্কী, কোথায় যে এর পরিণতি বলা কঠিন। কিন্তু ঐ একটা লোকের নামের দৌলতে সারা দেশটা এখনো এক সূত্রে বাঁধা আছে। ডেমোক্রেটিক পার্টির গভর্নমেন্টই হোক আর বিরোধী রিপাবলিকান পার্টিই হোক দু'দলেই আতাতুর্কের নামে শপথ করে। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, আতাতুর্কের হাতে গড়ে ওঠা রিপাবলিকান পার্টি আজ টার্কীর পার্লামেন্টে বিরোধী পক্ষ।

আতাতুর্ক টার্কীর জন্যে অনেক কিছুই করেছেন কিন্তু তার মধ্যে একটা বিরাট কাজ হলো তিনি তুর্কী ভাষাটাকে ভেঙেচুরে, দুমড়ে মুচড়ে অতি সহজ করে দিয়েছেন। ফার্সী আর আরবী লিপি জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি শুরু করলেন ল্যাটিন লিপি। কিন্তু বড় স্বাভিমানী দেশ টার্কী তাই ল্যাটিন লিপি থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকটা জিনিসের জন্যে একটা করে তুর্কী নাম দেওয়া আছে যাতে কেউ না বলতে পারে যে, অমুক নামটা বিদেশী শব্দ। স্যালুনকে স্যালুনী, হোটেলকে ওটেলি, ব্যাংককে ব্যাংকাসী, আর সিগারেটকে সিগারা বলে তুর্কীরা বলবে এগুলো তুর্কী শব্দ। আসল ব্যাপার এই যে, আতাতুর্ক চেয়েছিলেন ভাষা এমন হওয়া উচিত যা রাস্তার লোক মানে 'ম্যান অন দি স্ট্রীট'ও সহজে বুঝতে পারে। এমন এন্তার শব্দ আছে যা বিদেশী প্রচলিত শব্দটাকে একটু বদলে দিয়ে তুর্কী বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের দেশে কিন্তু ঠিক উল্টো ব্যাপার। বিদেশী শব্দ বর্জন করার জন্যে কয়েকজন হিন্দীওয়ালা এমন অদ্ভুত শব্দ তৈরি করতে লাগলেন যে, তার উচ্চারণ করাই শক্ত। 'নেক-টাই'-কে 'কণ্ঠ-ল্যাঙোটি'; 'পিন-ড্রপ-সাইলেন্স'কে 'সুঁইপটক্-সন্নাটা'; 'রেলওয়ে সিগন্যাল'কে 'অগ্নিরথ-আবাগমন-লৌহদর্শক-দিকদর্শিকা'; 'রেলওয়ে ইঞ্জিন'কে 'লৌহ-পথ-পটরী-পর-চলনে-

ওয়ালী-বাষ্পকরথ' আর সিগারেটকে 'শ্বেত-ধূম্রদণ্ডিকা' করার মতো পাগলামি টার্কীতে হয়নি।

কিন্তু টার্কীর কয়েকটা শব্দের উৎপত্তি বা মানে আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি। যেমন টার্কীতে ওরা লিখবে 'সি' (C), কিন্তু উচ্চারণ করবে 'জে' (J)। টার্কীর প্রেসিডেন্টের নাম জালাল বেয়ার, কিন্তু ওরা লিখবে 'সেলাল বেয়ার' (Celal Bayer)। আবার T. C. দেখে বুঝতে হবে 'তুর্কীয়ে জমহুরিয়েত' (Turkish Republic) বা ইস্তানবুলের বিখ্যাত সংবাদপত্রের নাম যদিও জমহুরিয়েত, কিন্তু লেখা হয় 'কামুহিরিয়েত' (Cummuhiriyet)। আমাদের দেশে 'কুমারী', ফরাসীতে 'মাদমোয়াজেল', ইংরেজিতে 'মিস', জার্মানিতে 'ফ্রলিন', স্পানিশ আর ইটালিয়ানে 'সিনোরিটা', কিন্তু টার্কীতে 'বুয়ন'। এই কথাটা যে কোথা থেকে এসেছে বলতে পারলাম না। কুমারী মেয়ে হলে নামের আগে লিখবে 'বুয়ন', যেমন (Bn) Gular—কুমারী গুলর।

'তামাম' কথাটা টার্কীতে হরদম ব্যবহার হয়। সাধারণতঃ 'তামাম' কথাটার দু'রকম মানে হয়। এক হচ্ছে 'শেষ'—যেমন কাম-তামাম হোগয়া—কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। আরেকটা অর্থ 'সব'—'তামাম লোগোঁকো ইতলা দি যাতী'—সবাইকে জানানো হচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু টার্কীতে এ-কথাটা প্রায় ন্যাশনাল মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়েছে। বারে গিয়ে বিয়ারই চাও বা ট্যাক্সিওয়ালাকে 'আয়া সোফিয়া'ই পৌঁছে দিতে বলো ঐ এক বুলি—তামাম আর তামাম।

এই ভাষার ব্যাপার নিয়ে একদিন পড়ে গেলাম ভীষণ গোলমালে। হোটেলে গিয়ে চাইলাম 'রাইস'—ভাত। কাকস্যপরিবেদনা। বেয়ারা হাঁ করে চেয়ে রইলো। ছবি এঁকে, নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে বোঝাতে চেষ্টা করি—'রাইস' কাকে বলে, কিন্তু বেয়ারা একেবারে 'স্পীকটি-নট্'। কিছুতেই সে বোঝে না। দু'চোখে আঙুল দিয়ে বললাম, আমাকে রান্নাঘরে নিয়ে চলো। রান্নাঘরে গিয়ে দেখালাম 'রাইস'। একগাল হেসে এবার বেয়ারা বলে, 'তামাম, তামাম, পিলাও'। হরি হে,

ভাতকে যে এরা পিলাও বলে তা কে জানতো। পোলাওকে কি বলে, তা জানতে গিয়ে আরেকটা বিভ্রাটের সৃষ্টি করতে অবশ্য আর সাহস হয়নি।

ইস্তানবুলের কোনাক্ হোটেলে ছিল দুনিয়ার একরাশ ভাষার জগাখিচুড়ি। আমার পাশের ঘরে গ্রীক, বাঁ পাশে ফ্রেঞ্চ, সামনে তুর্কী আর পেছনে খাস বাগদাদী আরবী। সমস্ত দিন এথেন্সের হেলেন অর্ফ্যানোসের 'ন্যারো' (Naro), বাগদাদের রশীদ আহমদের 'মায়ি বারিদ,' প্যারিসের ডাঃ অ্যাঁরী স্যুবলের 'ভ্যারঢো' আর আনকারার আহমৎ ডিনগারের 'স্যু' শুনতে শুনতে আমার অবস্থা কাহিল। কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু জানতে পারলাম, হেলেনের 'ন্যারো' আর আহমতের 'স্যু' মানে জল, রশীদের 'মায়ি বারিদ' মানে ঠাণ্ডা জল আর ডাঃ অ্যাঁরীর 'ভ্যারঢো' মানে জলের গ্লাস।

হেলেন অর্ফ্যানোস ইস্তানবুলে এসেছে 'গ্রীক ইনফ্লুয়েন্স অন টার্কীশ কালচার'—তুর্কী সংস্কৃতির উপর গ্রীক প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করতে। মোটা ফ্রেমের চশমা-পরা, রোগা, এই তরুণীটিকে আমার বেশ লাগতো। সকাল-বিকেল যখনই দেখা হয়, হেলেনের হাতে বিরাট মোটা এক বই। একটু হাল্কা হেসে করিডরে পায়চারি করতে করতে আবার তার পড়া শুরু হতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতো সেই পদচারণা। নিজের ঘরে বসে শুনতে পেতাম হেলেনের পায়ের ঢিলে স্লীপারের অবিশ্রান্ত একটানা শব্দ—'সুস্—সুস্—সুস্'। একদিন তার রাতদিন পড়া নিয়ে সাহস করে মন্তব্য করতে গিয়ে টার্কীর উপর গ্রীসের প্রভাব সম্বন্ধে এমন এক লেকচার খেয়েছি যে, হেলেনকে আর ঘাঁটাতে সাহস হয়নি।

আর মঁশিয়ে অ্যাঁরী স্যুবল হীরে-জহরতের ব্যবসাদার। কিসের যে ডাক্তার তা জানি না, কিন্তু নামের আগে ডাক্তার লেখা তাঁর কার্ড দেখেছি। বেশ গোলগাল চেহারা, প্রায় সময়ই হোটেলের বারে বসে থাকতেন। গুডমর্নিং বললেই ফরাসী ভাষায় জবাব দিতেন, 'বঁ্য জুর'। যখনই দেখা হয় 'হোয়াত আবাউট এ ড্রিংক?' জিজ্ঞাসা করেন। 'আই তেল ইউ মঁশিয়ে দিস জুর্নল ওয়ার্ক

নো গুড্। ব্রেদ্ অ্যাণ্ড কোমার্স ভেরি গুড্। লট্ অব মানি'। যতদিন হোটেলে ছিলাম ডাঃ অ্যারী আমায় খবরের কাগজের কাজ ছেড়ে ব্যবসা করতে উপদেশ দিয়েছেন। তাই তাঁকে দেখলেই একটু পাশ কাটাবার চেষ্টা করতাম। আহমৎ ডিনগার আর রশীদ আহমদ দু'জনেই একটু আলাদা রকমের তাই ওদের দু'জনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুধু 'হ্যালো, হ্যালোর' মধ্যেই সীমিত ছিল। ডাইনিং টেবিলে বসে প্রথমেই আহমৎ অর্ডার দিতো 'বীর বীরা' (এক বোতল বিয়ার)। চুপচাপ খেয়ে-দেয়ে আবার চলে যেতো নিজের ঘরে। প্রায়ই দেখতাম, লাউঞ্জে বসে হাতের কর গুনে টাকার হিসেব করতো—'বীর ইকি, উচ্ ইকি-বুচক, অন, ইল্লি'—এক, দুই, তিন, আড়াই, দশ, পঞ্চাশ। রশীদ আহমদ যে কেন ইস্তানবুলে এসেছিল বা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কোথায় যে থাকতো, তা কোনো দিনই জানতে পারিনি। একটু রহস্যময় মনে হতো ওকে।

সেদিন সকালে সবে চায়ের কাপে মুখ দিয়েছি—এমন সময় দরজায় মৃদু টোকা। এখানে আবার আমার কাছে কে আসবে? জন থমাস্ তো বউকে নিয়ে বুরসা (টার্কীর হিল স্টেশনে) গিয়েছে। তবে কি এম্ব্যাসীর সুরিন্দর্ চোপরা? কিন্তু দরজা খুলতেই যাঁর প্রবেশ হলো, তাঁকে দেখে আমার না আশ্চর্য হওয়াটাই আশ্চর্য হতো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মোটা বই হাতে হেলেন অর্ক্যানোস। হেলেনকে আমার ঘরে দেখবো আমি আশা করিনি। কারণ তার সঙ্গে আমার পরিচয় শুধু ঐ একটু হাল্কা হাসি আর স্লীপারের 'সুস্—সুস্—সুস্'। কিন্তু হেলেনের মূর্তি দেখে মনে হলো সে বেজায় চটেছে। টিকোলো নাকটা রাগের আবেশে লাল হয়ে উঠেছে, হাত-পা থরথর করে কাঁপছে, ঘন ঘন চশমার কাঁচটা মুছবার ভান করে, রাগ ঢাকবার চেষ্টা করছে হেলেন। শান্ত, গম্ভীর, 'স্কলারলি' হেলেনের এ রূপ আমার কাছে স্বপ্নের অতীত।

"একটা সিগারেট দিতে পারেন আমাকে"। হেলেনের স্বর হুকুমের মতোই শোনায়।

"সিগারেট?"—আমি অবাক।

"ইয়েস, ইয়েস"—হাঁ-হাঁ সিগারেট।

আমার দেবার অপেক্ষা না করেই হেলেন কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে আবার জিজ্ঞাসা করে, "হোয়ার ইজ স্পিরৃতা" —দেশলাইটা কোথায়? সিগারেটটা ধরিয়ে দেবার পর মিনিট খানেক ধরে ঘন ঘন কয়েকটা টান মেরে একরাশ ধোঁয়া ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে হেলেন ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ে।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি, "হোয়াট ইজ দি ম্যাটার?"—কি হয়েছে কি?

"পারাকেলো—প্লিজ—দয়া করে চুপ করে একটু বসতে দিন আমাকে"—হেলেন এবার কাতর স্বরে মিনতি করে। নিরুপায় হয়ে চুপ করে বসে রইলাম। খানিকক্ষণ পরে নিজেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করলো হেলেন "হাউ ডেয়ার হি, ছাট বুলি অব এ টার্ক—এত সাহস ঐ তুর্কীটার"।

কিছুই বুঝতে না পেরে আবার চুপ করে রইলাম। "হি কলস্ মি এ ম্যাড উওম্যান"।

একটু বুঝিয়ে বলতে ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। খানিকক্ষণ আগে নাকি আহমৎ ডিনগারের সঙ্গে হেলেনের ভীষণ তর্ক বাধে। আহমৎ ডিনগার অম্লানবদনে বলেছে যে, তুর্কী সংস্কৃতির উপর গ্রীসের কোন প্রভাবই নেই। যুক্তিতর্কে যখন পেরে উঠেনি, আহমৎ তখন নাকি হেলেনকে 'ম্যাড উওম্যান', মানে পাগলী বলেছে। হেলেনকে বোঝালাম যে, আহমৎ অতি নির্বোধ, সে কিছুই বোঝে না সুতরাং তাকে 'সিরিয়াসলি' নেবার কোনো মানে হয় না (হেলেনের ব্যাপার দেখে তখন আমারও যে তাকে ম্যাড উওম্যান বলার ইচ্ছে হচ্ছিল, তা আর বললাম না।)

একটু চটাবার জন্য প্রশ্ন করলাম, "ডাজ হি অলসো সে ছাট সাইপ্রাস ইজ টার্কীশ—সে কি সাইপ্রাসকেও তুর্কীদের বলে দাবি করেছে নাকি?"

হেলেন এমন মুখভঙ্গি করলো, যার মানে এই যে, 'একবার করে দেখুক না'। মুখে শুধু বললো, 'সাইপ্রাস যে গ্রীকদের, সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।'

এই ঘটনার পরে কোনাক্ হোটেলে আমিই এক হেলেনের বন্ধু হয়ে দাঁড়ালাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেলেন আমাকে শুনিয়েছে গ্রীসের আর টার্কীর ইতিহাস। নিজের পয়সা খরচ করে 'দোলমুস' (ট্যাক্সি) ডেকে আমায় ঘুরিয়েছে সারা ইস্তানবুল। ফতিহা মসজিদ, বেয়জিদ্ মসজিদ, সুলেমানিয়ে মসজিদ, ইয়েনী মসজিদ, সুলতান আহমদ মসজিদ, সেলিমিয়া মসজিদ, শাহজাদে মসজিদ, আয়া সোফিয়া আরো কতশত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি হেলেনের সঙ্গে। প্রত্যেক জায়গায় গিয়েছি আর হেলেন বর্ণনা করেছে তার ইতিহাস। সব সময় গ্রীক প্রভাব সম্বন্ধে ওর সঙ্গে একমত না হতে পারলেও হেলেনের জ্ঞান সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহই ছিল না।

তকসীম স্কোয়ারের কাছেই পার্কের বেঞ্চিতে বসে হেলেন বলছিল টার্কীর ইতিহাস। মাত্র চার হাজার লোক সঙ্গে নিয়ে মধ্যএশিয়ায় নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে অথোমান এসে আশ্রয় চায় সেলজুক রাজার কাছে। সেলজুক রাজা তাদের আশ্রয় দেন আঙ্গারার (আনকারা) কাছে। ধীরে ধীরে অথোমান সমস্ত রাজ্যটাই নিজের দখলে করে নেয়। কিন্তু বাধা পায় পশ্চিমে গ্রীক রাজ্যের কাছে।

"কিন্তু অতো বড় গ্রীক রাজ্য আর অভেদ্য কনস্টান্টিনেপল (ইস্তানবুল) শেষ পর্যন্ত তারা দখল করলো কি করে?"

"থামো। কনস্টান্টিনেপল দখলের চেষ্টা তাদের বহুবার ব্যর্থ হয়। কিন্তু শেষে যখন তুর্কীরা কনস্টান্টিনেপল দখল করে, তারা এক রাতের মধ্যে সব কাজ শেষ করে। হাজার হাজার তেল-মাখানো কাঠের গুঁড়ি রাস্তায় পেতে নিঃশব্দে তার উপর দিয়ে নৌকো গড়িয়ে তারা বসফরাসের তীরে 'গোল্ডেনহর্নের' মধ্যে দিয়ে নেমে শহর আক্রমণ করে। সুলতান মহম্মদের তুর্কীয় সৈন্যেরা কনস্টান্টিনেপলের সেই গেট ভেঙে শহরে ঢুকে খ্রীষ্টানদের ক্রশ যেখানে শত শত বছর থেকে ছিল, সেখানে স্থাপন করে ইসলামের সবুজ পতাকা। সেই থেকে শুরু হয় অথোমান রাজত্ব।"

"তার আগে?"

"কান্ট ইউ কীপ কোয়ায়েট ফর সাম টাইম?" ধমকানি দেয়

হেলেন। করার কিছুই নেই। একবার যখন 'ম্যাড উওম্যান'-এর খপ্পরে পড়েছি, টার্কীর ইতিহাস না শুনিয়ে ছাড়বে না। তবু বেশ লাগছিল, তাই বললাম, "ক্যারী অন, আই অ্যাম সরী।"

"এখন নাম হয়েছে ইস্তানবুল, তার আগে ছিল কনস্টান্টিনেপল। তারও আগে ছিল বাইজান্টিয়াম। বাইজাস আর গ্রীক কলোনিস্টরা এসেছিল খৃষ্টাব্দ ৬৫৭ সালে। সেই থেকে নাম বাইজান্টিয়াম। বাইজাস ভেবেছিল ডেলফীর অরাক্যাল (Oracle of Delphi) প্রতিশ্রুত সাফল্য এইখানেই পাওয়া যাবে। কিন্তু তাদের রাজত্বও টিকলো না বেশিদিন, এল রোমানরা। পুরনো বাইজান্টিয়াম ছাড়িয়ে রাজা কনস্টান্টাইন তৈরি করলেন নতুন রাজধানী বসফারাসের কাছে। সাতটা পাহাড়ের উপর তৈরি রোম, তাই কনস্টান্টাইনও রাজধানী বসালেন সাতটা পাহাড়ের উপর, আর নাম দিলেন 'নোভা রোমা'— নতুন রোম। কিন্তু ধীরে ধীরে নাম হয়ে গেল কনস্টান্টিনেপল। তারপর এল অথোমান সাম্রাজ্য, তার কথা তোমায় আগেই বলেছি।"

"কিন্তু হোয়াট আবাউট মডার্ন টার্কী"—আধুনিক টার্কীর ইতিহাস? হোটেলে ফিরে এসে, ডিনারের সময় জিজ্ঞাসা করি।

হেলেন এবার রীতিমতো রেগে যায়। "হোয়াট ইজ দেয়ার ইন মডার্ন টার্কী—আধুনিক টার্কীতে আছে কি? "হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেণ্ড ইন টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী টার্কী ইজ নট এ ম্যাটার অব হিস্ট্রী বাট পলিটিক্স"—বিংশ শতাব্দীর টার্কীতে যা হয়েছে, তার সঙ্গে ইতিহাসের কোনোই সম্পর্ক নেই, যা কিছু আছে তা রাজনীতিতে।

হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত। ঝড়ের মতো প্রবেশ করে আহমৎ ডিনগার। "হোয়াট ডু ইউ নো অব মডার্ন টার্কী"—আধুনিক টার্কী সম্বন্ধে তুমি কি জানো? এক্ষুনি একটা অপ্রিয় ব্যাপার হবে আশঙ্কা করে আলোচনায় মোড় ঘোরাবার চেষ্টায় আহমৎকে বললাম, "নো, উই ওয়্যার জাস্ট ডিস্কাসিং"—না আমরা এই আলোচনা করছিলাম।

"আমি জানি, তোমরা কি আলোচনা করছিলে। কি করে আপনি এই পাগলীটাকে সহ্য করেন। হাউ ডু ইউ স্ট্যাণ্ড দিস

ম্যাড উওম্যান ?" ব্যাপার বেগতিক বুঝে হেলেনকে বললাম, "চলো ঘরে গিয়ে বসা যাক।" কিন্তু হেলেনের পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য লাগল। কিছুমাত্র না রেগে অতি সহজভাবে বললো, "লেট আস হিয়ার হোয়াট হি হ্যাজ টু সে।" ওর কি বলার আছে শোনা যাক।

"আই হ্যাভ লট টু সে।" আমার অনেক কিছু বলার আছে, বলে আহমৎ এবার শুরু করলো তার লেকচার। গ্রীক আর রোমানদের চূড়ান্ত গালাগালি দিয়ে, কামাল আতাতুর্কের ভূরি ভূরি প্রশংসা করে, আহমৎ মডার্ন টার্কীর কথা বলে। টার্কীশ সংস্কৃতির উপর গ্রীসের কোনো রকম প্রভাবই সে স্বীকার করতে চায় না, উপরন্তু আতাতুর্কের জন্মস্থান থেস্যালোনিকি (Salonica) টার্কীকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানায়।

"মে বী ইউ আর রাইট"—হয়তো আপনার কথাই সত্যি। আনমনাভাবে কথা ক'টা বলে হেলেন উঠে চলে যায়। এই ঘটনার পর হেলেন আর 'গ্রীক ইনফ্লুয়েন্স অন টার্কীশ কালচার' সম্বন্ধে তর্ক করেনি। আগের মতো সে আবার চুপচাপ হয়ে যায়। পুরু ফ্রেমের চমশা পরে, হাতে মোটা বই নিয়ে ঢিলে স্লীপার পরে আবার শুরু হয় তার করিডরে পদচারণা—স্থস্—স্থস্—স্থস্।

পরের দিন সকালে শুনলাম, হেলেন চলে গিয়েছে হোটেল ছেড়ে। লাঞ্চ টেবিলে বেয়ারা এসে কাগজে মোড়া একটা বই দিয়ে বললো, আমার পাশের ঘরের ইউনানীস্তানের (গ্রীস) লেডী এটা আমার জন্য রেখে গিয়েছেন। সামনে-বসা আহমৎ ডিনগারের দৃষ্টি বাঁচিয়ে হলদে কাগজের মোড়কটা খুললাম।

সুন্দর একটা বই। "গ্রীক ইনফ্লুয়েন্স অন টার্কীশ কালচার থ্রু দি এজেস"। হেসে বইটা রেখে দিচ্ছিলাম, হঠাৎ লেখকের নামটা নজরে পড়লো 'হেলেন অর্ক্যানোস'। পরের পাতায় সবুজ কালি দিয়ে ছোট্ট দু' লাইন লেখা "টু মাই ইণ্ডিয়ান ফ্রেণ্ড উইথ রিগার্ডস্, ফ্রম হেলেন অর্ক্যানোস, প্লাক্কি স্কোয়ার, এলিমিকো ; এথেনিকি ; গ্রীস।"

অন্যমনস্কভাবে বইটা উল্টেপাল্টে দেখছিলাম, হঠাৎ আহমৎ ডিনগারের কথায় সম্বিৎ ফিরে আসে। টার্কীর ইতিহাস শোনাবার পালা এবার ওর। রঙ চড়িয়ে, ফলাও করে আহমৎ বলে যায় আর আমি চুপচাপ শুনি। নতুন কিছুই বলে না আহমৎ। সবই তো শুনেছি, হেলেনের কাছে। আহমতের বৃত্তান্তে শুধু একটা কথা জানতে পারি, যা আগে আমি জানতাম না। সেটা হচ্ছে কনস্টান্টিনেপলের উপর আরব আক্রমণের সময় শহরের প্রাকারের কাছে নিহত আবু আয়ুব হালিদ ইবন-ই-জয়েদ-এর কাহিনী। মক্কা থেকে মদিনা পালাবার সময় হজরত মহম্মদ আয়ুবের গৃহে নাকি আতিথ্য স্বীকার করেন কিছুদিন।

পরের দিন আহমৎ ডিনগারও চলে গিয়েছে আর আমি একা একা ঘুরে বেড়িয়েছি নতুন আর পুরানো টার্কী দেখতে। সেন্ট সোফিয়া চার্চের আয়া সোফিয়া মসজিদ হবার রূপ আর তারপর এখনকার 'সোফিয়া ম্যুজিয়াম' হবার রূপও দেখলাম, আর উস্কদর থেকে লিণ্ডার টাওয়ারও দেখলাম। টোপকাপী প্রাসাদের প্রাঙ্গণ, শাহ ইসমাইলের সিংহাসন, সুলতান মুরাতের শয়নকক্ষ আর অথোমান সুলতান সেলিমের 'হামাম' আর বিশ্রামাগারও দেখলাম আর দেখলাম ইয়েদীকুলের ভাঙা বৈজাণ্টাইন প্রাচীর আর বসফরাসের তীরের রুমেলী হিসেরী দুর্গ।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বৃদ্ধ গাইড অনর্গল বলে যাচ্ছিল 'আয়া-সোফিয়ার' ইতিহাস। কনস্টান্টাইনের তৈরি চার্চ অব ডিভাইন উইজডম—সেন্ট সোফিয়া, জাস্টিনিয়ানের সময় ধ্বংস হয় আগুনে। "রোম ওয়াজ বার্নিং হোয়েন নীরো ওয়াজ ফিডলিং"-এর মতনই অবস্থা কারণ যখন আগুনের লেলিহান শিখা সেন্ট সোফিয়াকে গ্রাস করছিল জাস্টিনিয়ান নাকি 'স্লেভ এম্প্রেস' (Slave Empress) থিওডরার সঙ্গে প্রেম করছিলেন। সকালে উঠে খবর শুনে তাঁর হলো দুঃখ আর শুরু করলেন পুনর্নির্মাণ। রাজমিস্ত্রীদের ডেকে বললেন সলোমনের মন্দিরের চেয়েও সুন্দর তৈরি করো সেন্ট সোফিয়া।

পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে বাছা বাছা মিস্ত্রী এল। আবার তৈরি হলো সেন্ট সোফিয়া। রাজমিস্ত্রীদের দেওয়া হলো রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা আর সেই সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড। স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হলো তাদের পারিশ্রমিক হিসাবে আর মৃত্যুদণ্ড হলো এই জন্যে যে, তারা যেন ঐ রকম কোনো সৌধ আর তৈরি করতে না পারে। সুলতান মহম্মদ এসে সেন্ট সোফিয়াকে পরিবর্তন করলেন মসজিদে। রোমান স্থাপত্যের চিহ্ন মেটাবার জন্যে প্লাস্টারের নতুন প্রলেপ দেওয়া হলো। বিংশ শতাব্দীতে আতাতুর্ক আবার সেন্ট সোফিয়াকে পরিণত করলেন 'ম্যুজিয়াম অব বৈজান্টাইন আর্ট'-এ। প্লাস্টার তুলে ফেলা হলো। আবার দেখা গেল মার্বেলের অপূর্ব কারুকার্যখচিত স্তম্ভ,—ল্যাকোনিয়ার সবুজ মার্বেল, লিবিয়ার নীল মার্বেল, আর কতশত নাম-না-জানা দেশের লাল, কালো, সাদা, গোলাপী মার্বেল।

আতাতুর্ক ম্যুজিয়ামে গিয়ে দেখতে লাগলাম মডার্ন টার্কীর জন্মদাতা কামাল আতাতুর্কের স্মৃতি-জড়ানো কত শত ছোটখাটো জিনিস। গুলরের 'অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ আতাতুর্ক' কথাটা কেবলই মনে পড়তে লাগল। ঐ তো এক কোণে রাখা তাঁর 'টিউনিক', কালো ফারের 'কালপাক্', কালি কলম, আর কত ফটো—কিশোর আতাতুর্ক, বালক আতাতুর্ক, যুবক আতাতুর্ক, মায়ের কোলে আতাতুর্ক আর প্রেসিডেন্ট আতাতুর্ক।

গাইড বলে চলে, "ঐ তো ওখানে তিনি পড়তেন, ওখানে শুতেন, ওখানে খেতেন। ঐ তো ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি টার্কীর জনতাকে ল্যাটিন অ্যালফাবেট শেখাচ্ছেন। ঐ তো কমাণ্ডারের বেশে তাঁর ছবি। আর ঐ যে ছোট্ট মেয়েটাকে কোলে নিয়ে তিনি বসে আছেন, ঐ মেয়েটার নাম ইউলকিউ। নিজের ছোট বোনের মতো ভালোবাসতেন ওকে। তাঁর আস্ত্রাখান টুপী, হাতির দাঁতের ছুরি, কালো টাই, সিগারেট কেস, চামড়ার জুতো। আর ঐ যে বিরাট অয়েল পেন্টিং দেখছেন, ওর জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বসেছেন শিল্পী জলিল ইব্রাহিমের স্টুডিওতে। মহম্মদ জালাল বেয়ারকে উপহার দেওয়া তাঁর গলার স্বরের রেকর্ড, থেস্সালোনিকার তাঁর বাড়ির ছবি, তাঁর বার্থ

সার্টিফিকেট, আতাতুর্ক নাম নেবার সার্টিফিকেট। আর ঐ ফটোটা তখন নেওয়া হয় যখন তিনি 'জ্যানিসারী' (Janissary)—মিলিটারী বডিগার্ডের পোশাক পরে এক বল-ডান্সে গিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন।"

গাইডের সঙ্গে ম্যুজিয়ামের বাইরে বেরিয়ে আসি। তার অনর্গল বক্তৃতা শেষ হয়ে গিয়েছে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে একমুঠো চেঞ্জ বের করে ওর হাতে দিই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবছি—এবার কোথায় যাবো এমন সময় গাইড আবার ফিরে আসে "বিদাকা, বিদাকা, মঁশিয়ে—এক মিনিট, এক মিনিট মঁশিয়ে।"

"হোয়াট ইজ ইট? সামথিং মোর টু টেল"—কি ব্যাপার, আরো কিছু—বলার বাকি আছে না কি? জিজ্ঞাসা করি গাইডকে।

"ইয়েভেৎ, এফেন্দাম—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সব চেয়ে দরকারী কথা। দি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং। যখন আতাতুর্ক তাঁর রিভলিউশনের জন্যে তৈরি হন, গভীর রাতে ঠিক এই দরজা দিয়ে তিনি শেষবারের মতো তাঁর মা-বোনের কাছে বিদায় নিয়ে আনাতোলিয়ায় চলে যান।"

"কোন দরজা দিয়ে?"

"বুর্দা, বুর্দা—এইখান দিয়ে" গাইড দরজার চৌকাঠের উপর নিজের লাঠিটা ঠোকে। অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগলাম ছোট্ট সেই দরজাটাকে। গাইড তখনও তার লাঠি দিয়ে চৌকাঠ ঠুকছে, যেন কামাল আতাতুর্কের পদচিহ্ন খুঁজে আমায় দেখাবে। সেই মা-বোনের কাছ থেকে শেষ বিদায় নেবার দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। উপরের ঘরে রোগশয্যায় শুয়ে কামালের মা, ছেলের হাত দুটো শক্ত করে ধরে আছেন, ছেলেকে অনিশ্চিতের পথ থেকে ফিরিয়ে আনবেন।

"আমায় ছেড়ে দাও মা। গভীর রাতের অন্ধকারে আমি মিশে যাবো। একটা মহৎ আদর্শের উদ্দেশ্যে আমি যাচ্ছি আনাতোলিয়ায়। যদি আমি অকৃতকার্য হই, আমাদের এই বাড়ির অবস্থা 'থেস্সালোনিকির' আমাদের বাড়ির মতোই হবে।

সব কিছু ওরা ভেঙেচুরে শেষ করে দেবে। আমার জন্যে তুমি প্রার্থনা করো। এই বাড়ি কখনো ছেড়ো না। যদি অর্থ ফুরিয়ে যায়, সব কার্পেট বেচে দিয়ো। যদি আমার কোনো খবর না পাও আর তোমার কাছে একটা পয়সাও না থাকে সব কিছু বিক্রি করে তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করো। আমি আবার আসবো মা।"

ধীরে ধীরে মায়ের হাতটা ছাড়িয়ে কামাল বেরিয়ে এল। দরজার কাছে মোটর এসে দাঁড়িয়েছে অতি নিঃশব্দে। গাড়িতে বসে তার বন্ধু ডাক্তার রসীম ফরীদ। বোন এসে দাঁড়ায় কাছে। এক গ্লাস জল নিয়ে আসে চাকর আর ট্রের উপর একটা ছোট্ট কাপে তাঁর প্রিয় কফি। এক নিঃশ্বাসে জল আর কফি শেষ করে কামাল দরজার চৌকাঠের বাইরে আসে। ছোট বোন ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

"কাঁদছিস কেন পাগলী। আমি কতবার তো বাইরে গিয়েছি তখন তো কোনোদিন কাঁদিসনি তবে আজ কেন কেঁদে আমার যাত্রার পথ দীর্ঘ করে দিচ্ছিস", বোনের সোনালী চুল ঝাঁকি দিয়ে কান্না ঢাকবার বৃথা চেষ্টা করে কামাল।

"আমি জানি তুমি অনেকবারই গিয়েছ। কিন্তু কেন জানি না এবার আমার ভয় করছে। আগে যতবার তুমি গিয়েছ, আমি জানতাম তুমি কোথায় গিয়েছ আর কবে ফিরবে, কিন্তু এবার— কোথায় তুমি যাচ্ছ আর কবে ফিরবে কিছুই তো জানি না আমি"—ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ছোট বোন।

"আমার যাবার সময় হয়ে গিয়েছে। আমি যাই।" ডাক্তার ফরীদের মোটরের ইঞ্জিনের ঘড়ঘড়ানিতে বোনের কান্না আর শোনা যায় না।

তারপরে দিনের পর দিন দীর্ঘ প্রতীক্ষায় কেটে গিয়েছে মা আর বোনের। সীস্লী (Sisli) রাস্তার উপরে কামালের ঘরের জানলার কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মা আর বোন বসেছে। মা'র হাতে কোরান, বোনের চোখে জল। অনেকদিন পরে সুখবর এসেছে সামসুন থেকে। আনন্দের আতিশয্যে বোন কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে আর বৃদ্ধা মা আল্লাহ-পরবরদিগারকে লাখ-লাখ শুকরিয়া

জানিয়ে ছুটেছে—রান্নাঘরে, 'হালভা' তৈরি করতে—ইয়ারন সুবহ্—কাল সকালে যে কামাল আসবে আর এসে 'হালভা' না পেলে সে যে দুঃখ পাবে।

* * * * *

পরের দিন সকালে জনের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যায়। চিৎকার করে আমায় বিছানা থেকে টেনে তোলে। "উই হ্যাভ টু সেলিব্রেট।" উৎসব করতে হবে। ছোট্ট শিশুর মতো খুশিতে নৃত্য করতে লাগল জন থমাস্। কি ব্যাপার? কিসের এত হৈ চৈ? কবেই বা ও বুরসা থেকে ফিরলো, কিছুই বুঝতে না পেরে বোকার মতো ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

"কাম অন গেট আপ ম্যান" জন ড্রেসিং গাউনটা জোর করে আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে চিৎকার করে "কুইক উই হ্যাভ টু সেলিব্রেট।"

"সেলিব্রেট হোয়াট?" আমি তখনও বোকার মতো ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

"আই হ্যাভ গট্ এ সন।"

"হু হ্যাজ গট্ এ সন? ইউ? ফ্রম হোয়ার?" এতক্ষণে বুঝতে পারি। কাল বুরসা থেকে ফেরার পরেই চোজুক হস্তানেসী—মানে শিশুদের হাসপাতালে, জনের স্ত্রী—লুইসা…।

আনন্দে জন আমায় জড়িয়ে ধরে। "আই উইল কল হিম্ ঘালীব।" ছেলের নাম জন রেখেছে গালীব। ও উচ্চারণ করে ঘালীব। বড় ছেলের নাম জাফর। ইরাকের আরবী-খৃশ্চান জন থমাসের, টার্কীশ-আর্মেনিয়ান স্ত্রী লুইসা—ছেলেদের নাম ঘালীব আর জাফর।

গেডিক্পাশা হামাম জদ্দেসী এলাকায় জনের শ্বশুরবাড়ি গেলাম। জনের বৃদ্ধা শাশুড়ী আনন্দে সারা বাড়িটা মাথায় তুলেছে। আশী বছরের বৃদ্ধ শ্বশুর দিক্রান ছুয়ুরান নাতী হবার উৎসব করতে গলির মোড়ে 'ময়খানায়' (মদের দোকান) এন্তার 'আরক' খেয়ে তখন গড়াগড়ি খাচ্ছে।

কানের কাছে চুপি চুপি জন বলে—"মিট মি এগেন অ্যাট টেন টু-নাইট। আই উইল শো ইউ ইস্তানবুলস নাইট লাইফ"—

ইস্তানবুলের নাইট লাইফ দেখাবে জন। রাত দশটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

"সো অ্যাট টেন নিয়ার দি ইয়র্ডন হোটেল", যাবার সময় জন বলে।

"ইয়েস অ্যাট টেন নিয়ার দি ইয়র্ডন হোটেল।"

উনিশ

পিটার দিমিত্রিয়াদিস—আমার ট্যাক্সি ড্রাইভার। অনর্গল তুর্কী বলে। যখন বাইশ বছরের যুবা, পিটার তখন গ্রীস ছেড়ে চলে এসেছে ইস্তানবুলে। আজ ২০ বছর ইস্তানবুলের রাস্তায় ট্যাক্সি চালাচ্ছে। তার-আগে অনেক ধান্দায় ঘুরে বেড়িয়েছে পিটার। পিছনে বসা যাত্রীর দিকে না চেয়ে বছরের পর বছর মাসের পর মাস আর দিনের পর দিন গাড়ির স্টীয়ারিং হুইল শক্ত করে ধরে গাড়ি চালিয়েছে। মাঝে মাঝে হাতের তালুর কড়াগুলোর দিকে চেয়ে দেখেছে। কত হাজার হাজার যাত্রী এখান থেকে ওখানে নিয়ে গিয়েছে, মিটার দেখে ভাড়া গুনেছে আর যারা টিপ্‌স দিয়েছে, সীট থেকে নেমে সেলাম ঠুকে তাদের বলেছে 'তশক্কুর আদারাম', 'থ্যাঙ্ক ইউ' 'মের্সিবুকু'। পিছনের সীটে বসে কেউ গিয়েছে এরোড্রোমে, দৌড়ে এথেন্সের প্লেন ধরেছে আর পিটার আকাশের দিকে চেয়ে দেখেছে প্লেন যাচ্ছে তার জন্মভূমি এথেনিকাতে। আবার কেউ রাতের আঁধারে লোকচক্ষুর আড়ালে তার গাড়ির পেছনের সীটে লুকিয়ে বসে বেয়গুলু স্ট্রীটের মাঝে দাঁড়ানো 'জামে'র (মসজিদ) পাশ-ঘেঁষা নোংরা বেশ্যা পল্লীর গলিতে ঢুকেছে। আবার নতুন দম্পতিকে মধুযামিনীর নিরিবিলিতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে বসফরাসের তীরে কোনো ক্যাসিনো বা হোটেলে। তখন পিটারের মনে পড়েছে আরেকটি সুন্দর মুখের কথা। মুসোলিনীর সৈন্যরা যেদিন তার গ্রামে

ঢুকেছিল, সেদিন পিটার অনেকক্ষণ কেঁদেছিল। কারণ তার গ্রাম আর তার ছোট্ট বাড়ির অস্তিত্ব তারা রাখেনি আর সেই সুন্দর মুখ,—তারও কোনো খোঁজ পায়নি পিটার।

আরো অনেক অনেক যাত্রীর কথা মনে পড়ে পিটারের। কেউ মাতাল, কেউ গুণ্ডা, কেউ লক্ষপতি, কেউ যুবা, কেউ বৃদ্ধ, রোগা, মোটা, লম্বা, বেঁটে আরো কত শত—ইস্তানবুলের রাস্তার ভিড়ে আর সময়ের গলিতে তারা সব হারিয়ে গিয়েছে। টুরিস্টদের ভালো লাগে না পিটারের, যত সব অবান্তর প্রশ্ন করে তাকে বিব্রত করে। সে তো আর গাইড না। এই তো সেদিন এক আমেরিকান টুরিস্ট দম্পতির প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে একটু অমনোযোগী হয়ে ভুল বাঁক ঘুরতেই পুলিস তার গাড়ির নম্বর টুকে নিয়েছে আর খামকা তাকে পাঁচ লিরা জরিমানা দিতে হয়েছে।

আমার প্রশ্নেরও উত্তর পিটার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে অন্যমনস্কভাবে দিচ্ছিল। "ইউ ফ্রম কনসুলেট"? পিটার অনেকক্ষণ পরে আমায় জিজ্ঞাসা করে। ভেবেছিল আমি বুঝি দূতাবাসে চাকরি করি।

পিটারকে একটু অবাক করে দেবার উদ্দেশ্যে গ্রীক ভাষায় উত্তর দিলাম, "ওহি" (না)।

পিটার হঠাৎ গাড়ির ব্রেক কষে দাঁড়ায়। মৃদু হেসে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করে "ইউ বিজিনেস আফ্রিকা?" রং শ্যামবর্ণ হলেও পিটার আমাকে আফ্রিকার ব্যবসাদার কি করে ভাবলো চিন্তা করতে করতে ওকেই জিজ্ঞাসা করাতে পিটার আমার চুলের দিকে দেখায়। ওর দৃঢ় বিশ্বাস কোঁকড়া চুল মানেই আফ্রিকাবাসী।

আবার পিটারকে গ্রীকে বলি, "ওহি, ইন্দস দমসিয়োগ্রাফ"—অর্থাৎ না, আমি ভারতীয় সাংবাদিক। আফ্রিকা সম্বন্ধে তার একটা ভুল ভেঙে যাওয়াতে পিটারের একটু দুঃখ হয়। ও হয়তো ভেবেছিল রাতে 'বারে' গিয়ে সবাইকে এক আফ্রিকাবাসী ব্যবসাদার সম্বন্ধে ফলাও করে গল্প বলবে। 'গলাতা ব্রিজে'র উপর দিয়ে তখন চলেছিলাম আমরা। পিটারকে বললাম, "তোমার আর

তোমার দেশের রাজার নাম একই।" ভেবেছিলাম পিটার হয়তো আমার এই তুলনায় ক্ষুণ্ণ হবে, কিন্তু না, নিজের রসিকতায় নিজেই বিকট জোরে হেসে পিটার উত্তর দিলো, "ইয়েস মাই নেম পিটার, কিংস নেম পিটার, বাট হি কিং, আই তাকসি ড্রাইভার"। নাম দু'জনেরই পিটার, কিন্তু একজন রাজা আর আরেকজন ট্যাক্সি ড্রাইভার!

ইস্তানবুলের উঁচু-নিচু রাস্তা আর অলি গলি দিয়ে চলেছি আমি আর পিটার। এখানে আর কি কি দেখার আছে জিজ্ঞাসা করতে পিটার নির্বিকারভাবে উত্তর দেয় 'নাথিং', কিচ্ছু না। "ইস্তানবুল ফুল অব ক্যাটস, উইমেন অ্যাণ্ড কারস"—বেড়াল, মেয়েমানুষ আর ট্যাক্সিতে ভরা এই শহর। তারপর বেশ গর্বের সঙ্গে আবার বলে ওঠে, "বাট্ ইফ ইউ ড্রাইভ এ কার হিয়ার, ইউ ক্লাইম এভারেস্ট অলসো"—যদি এই শহরে কেউ গাড়ি চালাতে পারে সে অনায়াসে মাউণ্ট এভারেস্টও চড়তে পারে।

পিটারকে খুশি করবার জন্যে বলি, "কিন্তু এথেন্স খুব ভালো জায়গা, কি সুন্দর শহর আর কত ভালো তোমাদের এক্রোপোলিস, ওমোনিয়া, পাইরস"।

হঠাৎ আবার ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করায় পিটার, "লুক মিস্টার, ডোণ্ট টক এথেনিকা। মেকস মি হোমসিক্।" এথেন্সের কথা বলায় পিটারের মন ঘরের জন্যে কেঁদে উঠেছে। 'সরি পিটার' বলে আবার ওকে গাড়ি চালাতে বলেছি, কিন্তু তারপর সারা রাস্তা ও যেন কেমন আনমনা হয়ে গাড়ি চালাতে লাগল। কোনাক্ হোটেলে আমায় নামিয়ে দিয়ে ভাড়া আর টিপস্ নিয়ে সামনের সীট থেকে নেমে সেলাম করে "তশক্কুর আদারাম, থ্যাঙ্ক ইউ, মের্সিবুকু" বলে পিটার চলে গিয়েছে। টুরিস্টদের ওর ভালো লাগে না—বড় অবান্তর প্রশ্ন করে তারা।

সন্ধ্যে সাতটার পর ইস্তানবুল নাকি পাগল হয়ে যায়। সেই পাগলামি দেখবার জন্যে বেরিয়েছি আমি আর জন। ইয়র্ডেন হোটেলের সামনের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট কাঁটায় কাঁটায় ঠিক রেখে জন এসেছে। আমার দেরি দেখে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল।

যখন ইয়র্ডন হোটেলের সামনে পৌঁছলাম, জন ভীষণ ক্ষাপ্পা। বলে, "তোমার কোনো বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই। এত সময় নষ্ট করতে আছে? খানিক পরেই যে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। দিস ম্যাডনেস লাস্টস অনলি আপটু টু ইন দি মর্নিং।" ভোর হুটোর মধ্যে এই পাগলামি শেষ হয়ে যাবে তখন ইস্তানবুল আবার হুরন্ত ছেলের মতো ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

প্যারিসের সেণ্ট-লাজার (Saint Lazare) কারাগারের দরজায় বড় বড় হরফে খোদাই করা আছে—লিবার্টি ইকুয়ালিটি আর ফ্র্যাটার্নিটি—Liberte, Eqalite, Fraternite—স্বাধীনতা, সাম্য আর মৈত্রী। জেলের দরজায় খোদাই করবার মতোই কথা বটে! এই দরজা দিয়েই নাকি মাতাহারীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ফাঁসির মঞ্চে। আবার এখনো প্যারিসের পুলিস দ্য মুরস (Police des Moeurs)—নৈতিক পুলিস, রাতে বিনা কারণে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার অপরাধে মেয়েদের ধরে এখানেই বন্ধ করে,—অবশ্য তার আগে নিজেদের 'পাউণ্ড অব ফ্লেশ' নেবার পর।

ইস্তানবুলে জেলের দরজায় অবশ্য ইকুয়ালিটি, লিবার্টি আর ফ্র্যাটার্নিটি খোদাই করা নেই, কিন্তু যেখানে বেশ্যাপল্লী শুরু আর যেখানে শেষ হয়েছে, হু' দিকেই হুটো বিরাট বড় 'জামে' (মসজিদ) পাহারাদারের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের পাপের নগ্নরূপ আর দেহ কেনাবেচার বাজার দেখে নিস্তব্ধ, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মসজিদ হুটো। গলিতে ঢুকেই প্রথম মসজিদটা দেখে এক ফরাসী লেখকের লেখা মনে পড়ে "Quand la morale triomphe il se passe des choses tres vilaines" (যখন নৈতিকতার জয় হয়, তখন কিছু শয়তানিও হয়)। সারি সারি ছোটো ছোটো ঘরের দরজায় দোকান সাজিয়ে বসেছে দোকানীরা। দর-দস্তুর, কথা-কাটাকাটির পর দেহের মূল্য ঠিক হয়, খরিদ্দারের অর্থ আর দোকানীর দেহ বিনিময় হয়। তারপর এক খরিদ্দার চলে যায়, দোকানী আবার বসে নতুন খরিদ্দারের আশায়। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে যাচ্ছে, হুটোর আগে সব বিক্রি শেষ করতে হবে, কারণ অন্য সব জিনিসের নিয়ন্ত্রণের মতো দেহ-বিক্রয়ের উপরেও

গভর্নমেন্ট সময়ের কন্ট্রোল করে দিয়েছে। একটার পর একটা ঘর পেরিয়ে যাচ্ছি আর জন বলে যাচ্ছে এটা তুর্কী, এটা গ্রীক, ওটা ফ্রেঞ্চ, এটা আরবী, এটা যুগোশ্লাভ, এটা আলবানিয়ান" আন্তর্জাতিক মেলা বসেছে ইস্তানবুলের বেয়গুলু স্ট্রীটের মাঝে দাঁড়ানো 'জামের' পাশে-ঘেঁষা নোংরা গলিতে।

হঠাৎ কিছু বলবার আগেই আমার হাত ধরে টানতে টানতে জন একটা ঘরে ঢুকে পড়লো। ভিতরে গিয়ে নিজেকে একটু সামলাবার চেষ্টা করছি, জন কোটে একটা টান দিয়ে দেওয়ালে টাঙানো একটা বোর্ডের দিকে আমায় দেখতে ইশারা করে। "Come again if you like it but not more than once for 20 Liras. Dogs not allowed here so don't bite". আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। পিছনে ঘরের ভিতর থেকে কানে আসতে লাগল ডজনখানেক মেয়ের হাসি।

ম্যাকসিম, পিগলস্‌, লিডো এবং আরো অনেক প্যারিসের নাইট ক্লাব আর কাবারের নাম নকল করে ইস্তানবুলেও রয়েছে এন্তার 'বার', নাইট ক্লাব আর কাবারে। অনেক ভেবে চিন্তে ঘুরে ফিরে আমি আর জন ঢুকলাম 'পিগলস্‌'-এ। নিয়ন লাইটের নীল আলো 'পিগলস্‌'-এর ছোটো ঘরময় ছড়িয়ে রয়েছে। মোজেক ফ্লোরের উপর চলেছে নাচ। স্প্যানিশ ব্যাণ্ড, নিয়নের নীল আলো, সিগারেটের ধোঁয়া আর শ্যাম্পেনের ট্রে নিয়ে বেয়ারাদের নিঃশব্দ পদচারণায় একটা স্বপ্নময় আবেশের সৃষ্টি হয়েছে। কোণের একটা টেবিলে আমায় বসিয়ে দিয়ে জন চলে গেল ড্যান্সিং 'ফ্লোরে'। অনেক নাইট ক্লাব আর কাবারে দেখেছি, কিন্তু পিগলস্‌-এর শান্ত নিঃশব্দ পরিবেশটা যেন কেমন একটু অদ্ভুত মনে হলো।

কতক্ষণ যে একা বসেছিলাম মনে নেই, খেয়াল হলো যখন একটা কালো ছায়া টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়। নিয়নের নীল আলোয় আবছা আবছা দেখতে পাই কালো স্যাটিনে জড়ানো একটা মার্বেলের স্ট্যাচু। পায়ে জড়ানো দুটো সোনালী 'স্ট্র্যাপ'-এর উপর গড়িয়ে পড়েছে ভারি কালো স্যাটিনের গাউন, আর

সেখান থেকে আস্তে আস্তে লতার মতো সাদা মার্বেলের তন্তু বেয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে উপরে উঠেছে, কোমরের কাছে এসে একটু বাঁক ঘুরে আবার খানিকটা উপরে উঠে থমকে দাঁড়িয়েছে কালো স্যাটিন।

"পারমতে মোয়া লা প্লেজির" হঠাৎ মার্বেলের স্ট্যাচু কথা বলে ওঠে। উপরে তাকাতেই এক জোড়া নীল চোখের সঙ্গে মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি বিনিময় হয়।

"মে আই?" বলে অনুমতির অপেক্ষা না করে স্ট্যাচু সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে। "মাই নেম ফাহারিয়া, মে আই হ্যাভ এ ড্রিংক"? আমার উত্তরের জন্যে বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে ফাহারিয়া অর্ডার দেয় "বিয়ার ফর হিম, ভট্‌কা ফর মি"।

ইস্তানবুলে ভট্‌কা? একটু চমকে উঠলাম। পরে জানলাম রাশিয়ান ভট্‌কা না, টার্কীর নিজের ভট্‌কা, অনেকটা ইরাকী 'রাকীর' (কড়া মদ) মতো। এক নিঃশ্বাসে ছোট গ্লাসটার সমস্ত তরল আগুনটা ফাহারিয়া নিজের গলা দিয়ে নামিয়ে দিলো। চোখে-মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ সুস্পষ্ট, বেশ বুঝলাম খেতে কষ্ট হচ্ছে। পর পর তিন গ্লাস ভট্‌কা খেয়ে যখন আবার অর্ডার দিচ্ছে, তখন আর থাকতে না পেরে বললাম, "ইউ ড্রিংক টু মাচ্—বড় বেশি মদ খাও তুমি"।

হেসে আমার কথাটা উড়িয়ে দিয়ে ফাহারিয়া অম্লান বদনে জবাব দেয়, "আই অ্যাম পেড ফর ইট্—এর জন্যে আমি পয়সা পাই।" ভুলেই গিয়েছিলাম ফাহারিয়া নাইট ক্লাবের মেয়ে। ওর কাজই এই। চারপাশে তাকিয়ে দেখি আরো ডজনখানেক মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে খদ্দেরের খোঁজে। যতক্ষণ মদ খাওয়াবে ততক্ষণ বসে থাকবে খদ্দেরের কাছে, মদ শেষ তো তার সঙ্গও শেষ। ফাহারিয়ার সঙ্গও আমার কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ হয়ে যেতো যদি সে-রাতে এক নাটকীয় ঘটনা না ঘটতো।

রাত দেড়টার সময় আমি আর জন বেরিয়ে এসেছি 'পিগলস্' থেকে। জনের আগ্রহে কিছুক্ষণের জন্যে গিয়েছি 'লন্দ্রা' নাইট ক্লাবে। 'গলাতাসারায়ে'র মোড়ে যখন ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা

করছি, তখন হঠাৎ কয়েকজন পুলিস কনস্টেবলের সঙ্গে ফাহারিয়াকে দেখে আশ্চর্য লাগল। আমাদের দেখে পুলিসদের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ফাহারিয়া। ওর সেই রূপ দেখে আমি অবাক। কালো ভারী স্যাটিনের গাউনটা বুকের উপর থেকে খসে পড়েছে, নীল চোখ দুটো মদের নেশায় লাল, পা দুটো টলছে। কোনো কিছু নেই হঠাৎ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ফাহারিয়া। ততক্ষণে পুলিস কনস্টেবলরাও এসে পড়েছে। ফাহারিয়া আমার হাত ধরে টানছে আর বিড় বিড় করে কি বলছে আর কনস্টেবলগুলো আমার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে ওর চুল ধরে টানতে শুরু করছে। চিৎকার করে কেঁদে উঠলো ফাহারিয়া। কিছুই বুঝছিলাম না ব্যাপারটা কি। জন এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, এবার এগিয়ে গিয়ে কনস্টেবলগুলোকে তুর্কীতে কি বোঝালো আর তারা চলে গেল। সামনে ট্যাক্সি দাঁড়াতেই জন তাতে আমাকে উঠতে বলে, ফাহারিয়াকে প্রায় পাঁজাকোলা করে পেছনের সীটে ফেলে দিলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্যাপারটা হয়ে গেল। জন বুঝিয়ে বললো যে, নাইট ক্লাবের মেয়েদের জীবনে এ অতি সাধারণ ঘটনা। অত্যধিক মদ খেয়ে রাস্তায় মাতলামি করছিল ফাহারিয়া তাই পুলিস ধরেছিল।

"তাতে আর কি হয়েছে, কাল সকালে ছাড়া পেয়ে যেতো", জনকে বললাম।

"নট সো ইজি—অতো সোজা নয়। আমি যদি ওর দায়িত্ব না নিয়ে পুলিসগুলোকে ঘুষ না দিতাম, ফাহারিয়াকে ওরা সোজা জেলে পাঠাতো। কোর্টের ফাইন দিতে পারতো না, তাই কিছুদিন হাজতবাস করতে হতো।"

"তাতে আর ওর জীবনযাত্রার কি তফাত হতো?"

"হতো। জেল থেকে কপর্দকহীন অবস্থায় খালাস পেয়ে নাইট ক্লাবে চাকরি পাবার মতো ওর যোগ্যতা বা চেহারাও থাকতো না। ও তখন কোথায় যেতো জানো?"

"কোথায়?"

"সেই যে 'জামে'র পাশের গলিতে ছোট ছোট অনেকগুলো ঘর

দেখেছিলে যেখানে লেখা ছিল 'ডগস্ নট অ্যালাউড, সো ডোণ্ট বাইট', তাদের একটাতে উঠতো ফাহারিয়া।"

জনের উত্তরে একটু শিউরে উঠলাম। ফাহারিয়ার তখন একটু নেশার ঘোর কেটেছে। উঠে এসে জনকে আর আমাকে বার বার 'মের্সি', 'তশক্কুর আদারাম' আর 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে চলেছে। এক ধমক দিয়ে ওর বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করে জন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে একটা নোংরা গলির কাছে গাড়ি দাঁড় করতে বললো। গলির মোড়ে নেমে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ফিরে আসছি, মনে হলো স্টীয়ারিং হুইল ধরে বসে আছে পিটার দিমিত্রিয়াদিস। ভালো করে দেখবার আগেই হুস করে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সিটা।

একটা ছাদ-নিচু ছোট দরজা দেয়া বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ফাহারিয়া। মৃদু দু'তিনটে টোকা দেবার পরই দরজা খুলে বাইরে এল আট দশ বছরের একটা ছেলে। 'কাম ইন' বলে ভিতরে আসবার জন্যে অনুরোধ জানায় ফাহারিয়া, কিন্তু জন ভিতরে যেতে নারাজ। "ইয়োক, ইয়োক—না, না" জন আমার দিকে চেয়ে অসম্মতি জানায়। আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ফাহারিয়া এবার করুণ মিনতি জানায় "প্লিজ, প্লিজ"। অনিচ্ছাসত্ত্বে জন ভিতরে যেতে রাজী হলো।

ঘরের দৃশ্য দেখে আমি অবাক। নোংরা কদর্য একটা ছোট কুঠুরি, চারপাশে ছড়ানো ভাঙা বাক্স, সুটকেস আর ছেঁড়া ময়লা বিছানা। ফাহারিয়ার কালো স্যাটিনের গাউন আর সোনালী জরীর স্ট্র্যাপ দেওয়া জুতোর সঙ্গে যেন এই পরিবেশকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না। পরে জেনেছিলাম ওসব ভাড়া করা। একটা প্লেটে করে কালো কালো কিছু রুটির টুকরো আর খানিকটা 'পনীর' (চীজ) নিয়ে রাখলো আট দশ বছরের ছেলেটা।

সেই শুকনো পাউরুটি আর চীজ খেতে খেতে ফাহারিয়ার গল্প শুনলাম। ওরা আসলে টার্কীর না। ওর বাবা অনেক দিন আগে এসেছিল সোফিয়া থেকে, সঙ্গে এক বছরের ফাহারিয়াকে নিয়ে। নিজের মা'র কথা মনে নেই ওর। এখানে এসে আবার বিয়ে

করে ওর বাবা আর তার এই ভাইটি হয়—আট দশ বছরের ছেলেটিকে দেখায় ফাহারিয়া। তারপর ওর বাবা একদিন চুরির অপরাধে জেলে যায় আর জেল থেকে বেরিয়ে হয় নিরুদ্দেশ। ওর মা কিছুদিন পরেই অন্য আরেক জনকে বিয়ে করে চলে যায় আনকারাতে।

ভোর তিনটের সময় যখন ফাহারিয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় আসি সারা ইস্তানবুল তখন বিরাট অজগর সাপের মতো ঘুমুচ্ছে। দু'-একটা তারা মাঝে মাঝে টিম টিম করছে। 'দি ম্যাডনেস ইজ ওভার' জন বলে। ইস্তানবুলের পাগলামি শেষ হয়ে গিয়েছে আজকের মতো। ভোরের দিকে যখন সারা রাত জাগার পর ক্লান্ত শ্রান্ত দেহ নিয়ে হোটেলে পৌঁছলাম দরজা খুলতে খুলতে বৃদ্ধ 'কাপুজী' (Kapudji—চৌকিদার) প্রশ্ন করে "হ্যাড এ ফাইন নাইট মঁশিয়ে? রাত্রিটা ভালো কেটেছে তো?" 'কাপুজী' বিরাট কোনাক্ হোটেলে কাজ করে, ও ফাহারিয়ার ছোট ছাদ-নিচু নোংরা ময়লা ঘরটা দেখেনি।

পরের দিন রাতে 'পিগলস্'-এর গিয়ে শুনলাম ফাহারিয়ার চাকরি গিয়েছে। নাইট ক্লাবের ম্যানেজার পুলিসের ঐ ব্যাপার হবার পর ওকে চাকরিতে রেখে 'পিগলস্'-এর সুনাম নষ্ট করতে চান না। এক কোণে চুপচাপ বসে ছিলাম, বেয়ারাটা এসে আস্তে আস্তে বললো, 'ফাহারিয়া গন টু ওজগুর বার'। টিপ্‌স দিয়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। কোথায় যাবো কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে 'ওজগুর' বারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি বুঝতেই পারিনি। সম্বিৎ ফেরে ভিতর থেকে ভেসে-আসা ব্যাণ্ডের সঙ্গীতে।

সিঁড়ি দিয়ে নামছি দেখি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ফাহারিয়া গান গাইছে। আমার দিকে নজর পড়তেই একটু হাসলো। আজ আর কালো ভারী স্যাটিনটা পরেনি। সাদা সিল্কের একটা গাউন আজ ভাড়া করেছে। গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হাততালির ফোয়ারা ছুটলো আর "বঁ সোয়ার, গুড ইভনিং" বলতে বলতে ফাহারিয়া এসে বসে আমার টেবিলে। কাল রাতে যে এত বড় একটা ব্যাপার হয়ে গেল ওকে দেখে তা মনেই হয় না।

জিজ্ঞাসা করলো "ইয়োর ফ্রেণ্ড ?" বললাম, জন আসোন। স্বীকার করতে লজ্জা হলো আজ জনকে না জানিয়েই আমি চলে এসেছি।

"ক্যান আই কল মাই ফ্রেন্ড্ ?" নিজের বন্ধুকে আমার টেবিলে ডাকবার অনুমতি চায় ফাহারিয়া। পাশের খালি টেবিল থেকে উঠে আসে একটা মেয়ে। "মাই নেম সাবাহাল ডেমিজে" বলে চেয়ারটা টেনে নেয় ফাহারিয়ার বন্ধু। সাবাহালকে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। এত ছোট মেয়ে এখানে দেখবো আশা করিনি। রোগা ফ্যাকাশে, ছোট্ট সাবাহালকেও আসতে হয়েছে নাইট ক্লাবে অর্থ উপার্জনের খাতিরে। কে জানে ওর কাহিনী হয়তো ফাহারিয়ার চেয়েও মর্মান্তিক।

এর পর রোজ গিয়েছি 'ওজগুর বারে'। হাসি, ঠাট্টায়, নাচে, গানে বেশ সময়টা কেটে গিয়েছে। সাবাহালকে আমি ডাকতাম 'বেবী' বলে আর কিছুদিনের মধ্যেই ফাহারিয়া আমার কাছে হয়ে গিয়েছিল শুধু 'রিয়া'।

"আই অ্যাম নট বেবী, আই অ্যাম সেভেনটীন", মুক্তোর মতো দাঁতে হাসির ঝিলিক মেরে প্রতিবাদ করতো সাবাহাল।

"ইউ ড্রিংক টু মাচ্", রিয়াকে বলতাম।

"ইউ স্মোক টু মাচ্" ওর কাছ থেকে জবাব আসতো। মাঝে মাঝে ওদের প্রশ্ন করতাম ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে,—দু'জনেই নির্লিপ্ত জবাব দিতো, "হু নোস্ অ্যাণ্ড হু কেয়ার্স" (Who knows and who cares)।

টেমীর সঙ্গেও দেখা হয়েছিল 'ওজগুর' বারে। খামখেয়ালী আর্টিস্ট টেমী। ইস্তানবুলে এসে খুলেছে 'স্যালোন দি মোদ' (Salon de Mode)। রকমারি ফ্যাশানের বেশভূষা তৈরি করে নিজের স্টুডিওতে বসে আর সময় পেলে ছবি আঁকে। মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে প্যারিসের কথা ভাবে, পারি, সুইট পারি। চার ঋতুর শহর পারি—"Paris, Ville des Quatre-Saisons. Paris, it is not a city, it is a world by itself. It is a dream."

বেবী, টেমীর মডেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেমী ওকে স্টুডিওতে বসিয়ে ন্যুড্ ছবি আঁকে আর নতুন ফ্যাশনের ফ্রক আর গাউন তৈরি করে ওকে পরায়। টেমীর খরচ যোগাতে বেবীর প্রাণান্ত, কারণ টেমীর উপার্জন না থাকারই সমান। নিজের যা কিছু ছিল নিঃশেষ করে দিয়েছে বেবী টেমীর জন্যে, কিন্তু তবুও টেমী 'মডেল' ছাড়া আর কোনো রূপেই ওকে দেখে না।

সেদিন রাতে বেবী আমার টেবিলে এল না। রিয়াকে জিজ্ঞাসা করাতে জানতে পারলাম টেমী নাকি প্যারিস চলে গিয়েছে। অনেক বোঝাবার পর বেবী এসে বসলো। খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে জামার নিচে বুকের উপর রাখা একটা ফটো বের করলো। ফটোটা টেমীর। সীন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে টেমী। ফটোর পেছনে লেখা "a Sabahal, poure une souvenir—সাবাহালকে একটা স্মৃতিচিহ্ন।" আর কিছুই রেখে যায়নি টেমী বেবীর জন্যে।

তারপর ক'দিন আর বেবীর দেখা নেই। রিয়াকে জিজ্ঞাসা করলে 'জানি না' বলে ও কথাটা এড়িয়ে যায়। 'ওজগুর বার' ছেড়ে দিয়েছে বেবী। কিন্তু কোথায় আছে? রিয়া কোনো উত্তরই দেয় না। মনটা যেন কেমন খারাপ হয়ে গেল। বেবীর সেই ফ্যাকাশে, রোগা চেহারা আর কচিকচি মুখটা কেবলই চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

পরের দিন সকালে ইস্তানবুল ছেড়ে চলে যাবো এথেন্সে। বেয়গুলুর নাইট ক্লাব, কাবারে আর বারের ভিড়ে হারিয়ে যাবে রিয়া ও বেবী আর ইউরোপের টুরিস্টদের ভিড়ে হারিয়ে যাবো আমি। সন্ধ্যেবেলা কি জানি কেন নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'ওজগুর' বারে গেলাম। রিয়াকে বললাম, আমাকে বলো বেবী কোথায়। যাবার আগে আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই। রিয়া আবার ইতস্তত করতে লাগল। যখন বললাম যে, আমার সঙ্গে বেবীর দেখা না করালে আমি এক্ষুণি চলে যাবো, রিয়া শুধু "অল রাইট কাম উইথ মি" বলে আমায় নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলো।

অনেক ঘুরে ফিরে ট্যাক্সি দাঁড়ালো একটা গলির মোড়ে। চেনা চেনা মনে হলো গলির মোড়টা। ছাদ-নিচু ছোট দরজাওয়ালা বাড়ির সামনে দাঁড়ালো রিয়া। "এ তো তোমার বাড়ি", রিয়ার ব্যবহার দেখে অবাক হই। একটু চিৎকার করে ধমকে বলি, "আমায় বেবীর কাছে নিয়ে চলো। এখানে নিয়ে এসেছ কেন?"

"বেবী হিয়ার—বেবী এখানে আছে।"

"বেবী এখানে আছে আর তুমি এতদিন কথা এড়িয়ে বলেছো তুমি জানো না ও কোথায় আছে।" রাগে সমস্ত শরীরটা রি রি করে উঠলো।

আমার দিকে আবার ঠিক সেই রকম করুণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো রিয়া, যে রকম করে প্রথম পরিচয়ের পর আমাকে ওর ঘরে আসতে বলেছিল 'প্লিজ, প্লিজ' বলে। "বেবী ভেরি ব্যাড, বেবী ভেরি ইল—বেবীর খুব শক্ত অসুখ হয়েছে।"

ধাক্কা মেরে ঝড়ের মতো রিয়ার সেই নোংরা, ময়লা, কদর্য কুঠুরির ভিতরে ঢুকে পড়লাম। সেই স্তূপীকৃত জঞ্জাল, ছেঁড়া বিছানা, চারপাশে ছড়ানো ভাঙা বাক্স আর সুটকেস।

"হ্যালো।"

ঘরের এক কোণ থেকে একটা কাতরানি শুনতে পেলাম। পা-ভাঙা একটা খাটের উপর শুয়ে আছে বেবী। আমার মাথাটা যেন ঘুরতে লাগল। কোথায় সেই ফ্যাকাশে, রোগা চেহারা আর কচি-কচি মুখ? বিছানার উপর শুয়ে রয়েছে একটা অর্ধনগ্ন কঙ্কাল।

আর সেই কচি-কচি মুখময় ছেয়ে রয়েছে লাল লাল, চাকা চাকা ক্ষত।

'বেবী', আমার কথাটা যেন চিৎকারের মতোই শোনালো।

"আই অ্যাম নট বেবী, আই অ্যাম সেভেনটীন"—অর্ধনগ্ন কঙ্কালটা ক্ষীণ হেসে বলে উঠলো। দু'ফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে নেমে আসে।

কালো ভারী স্যাটিনের গাউনটা আবার পরে মার্বেল স্ট্যাচুর মতো আমার পাশে দাঁড়িয়ে রিয়া।

আমার চোখের সামনে ঘুরতে লাগল শুধু অসংখ্য লাল লাল চাকা চাকা ক্ষত।

ঝড়ের মতোই আবার বেরিয়ে এলাম।

ভোর তিনটের সময় পিটার দিমিত্রিয়াদিস্ যখন আমায় হোটেলে নামিয়ে দিয়ে গেল সারা ইস্তানবুল শহর তখন একটা বিরাট অজগর সাপের মতো একপাশে হেলে ঘুমুচ্ছে। এখানে ওখানে দু'-একটা তারা টিম টিম করছে। 'দি ম্যাডনেস ইজ ওভার—আজকের মতো পাগলামি শেষ হয়ে গিয়েছে ইস্তানবুলের'।

হোটেলে ঢুকে কি করে যে নিজের বিছানায় পৌঁছেছিলাম সব কিছু আজ মনে নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে আজও এইটুকু স্মরণ হয় যে, জীবনে প্রথম সে রাতে আমি বদ্ধ মাতাল হয়ে ঘরে ফিরেছিলাম আর সারা রাত কার জন্যে যেন কেঁদেছিলাম।

কুড়ি

ভোরের আলোয় পুবের আকাশটা হয়েছে লাল। রাতের পাগলামি শেষ হয়েছে আর আবার আরেকটা নতুন প্রভাতে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে দুরন্ত ইস্তানবুল। রোজই এমন হয়। নিঃসীম রাতের অন্ধকারের বুকে চলে পাগলামি আর ঝিমিয়ে পড়ে মহানগরী ভোরের দিকে।

যখন হোটেল থেকে বাইরে এলাম, বেয়গুলুর রাস্তায় সবে লোক চলাচল শুরু হয়েছে। পিটার দিমিত্রিয়াদিস্ তার কথা রেখে ট্যাক্সি নিয়ে 'কালীমেরা' (সুপ্রভাত) বলে এসে দাঁড়িয়েছে। জিনিসপত্তর চাপিয়ে গাড়িতে উঠতে যাবো, সেলাম করে দাঁড়ালো অতি পরিচিত, কানা, বৃদ্ধ 'সু-শাইন'। নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জাই পেলাম। রিয়ার পচা দুর্গন্ধময় নোংরা

গলির কাদার ছাপ লেগে রয়েছে চারপাশে। রোজকার মতো বৃদ্ধ এক নিমেষে ঝক্‌ঝকে পালিশ করে দিয়ে, গর্বের সঙ্গে তাকায় জুতোর দিকে, আমার তারিফের আশায়। কি জানি কি মনে হলো পুরো একটা লিরা-ই দিয়ে ফেললাম বৃদ্ধকে।

মুখ কাচুমাচু করে বৃদ্ধ বলে, "পার্দন, নো চেঞ্জ মঁশিয়ে"।

"তামাম, তামাম, বীর লিরা—ঠিক আছে, এক লিরা-ই দিলাম", অহেতুক দয়া ছুঁড়ে মারি। "তশক্কুর আদারাম তশক্কুর"। আনন্দের আতিশয্যে আমার ওপর ধন্যবাদের বোঝা চাপিয়ে বৃদ্ধ অন্য খদ্দেরের আশায় আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখলাম 'কোনাক্‌' হোটেলকে। মেথরের ঝাড়ু দেওয়া ধুলোর মধ্যে দিয়ে দেখি বেয়গুলুর শেষে আবছা আবছা 'তকসীম স্কোয়ার'। পিটার মনে করিয়ে দেয়—"টাইম ফর প্লেন মঁশিয়ে"। পিটারের কথায় স্মরণ হলো আজ আমার শেষ দিন। বিদায় জানাতে হবে ইস্তানবুলকে আর মিডিল-ইস্টকে। মনটা ভারী হয়ে যায়। কই, ইউরোপ ভ্রমণের আশু সম্ভাবনায় তো আনন্দ আর উৎসাহ পাচ্ছি না। যাত্রার শুরুতে যখন নাগপুর থেকে বম্বে রওনা হই তখনও না মনটা এমনি ভারী হয়ে এসেছিল!

সারা রাস্তা পিটার কথা বলে না। আমি যাবো এথেন্স—পিটারের জন্মভূমি এথেনিকা। প্রতিবারের মতো আজ সকালেও মনটা ওর ঘরের জন্যে কেঁদে উঠেছে। মনটা দু'জনেরই কেঁদে উঠেছে—আমার মিডিল-ইস্ট ছাড়ার বিদায়-বেদনায় আর পিটারের তার জন্মভূমি না যেতে পারার নিষ্ফল দুঃখে।

গ্রীক এয়ারলাইন 'টাই' (T.A.E) কোম্পানীর বিরাট প্লেনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে বিমানঘাঁটির এক কোণে। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে পিটার প্রায় চেঁচিয়েই বলে ওঠে, "দ্যাট প্লেন টেক ইউ টু এথেনিকা"। কথাটা বলেই নিজেকে আবার সামলে নেয় পিটার আর প্রতিবারের মতো নিজের সীট থেকে নেমে দরজা খুলে দাঁড়ায়। রোজকার মতো আমিও মনিব্যাগ খুলে গাড়ির মিটারের দিকে

ইঙ্গিত করে পিটারকে প্রশ্ন করি—"পোসো কানি (Poso Kani) পিটার ? কত হলো পিটার ?"

আমার গ্রীক উচ্চারণ শুনে অনেক কষ্টে হাসি চেপে পিটার উত্তর দেয়, "ওহি, ওহি, নাথিং, ইউ গো মাই এথেনিকা, নো চার্জ"। পিটারের গলার স্বর ভিজে এসেছে, চোখটা কেমন যেন ঝাপসা। আমি যাবো ওর এথেন্সে, তাই আমার কাছ থেকে ভাড়া নেবে না। বিদায়ের মুখে একি ঋণের বোঝা চাপাচ্ছে এক সাধারণ ট্যাক্সি ড্রাইভার। টুরিস্টদের তো ভালো লাগে না পিটারের, তবে আমার প্রতি এ টান কেন ?

"কেন পিটার, এ তোমার অন্যায়। অনেক টুরিস্টই তো গ্রামে যায়। সবাইকার কাছ থেকে ভাড়া না নিলে তুমি তো ফতুর হয়ে যাবে।"

"নো নো। ইউ লাভ এথেনিকা। আই লাভ ইউ।" কবে ওকে বলেছিলাম এথেন্স আমার ভালো লাগে, সেই কথা মনে রেখেছে। পিটারকে দুঃখ দিতে পারলাম না। মনিব্যাগটা আবার পকেটের মধ্যে রেখে দিলাম। স্থান, কাল, পাত্র সব ভুলে গিয়ে পিটারকে জড়িয়ে ধরলাম।

"ফেগো (Phevgo) পিটার—আমি যাচ্ছি পিটার।"

"তশকুর, মের্সিবুকু, থ্যাঙ্ক ইউ মঁশিয়ে", পিটারের চোখটা ছলছল করছে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে, পিটারের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে ওকে হাসাবার জন্যে বলি, "না পিটার, তশকুর, মের্সি বা থ্যাঙ্কস না, তোমার গ্রীক ভাষায় বলো"।

হাসি-কান্না মিলিয়ে গলা দিয়ে এক অদ্ভুত চাপা স্বর বের করে পিটার বলে, "এফারিস্তো, এফারিস্তো" (Efharisto)। আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সোজা ট্যাক্সিতে গিয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম পিটারের নীল বিরাট প্যাকার্ডটা আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলেছে শহরের দিকে।

লাউঞ্জে পৌঁছতেই মাইকের ঘোষণা শুনতে পাই, এথেন্সের যাত্রীরা সব প্লেনে গিয়ে ওঠো। তাড়াতাড়ি কাস্টমস্ পেরিয়ে

প্লেনের দিকে যাচ্ছি, হঠাৎ ভেসে আসে 'হ্যেল্লো'। যাকে কখনও আর দেখবো আশা করিনি, সেই ফাহারিয়া দাঁড়িয়ে। অনিদ্রায় আর জাগরণে ক্লান্ত, মুখে অবসাদের ছায়া। চুপ করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। ওকে দেখে আবার গতরাতের কথা মনে পড়ে যায়, সেই পচা, দুর্গন্ধময়, নোংরা গলি,—বেবী। খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে ফাহারিয়া। একটা ছোট লাল গোলাপের কুঁড়ি লাগিয়ে দেয় কোটের 'বাট্‌ন-হোল'-এ। তারপর আবার চুপচাপ।

"ইউ গো ইউনানিস্তান, বেবী লাভ টু ইউ," অতিকষ্টে কথা ক'টা বলে ফাহারিয়া। আমি গ্রীস যাচ্ছি, বেবী আমায় ভালোবাসা জানিয়েছে।

"তশক্কুর রিয়া, গিভ মাই লাভ টু বেবী। শী উইল বী অলরাইট সুন—বেবীকে আমার ভালোবাসা জানিও। ও শিগ্‌গিরই ভালো হয়ে যাবে,"—আর কোনো উত্তরই খুঁজে পাই না। কি বলবো রিয়াকে? ও কেন এসেছে এখানে? কি চায় আমার কাছে?

"রিমেমবার ফাহারিয়া—ফাহারিয়াকে মনে রেখো!" জামার ভিতরে বুকের কাছ থেকে এক প্যাকেট আমার প্রিয় 'বাফরা' সিগারেট বের করে ফাহারিয়া। "ইউ স্মোক টু মাচ্"। আর কিছু বলতে পারে না। গাল বেয়ে নেমে আসে জল। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছিয়ে দিয়ে হাসাবার ছলে বলি, "ইউ ড্রিংক টু মাচ্ রিয়া"।

একটা করুণ হাসি হাসবার বৃথা চেষ্টা করে রিয়া। তারপর সেই ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ এদিক, ওদিক তাকিয়ে আমার হাতটা এক লহমায় তুলে নিয়ে নিজের গালের ওপর চেপে ধরে। প্লেনের ঘড়্‌ঘড়ানিতে রিয়ার আর কোনো কথা শুনতে পাইনি। চিত্রার্পিতের মতো সীটে গিয়ে বসলাম।

ইস্তানবুল আর মরুপ্রান্তরকে পিছনে ফেলে 'ব্ল্যাক সী,' আর 'সী অব মারমারা'-র (Sea of Marmara) ওপর দিয়ে চললো এথেন্সের দিকে বিরাট প্লেনটা। গলায় কোথায় যেন

কি একটা ওঠা-নামা করছে। চোখের পাতাটা ভারী। ফাহারিয়া আর পিটারের চোখের জলে সত্ত-ভেজা রুমালটা হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরি। চোখের কোণে যখন তুলে ধরি, হাতের তালু থেকে রিয়ার ঠোঁটের অনেকটা লাল রং তখন রুমালে উঠে এসেছে। যত সব দুর্বলতা, বছরের পর বছর জমানো 'সিনিসিজম' (Cynicism)-এর বাঁধ ভেঙে জড়ো হয়। ঝাপসা চোখের সামনে কেবলই ভেসে ওঠে ছলছল চোখে মার্বেল স্ট্যাচুর সেই সুন্দর মুখটা "রিমেমবার ফাহারিয়া। ইউ স্মোক্ টু মাচ"।

সম্বিৎ ফেরে এয়ার-হোস্টেসের কথায়, "আর ইউ এয়ার-সিক মঁশিয়ে" ?

কোনো কিছু না ভেবেই জবাব দি, "নো মাদমোয়াজেল, আই অ্যাম হোম সিক্"। রিয়ার জলভরা চোখ কেবলই ঔরংজেব-দুহিতা জেবুন্নিসার সেই দু'-লাইনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল :

"দুরে অবলখ্ কে কম দীদা মোজুদ্
মগর চশমে-বুতানে অশক্ আলুদ্"।

(রঙীন মুক্তোর মতো মহার্ঘ বস্তুর দেখা কচিৎই পাওয়া যায় কিন্তু অশ্রুভরা প্রেয়সীর নয়ন, সে তো আরো দুর্লভ।)

একুশ

মরুপ্রান্তরের বুকে আমার যাত্রা শেষ হয়েছে।

বন্ধুদের মতে স্রেফ দু'মাস 'শিয়ার ওয়েস্ট অব টাইম অ্যাণ্ড এনার্জি' করেছি আমি মিডিল-ইস্টে। উত্তর দিয়েছিলাম, দু'মাস ইউরোপও তো ঘুরলাম, তবু তাঁরা ক্ষুণ্ণ। "দু'মাস মিডিল-ইস্ট না ঘুরে পুরো চারমাসই ইউরোপ ঘুরলে আরো ভালো হতো"। তর্ক করে তাদের বোঝাতে পারিনি। প্যারিসের মমার্তে, মপারনাস,

শ্যাজেলীজে, বুলেভার, লাতিন কোয়ার্তার, রোমের কতশত ঐতিহাসিক প্রাসাদ, ভেনিসের গণ্ডোলা আর গ্র্যাণ্ড ক্যানাল, জার্মানীর বিয়ার আর কারখানার চিমনীর ধোঁয়া, জেনিভার আন্তর্জাতিকতা সবই আমার ভালো লেগেছে কিন্তু তার চেয়েও নিবিড়ভাবে ভালো লেগেছে আমার বসরার কোলাহলপূর্ণ নোংরা বন্দর, বাগদাদের অল্ রশীদ স্ট্রীট, "মোস্ট অ্যানশিয়েণ্ট সিটি দামাস্কাস্," ইস্তানবুলের বেয়গুলু আর তকসীম স্কোয়ার, মরুভূমির বালুরাশী আর মরীচিকা। প্যারিসের বড় রেস্তোরাঁর ডিনার-এ-লা-কার্তে, রোমের স্প্যাঘেটী, হটডগ, সসেজ আর হামবুর্গারের চেয়ে ভালো লেগেছে ছোট মাটিঘেরা আরবের অন্ধকার ঘরে বসে 'খাবোশ' আর 'রবা' আর ক্ষুদ্র তুর্কী হোটেলে বসে 'পিলাভ্' আর 'পনীর' খেতে।

ইউরোপকেও আমি ভালোবেসেছিলাম কিন্তু কই ইউরোপ তো আমায় ভালোবাসেনি। ইউরোপও আমায় অভ্যর্থনা জানিয়েছে কিন্তু তার মধ্যে জন থমাসের আলিঙ্গনের উষ্ণতা তো খুঁজে পাইনি। ইউরোপে আমি ছিলাম লক্ষ লক্ষ মরসুমী টুরিস্টদের মধ্যে একজন—আনন্দ চেয়েছিলাম, পেয়েছিলামও সে আনন্দ, কিন্তু দাম দিয়ে কিনতে হয়েছিল তা। কিন্তু মিডিল-ইস্ট। তাকে শুধু আমিই ভালোবাসিনি, মিডিল-ইস্টও আমায় ভালো বেসেছিল। টুরিস্টদের জন্য তুলে রাখা ভালোবাসা নয়— 'সবার ওপর মানুষ সত্য তাহার ওপরে নাই', সেই মানুষের মতো ভালোবাসা।

মিডিল-ইস্ট আমায় পাউণ্ড, ডলার, ফ্র্যাঙ্ক, লিরা, পিয়াস্ত্রা, আর মার্ক দিয়ে মাপেনি, আমায় দেখেছে রক্ত-মাংস, হাসি-কান্না আর সুখ-দুঃখে গড়া সাধারণ মানুষ হিসেবে।

কিছুদিন আগে রোটারী ক্লাবের এক মিটিং-এ আমায় বক্তৃতা দিতে হয়। ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট এডুলজী সাহেব আমায় বক্তৃতার বিষয় নির্বাচনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে শুধু এইটুকুই অনুরোধ করেন যে, মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধেই যেন আমি বলি। আমি বিষয় ঠিক করেছিলাম "ফ্রম লরেন্স টু নাসের—রোমাণ্টিক মিডিল ইস্ট"। রোটারীর বাঁধাধরা কুড়ি মিনিটের বক্তৃতার পর এডুলজী সাহেব

প্রশ্ন করলেন, "বাট হোয়ার ইজ রোমান্স ইন অল দিস্?" বেশ মনে পড়ে তাঁকে জবাব দিয়েছিলাম, "ইট্ ইজ এ রোমান্স উইথ ফেট অ্যাণ্ড ডেস্টিনি"। মধ্যপ্রাচ্যে আজ ভাগ্য আর নসীবের সঙ্গে রোমান্স চলেছে। আবার যখন কোনোদিন মিডিল-ইস্টে যাবো হয়তো নতুন মিডিল-ইস্টকে দেখতে পাবো।

হারুন-অল্-রশীদের থাউজ্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়ান নাইটস্ যেমন আর দেখতে পাওয়া যায় না, তেমনি পাওয়া যায় না ওমর খৈয়ামের সে রোমান্টিক মিডিল-ইস্ট। বাগদাদের রাজপথে গভীর রাতে কোনো হারুন-অল্-রশীদ আর ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায় না, কুঞ্জছায়ার তলে কোনো ওমর খৈয়ামও সাকী ও সুরা নিয়ে আর বসে না। মরুভূমির বুক ঠেলে উটের কাফিলা আজও চলে কিন্তু 'আর্মস এইড'-এর দৌলতে যুদ্ধের সাঁজোয়া গাড়িই ঘোরে বেশি। অনেক জল বয়ে গিয়েছে শাতীল আরব আর নীল দিয়ে। কত ঘুমন্ত ফারাওদের জাগানো হয়েছে আর ব্যাবীলনের কত ধ্বংসপ্রায় স্তম্ভই না মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে। কিন্তু যে দিন চলে গিয়েছে তার চিন্তা করে কি হবে? মরুভূমির ওপারে যে নতুন সূর্য উঠছে তাকেই অভ্যর্থনা জানাচ্ছে আজ প্রাচীন মিডিল-ইস্টের নতুন আরব আর তুর্কী।

> "ইউস্থফে গুম গশ্তে বাজ আয়দ ব কিনান গম ম খুর।
> কুলবয়ে ইহজান শওদ রুজি গুলিস্তান গম ম খুর॥
> দুঃখ করো না হারানো ইউস্থফ, কিনানে আবার আসিবে ফিরে
> দলিত শুষ্ক এ মরু পুনঃ হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে" (নজরুল)

"রোজ ইয়কে জেতো গুজিস্তা শুদ্ ইয়াদ মাকুন্?" যে দিন চলে গিয়েছে তার স্মরণ করে কি হবে?

লরেন্স থেকে নাসের—অনেক দূরে এগিয়ে এসেছে মিডিল-ইস্ট। কিরুকুক্ থেকে হাইফা—মরুভূমির বুক চিরে অতিকায় হিংস্র অজগরের মতো মাইলের পর মাইল তেলের পাইপ চলে গিয়েছে। কাউন্ট বার্নাডোট আর লক্ষ লক্ষ আরব-ইহুদীর রক্তে গড়া নতুন ইজরাইল জন্ম নিয়েছে। স্বপ্নে দেখা পরীর নির্দেশে কর্নেল ডিক্সন কুয়েটে পেয়েছিলেন তেলের অফুরন্ত ভাণ্ডারের সন্ধান। আজ সে ডিক্সনও নেই আর সে পরীও নেই। মিডিল-ইস্ট

বছরের পর বছর পশ্চিম দুনিয়াকে শুধু তেলই যোগায়নি, যুগিয়েছে ফিল্মের গল্প আর নাম-না-জানা অনেক বিদেশী লেখকের খোরাক। রঙীন চশমা পরে এই সব লেখকেরা দেখেছে মিডিল-ইস্টকে আর সত্যি-মিথ্যে দিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে 'এক অদ্ভুত দেশ এই মিডিল-ইস্ট'। সহানুভূতি দেখায়নি কেউই। জন কিমচে, কলিন জ্যাক্সন, জন গাম্থার, ফার্গুসন আরো কতশত লেখকের লেখাই তো পড়লাম কিন্তু দরদী মনের পরিচয় তো কোথাও পেলাম না। এদের মধ্যেই তো একজন লিখেছেন—

"We don't like your country and we don't love you either but we love your oil all the same."

তিন প্রাচীন ধর্মের মিলনক্ষেত্র মিডিল-ইস্ট। একের পর এক জন্ম নিয়েছেন পীর-পয়গম্বরেরা আর অন্ধকার যুগ থেকে পৃথিবীকে করেছেন আলোকিত। এখানেই জিব্রাইল হয়েছেন গ্যাবরিয়েল, ইব্রাহিম হয়েছেন আব্রাহাম, ইসমাইল হয়েছেন ইশামেল, হাজরা হয়েছেন হ্যাগার, দায়ুদ হয়েছেন ডেভিড্ আর ইয়াকুব হয়েছেন জ্যাকব। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের কাবা আর খৃশ্চানদের বেথেলহেম রয়েছে এখানেই। একের পর এক এখানেই এসেছে গ্রীক, তাতার, তুর্ক, মঙ্গোল, আসিরিয়ান, সুমেরিয়ান, ব্যাবিলনিয়ান আরও কতশত, আর রেখে গিয়েছে তাদের পদচিহ্ন কালের বালুভূমিতে।

ছোট্ট একটা ঘটনার কথা আজ মনে পড়ছে। যাবার আগে ফর্দ নিয়ে বসেছিলাম কার জন্যে কি আনতে হবে। অনেকে অনেক দাবিই জানিয়েছিল। 'বেটার হাফ্' চেয়েছিলেন, আমি নিজেকেই যেন ফিরিয়ে আনি। ফিরে এসেছি নিজে কিন্তু তাঁর দুঃখ আমার মন আমি রেখে এসেছি মরুপ্রান্তরে। সবচেয়ে অদ্ভুত দাবি এসেছিল আমার ভ্রাতৃজায়ার কাছ থেকে। "দাদা, আমার জন্যে কিছু আনতে হবে না, শুধু আপনি যেখানে যেখানে যাবেন, সেখানকার মাটি আমার জন্য নিয়ে আসবেন।" অদ্ভুত দাবি হলেও তার নতুনত্ব আমার ভালো লেগেছিল। যে যে জায়গায় গিয়েছি, অন্য লোকের চোখ বাঁচিয়ে তুলে এনেছি মাটি। এক একটা

মোড়ক তৈরি করে সযত্নে লেবেল লাগিয়েছি—ইরাক, ইরাণ, সৌদী আরবিয়া, সিরিয়া, টার্কী, কুয়েট, ইমেন, লিবিয়া, জর্ডন, ইজিপ্ত, বহেরিন, লেবানন আর পাকিস্তান। হ্যাঁ পাকিস্তানও।

আজ মরুপ্রান্তরে আমার যাত্রার শেষে কত কথাই না মনে পড়ছে, আর কত ছোটখাটো ঘটনাই না ভেসে উঠছে চোখের সামনে। প্যারিস, রোম, এথেন্স, বেলগ্রেড, ডাসেলড্রফ, ব্রুসেলস, ভিয়েনা, মিলান, জেনিভা, কোপেনহেগেন,—কতশত নগরী আর দেশই তো দেখলাম, কিন্তু তবু জানি না, মিডিল-ইস্টকেই কেন আমি এত নিবিড়ভাবে ভালোবাসি। ভালো লাগে আমার মরুপ্রান্তরের বালুরাশি আর শাতীল-আরবের তীরে খেজুর গাছের ছায়া।

কতদিন ছেড়ে এসেছি মিডিল-ইস্ট তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, মরুপ্রান্তরের কোণে চক্রবালের কাছে দাঁড়িয়ে কারা যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে, "আহ্লীন্‌ওয়া স্যাহলীন্, আহ্লীনওয়া স্যাহলীন্"।